প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২, বাজেশিবপুর রোড
শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২

মুদ্রাকর:
অজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,

প্রয়াত পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে

# বি ষ য় সূ চি

# উপক্রমণিকা

অষ্টাদশ শতকের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান রাজসভায় গুণী বিদ্বৎজন ও কবিদের সমাবেশ ঘটেছিল। দুই রাজসভাতেই কাব্যচর্চার পৃষ্ঠপোষণায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যকৃতির প্রাপ্তি ঘটে বাঙলা সাহিত্যে। কৃষ্ণনগর এবং বর্ধমান রাজাদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর ছিল না—রেষারেষি অসূয়ামনস্কতা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। এর প্রভাব রাজসভা দুটির কাব্যচর্চাতে পড়েছিল। কিন্তু এর পরিণতিতে বাঙলা সাহিত্যের বরং লাভই হয়। এই দুই প্রভাবশালী রাজবংশের আনুকূল্যে যে সমস্ত কবিরা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, অন্যদিকে ছিলেন বর্ধমান রাজসভার কবি ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী।

কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান রাজসভায় রাজ-আনুকূল্যপ্রাপ্ত কবিরা যে কাব্যচর্চা করেছিলেন তার মুখ্যভাগ ছিল রাজামহারাজাদের ইচ্ছা-চাহিদা ও ফরমায়েশের ফলশ্রুতি। স্বাধীন কাব্যরচনার পরিসর সেখানে ছিল কম। রাজপ্রশস্তি ও রাজ-সন্তুষ্টিবিধানই এইসব কাব্যরচনার ক্ষেত্রভূমি রচনা করতো অধিকাংশ সময়। রাজা-মহারাজাদের ইচ্ছাপূরণের পরিণতিতে যেমন আমরা পেয়েছি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, তেমনই পেয়েছি বাল্মীকি রামায়ণের উমাকান্ত ভট্টাচার্য-বিপ্রদাস তর্কবাগীশ কৃত পদ্যানুবাদ এবং মহাভারতের গদ্যানুবাদ (কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদের আগেই এই গদ্যানুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল)।[১]

রাজা-মহারাজাদের ইচ্ছানুবর্তিতায় যখন সামন্ত সংস্কৃতির এই সৃজন উৎসব চলছে, সেই সময় উনিশ শতকের প্রারম্ভে শহর কলকাতায় নতুন চেতনা ও ভাবদ্বন্দ্বে সংস্কৃতির এক নতুন দিক উন্মোচন ঘটতে শুরু করেছে। বাঙলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামজীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটলেও শহর কলকাতার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নতুন কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো। তার ফলে শহরমুখিনতার প্রবণতাও প্রকট হয়েছিল। বর্ধমান রাজসভার রাজানুকূল্যপ্রাপ্ত কবি ও গীতিকার প্যারীমোহন কবিরত্ন শহর কলকাতার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই নগরায়নের প্রবণতা মধ্যযুগীয় সামন্ত সংস্কৃতির ভাঙনকে তীব্র করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

আঠারো শতকের শেষের দিকে কলকাতায় ধনী রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইনাচের পাশাপাশি খেউড় গানের রমরমাও ছিল যথেষ্ট। 'অসংস্কৃত ধনীদের টাকার

ও স্থূলরুচির প্রভাবে'[১] সমসময়ে শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে স্থূলতার সঞ্চার অবধারিত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রারম্ভে শহর কলকাতার নতুন আলোকচ্ছটা এই চর্চার প্রসারতায় বাধা উপস্থিত করেছিল।

তবে একটা বিষয় এখানে পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়। রাজা-মহারাজদের রাজসেবার সংস্কৃতি বা আঠারো শতকের শেষের দিকের কলকাতায় ধনী রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষিত স্থূল চিন্তাচর্চার সংস্কৃতি কোনমতেই তাকে গণজীবনের অন্তঃস্থল থেকে তুলে এনে বিকশিত করার দায়িত্ব নেয়নি বা পালন করেনি। আত্মস্বার্থচরিতার্থতা ও আত্মবিনোদনের উপকরণ হিসেবে শিল্পসাহিত্যকে এঁরা দেখেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কবি-গীতিকারদের পৃষ্ঠপোষণা দিতেন কোনরকম সামাজিক দায়বোধের চিন্তাচর্চা ব্যতিরেকেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শহর কলকাতা থেকে যেসব সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে, তার পৃষ্ঠায় সংবাদ-প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাচর্চাপ্রসূত কাব্যকৃতির প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। শহর কলকাতার এবং শহর কলকাতার বাইরের উঠতি কবিরা এইসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় হাত পাকাতে শুরু করেন। সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদকরাও এক্ষেত্রে এইসব কবি-যশোপ্রার্থীদের কবিতা পরিমার্জিত করে যথোচিত মর্যাদায় পত্রিকায় প্রকাশ করে এক সামাজিক দায়বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে এইসব সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা লেখক তৈরির একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। নিজে কবি ও সাংবাদিকের ব্রতচর্চায় রত থাকার দরুন তিনি সংবাদ ও কবিতা রচনার ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেন। এইভাবে একটি অনন্য এবং অভূতপূর্ব সামাজিক দায়িত্ব পালন করে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে চিরঋণী করে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, যিনি 'যথার্থ গ্রন্থকার', তাঁর কাছে 'পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের'[২] অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন ফুল নিজের জন্য ফোটে না, পরের সেবাতেই তার সার্থকতা। অর্থাৎ বঙ্কিমী তত্ত্বে যে বিষয়টি এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা হলো : জনহিতসাধনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সাহিত্যস্রষ্টার লক্ষ্য। এর পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না।'[৪]

নিছক আত্মতৃপ্তিতে নয়, সামাজিক দায়বোধেই সাহিত্যের সার্থকতা। নিজে শিল্প-সাহিত্যের সেবক হওয়া এবং অপরকেও এই সেবকত্বের অংশীদার করে তোলার প্রক্রিয়ায় যে সামাজিক দায়বোধের পরিচয় নিহিত থাকে তা সবসময় প্রাপ্তির আনন্দে ধরা দেয় না। নিজে কি পেলাম তার চাইতে বড়ো হয়ে ওঠে অপরের জন্য কি করতে পারলাম—এই প্রশ্নটি।

উনিশ শতকের কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্বাদপ্রভাকর' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক-কবি ও কবি-জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজে যে শুধু সাহিত্যেসেবা করে তৃপ্তি পেতেন তাই না, অন্যজনকে সাহিত্যসেবার কাজে ব্রতী করতে পারলে তৃপ্তি পেতেন। বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে 'সর্বপ্রথম' বিষয়বস্তুর 'বৈচিত্র্য সম্পাদন' করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর রচনায় মানুষের 'দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রথম উপযুক্ত মর্যাদা লাভ' করেছিল এবং সংবাদ সাময়িকপত্রকে উপলক্ষ করে তিনিই 'প্রথম সাহিত্যিক সৃষ্টির'[৫] ব্রতচর্চায় নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ রথী মহারথীরাই ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যশিষ্য। এঁরা সকলেই নতমস্তকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তাঁদের সাহিত্যগুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন।

একথা বোধহয় জোর দিয়েই বলা যায় যে উনিশ শতকে কবি-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব ব্যতিরেকে বাঙলা সাহিত্যের মণিকাঞ্চনযোগ নিঃসন্দেহে সুদূরপরাহত হতো। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সমসময়ের বহুসংখ্যক তরুণ বঙ্গসাহিত্যসেবার ইচ্ছায় তাঁর 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর পাতায় প্রথম সলজ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সাহচর্যে ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষণায় তাঁরা নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং কালোত্তরে বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে স্বস্ব কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখনীয় নাম হলো অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ। এঁদের অনেকে পরবর্তীকালে কি গদ্য কি পদ্যরচনায় গুরুর কীর্তিকে অতিক্রম করে যশস্বী হয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন বাঙলা সাহিত্যের সুবর্ণভাণ্ডার।

সাহিত্যকর্মে ব্রতীকরণের এই কাজটিকে যদি স্ফুলিং বলা যায় তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই স্ফুলিং-এর সূত্রে বলা যেতেই পারে যে উনিশ শতকের ষাটের দশকের গোড়া থেকে পরবর্তী পর্যায়ে শহর কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে দূর গ্রামবাঙলার মফঃস্বলে, তৎকালীন নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামের হরিনাথ মজুমদার (যিনি কাঙাল হরিনাথ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) এই স্ফুলিং-এর আর একটি জীবন্ত নজির স্থাপন করেছিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য শিষ্য হরিনাথ মজুমদারের এই স্ফুলিং থেকেই বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে এসেছিলেন জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মীর মশাররফ হোসেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চন্দ্রশেখর করের মতো সাহিত্যরথীরা।

হরিনাথ নিজে যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর সাহিত্যদৃষ্টিকে যেমন অনুধাবন করার আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছিলেন, তেমনই পাশাপাশি 'সম্বাদপ্রভাকর'-এর মতো নিজেও 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশ করে, গুপ্ত কবির পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন্ত স্ফুলিং-এর মাধ্যমে এক ঝাঁক তরুণ সাহিত্যসেবীর প্রস্ফুটন ও সুললিত বিকাশের কাজে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

## তথ্যপঞ্জি


১। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজসভার কবি ও কাব্য। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ১৯৮৬ সংস্করণ। পৃ. ১৯৫-৯৬

২। রমাকান্ত চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : বিস্মৃত দর্পণ নিধুবাবু/বাবু বাংলা/গীতরত্ন। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। অবতারণা, পৃ. ২২

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালা ভাষা। বঙ্কিমরচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৪০১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩২১

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩৬

৫। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য (ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স।

# কুমারখালির পরিচয়

হরিনাথ মজুমদারের জন্মস্থান কুমারখালি ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে সমসময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে কুষ্টিয়ার পরিচয় দিতে 'কুমারখালি কুষ্টিয়া' বলা হতো। চৈতন্যদেবের আমলে এই কুমারখালির নাম ছিল তুলসীগ্রাম। এ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কালেকটর হিসেবে কমরকুলি খাঁ-কে নিয়োগ করার পর কমরকুলির নাম থেকে কুমারখালি নামের উৎপত্তি ঘটে।[১] ইংরেজ শাসনের আগে কুমারখালি যথাক্রমে ফরিদপুর ও যশোহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাবনা-র অন্তর্ভুক্তির আগে কুমারখালি যশোহর-এর অন্তর্গত ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালি, খোকসা, পাংসা এবং বালিয়াকান্দি থানা নিয়ে কুমারখালি মহকুমা গঠিত হয়। এরপর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কুমারখালিকে আবার পাবনা জেলা থেকে বের করে এনে নদীয়া জেলার একটা থানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২] একসময় নাটোররাজের অধীনে থাকলেও পরবর্তীকালে কুমারখালি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। কুমারখালির নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উত্তরকালে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে জানা যায় যে ওই সময় নদীয়া জেলায় ৬টি মহকুমা ছিল। সেগুলি হলো (১) কৃষ্ণনগর (২) মীরপুর (৩) কুষ্টিয়া (৪) চুয়াভাঙা (৫) বনগাঁ এবং (৬) রানাঘাট। পাবনা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মহকুমা-পরিচিতি হারিয়ে কুমারখালি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত একটি থানার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৬৪,৪৩০ জন, ১৮৬৩-তে তা বেড়ে দাঁড়ায়, ৯,৫১,২২৯ জন। আর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৮,১২,৭৯৫ জন। কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত যে ৬টি থানা ছিল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে, সেগুলি হলো— (১) দৌলতপুর (২) নোয়াপাড়া (৩) কুষ্টিয়া (৪) কুমারখালি (৫) ভালুক এবং (৬) ভাদুনিয়া। এর মধ্যে কুমারখালি থানার আয়তন ছিল (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের হিসেবে) ১১০ বর্গমাইল। কুমারখালির অন্তর্গত গ্রাম-শহরের সংখ্যা ছিল ২৪২টি। মোট বাড়ির সংখ্যা ১৪,৫৮১ এবং মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৮৬,২৫৪ জন।[৩] পাবনা জেলা থেকে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কুমারখালি শহর (পুরসভা) এলাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,২৪১ জন। জাতিধর্মনির্বিশেষে এর সংখ্যা ছিল হিন্দু ৩,২৫৩ জন (পুরুষ ১,৫৪৯,

মহিলা ১৭০৪), মুসলমান ১,৯৮৫ জন (পুরুষ ৯২২, মহিলা ১,০৬৩), খ্রিস্টান ১৩ জন (পুরুষ ৮, মহিলা ৫)।[৪]

শিলাইদহ, ধোকড়াকোল প্রভৃতি 'গাঁয়ের' মতো কুমারখালিতেও নীলকুঠি ছিল। এছাড়া ৫১টি নীলকুঠির হেড অফিস অর্থাৎ প্রধান কার্যালয় ছিল কুমারখালিতেই।[৫] রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরও শিলাইদহে নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া কুমারখালিতে গভর্নমেন্টের একটা রেশমকুঠি ছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর কার-টেগোর কোম্পানির তরফে সেটিও কিনে নিয়ে নবোদ্যমে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।[৬] নীলকর তথা নীল বিরোধী আন্দোলনে কুমারখালির জনসাধারণের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কুমারখালি অঞ্চলের শালঘর মধুয়ার কুখ্যাত অত্যাচারী নীলকর টি.আই. কেনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন একসময় তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নীলকর টি.আই.কেনির পরিচয় এবং প্যারীসুন্দরীর নেতৃত্বে কেনির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা লিপিবদ্ধ আছে মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়।[৭]

কুমারখালির উকিল রাইচরণ দাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় দেশীয় 'মহাজনদের মধ্যে কুমারখালি ও আমলার সাহাবাবুদের এবং আজুদিয়ার ঘোষবাবুদের' চাল ও ঘিয়ের কারবার ছিল। একশ হাত লম্বা ৩০ হাত চওড়া নৌকায় (এগুলিকে বড় সায়ার বলা হতো) করে চাল কলকাতায় রপ্তানি করা হতো।[৮]

তাঁতিদের তৈরি বস্ত্রের 'বৃহত্তম হাট' হিসেবে কুমারখালির প্রসিদ্ধি ছিল। হরিনাথের এক জীবনীকার লিখেছেন কুমারখালিকে নদীয়া জেলার 'ম্যাঞ্চেস্টার' বললে সেসময় অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট হতো না। 'অসংখ্য তাঁতী নানারকম বস্ত্র প্রস্তুত' করতেন এবং 'সুদূর ইংলন্ড পর্যন্ত' তার পরিচিতি ছিল। এছাড়া 'কুমারখালি মার্কা রেশম অধিক মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রয়' হতো, কুমারখালির 'নীলপাড় কাপড়ের পাকা নীল রঙের জন্য সাহেব সওদাগরদিগের মনে লোভ সঞ্চার' হতো।[৯]

ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর থেকে এদেশের তাঁতিদের কপালে দুঃখ নেমে এসেছিল। দেশের তাঁতিদের ওপর বিদেশি ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁতিরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সমসময়ের তাঁতিদের নেতাকে আধুনিক পরিভাষায় 'agitators' বলা হতো। কুমারখালির তাঁতিরা ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বিচারপ্রার্থী হয়ে এক আবেদনপত্র দাখিল করেছিল, যে আবেদনপত্রে নেতা হিসেবে যাদের নাম ছিল তারা সকলেই ছিলেন সাধারণ তাঁতিদেরই এক একজন।[১০]

কুষ্টিয়ায় রেলপথ চালু হওয়ার আগে ব্যবসাবাণিজ্য নদীপথেই হতো। কলকাতা যাওয়ার পথ বলতে ছিল মাথাভাঙা নদী। আর এই পথেই কলকাতায় নীল রপ্তানি হতো। নীলকরদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করার স্বার্থেই নাকি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়াকে নতুন মহকুমা করে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১১] ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সঙ্গে কুষ্টিয়ার রেলপথ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

## তথ্যপঞ্জি

১। খো : আবদুল হালিম : কুমারখালির কথা (আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'কুষ্টিয়া ইতিহাস ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্কলিত। কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ। বাঙলাদেশ। ১৯৭৮ সংস্করণ)। পৃ. ১৫৯

# হরিনাথ মজুমদার : জীবনকথা

এই কুমারখালির অন্তর্গত কুণ্ডুপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের[১] তিলি পরিবারে হরিনাথ মজুমদারের জন্ম ১২৪০ বঙ্গাব্দের ৫ শ্রাবণ (জুলাই, ১৮৩৩)।

তেল প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের পেশাগত কারণে তেলি জাতির সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত হয়েছিল। কবি মুকুন্দরামের সমসময়ে তেলিরা তিনটি অবস্থানগতভাবে বিভক্ত ছিল। একটা অংশ তাদের প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আর একটি অংশ ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে তেল কিনে বিক্রয় করতো। এবং বাকি অংশটি তাদের প্রথাগত পেশায় অভ্যস্ত ছিল। এই বিভাজন প্রক্রিয়াটি পরবর্তীকালে স্পষ্টরূপ লাভ করে এবং প্রথাগত পেশা পরিত্যাগ করে নিজেদের উন্নত সামাজিক অবস্থানে চিহ্নিত করে। এই পর্যায়ে এঁরা পরিচিত হন 'তিলি' বলে। সামাজিক অবস্থানে এই তিলিরা বয়সে নবীন। প্রাক-আঠারো শতকে কিম্বা উনিশ শতকের ঊষালগ্নেও সামাজিক বর্গ হিসেবে তিলিদের দেখা মেলেনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তিলিরা তেলিদের মধ্যে উচ্চ সামাজিক বর্গের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তেলিদের সঙ্গে সামাজিক অবস্থানগত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তিলি হিসেবে নিজেদের উন্নত সামাজিক বর্গকরণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী স্বয়ং। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকান্তের বংশধর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই আন্দোলনের সূত্রে উন্নত সামাজিক অবস্থানের তেলি সম্প্রদায়কে মূল সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাধারণভাবে 'তিলি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।[২] ১৮৭২ সালের প্রাপ্ত হিসেবে জানা যায় যে নদীয়া জেলায় তেলি এবং তিলির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৬৫ এবং ১১,৬৯২ জন। তেলিদের প্রতিতুলনায় তিলিদের এই সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপকতা তাদের উন্নত সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক।

এরকমই একটি সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের তিলি পরিবারে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হরিনাথের পিতার নাম ছিল হলধর মজুমদার, মাতা কমলিনী দেবী। মাতাপিতার একমাত্র সন্তান হরিনাথ এক বছর বয়স অতিক্রম করার আগেই[৩] মাকে হারান। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। স্ত্রী-বিয়োগের শোকজনিত কারণে হলধর সংসারে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হলধর ছিলেন, স্ত্রী বিয়োগের পরবর্তীতে সাংসারিক জীবনে তাঁর নিদারুণ ঔদাসীন্যের কারণে তাও নষ্ট হয়ে যায়। কমলিনী দেবীর মৃত্যুর কয়েক বছর পর

হলধরও প্রয়াত হন। ফলে শৈশবেই মাতাপিতাকে হারিয়ে হরিনাথ গভীর দুর্দশায় পতিত হন। মাতৃহীন হওয়ার পর তাঁর এক খুল্লপিতামহী হরিনাথকে প্রতিপালন করেছিলেন।

এই খুল্লপিতামহী ছিলেন হরিনাথের প্রকৃত অভিভাবিকা। ইনি হরিনাথকে নিজের সন্তান অপেক্ষা বেশি ভালোবাসতেন। হরিনাথ তাঁকে 'দুধ মা' বলে ডাকতেন। দুরন্তপনায় অদ্বিতীয় হরিনাথকে বাগে আনতে তিনি হিমশিম খেতেন। অবাধ্য হরিনাথ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে দুষ্টুমি করে বেড়াতেন। বন্ধুবান্ধব কারও প্রতি কেউ কোন অন্যায় আচরণ করলে হরিনাথ তাকে নিজেই মারধর করে শাস্তি দিতেন। ঘুড়ি ওড়ানো ছিল তাঁর ছেলেবেলাকার নেশা। এই ঘুড়ি ওড়াবার নেশায় মত্ত হয়ে তিনি বহুদিন বিদ্যালয় কামাই করতেন। তাঁর সমস্ত অবাধ্যপনা ও দুরন্তপনা সত্ত্বেও খুল্লপিতামহী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং হরিনাথকে না খাইয়ে নিজে খেতে পারতেন না।[৪]

পিতার মৃত্যুর পর হরিনাথ প্রকৃত অর্থেই অনাথ হয়ে পড়েন। পরের কৃপানির্ভরতার জীবন তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়। পিতার ঔদাসীন্যের ফলশ্রুতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে হরিনাথ বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে দুঃখদুর্দশা তাঁর 'জীবনসঙ্গী' হয়েছিল। 'বাল্যকালের কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই' হরিনাথের পূর্ণ হয়নি।[৫] হরিনাথের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেইসময় কুমারখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার একটা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পড়াশুনোর জন্য হরিনাথ সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ের এবং পুস্তকাদির ব্যয় বহন করেছিলেন হরিনাথের খুল্লতাত নীলকমল মজুমদার। কিন্তু কিছুকাল পর নীলকমল মজুমদার কর্মচ্যুত হন। ফলে হরিনাথের জীবনে আবার সঙ্কটের অন্ধকার নেমে আসে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণধন মজুমদার বিনা বেতনে কিছুদিন হরিনাথের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাব, খাওয়া-পরার কষ্ট এবং 'পুস্তকাদির অসদ্ভাব'[৬] হরিনাথের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পক্ষে অসমাধেয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ছাড়া প্রথাগত শিক্ষালাভ তাঁর আর হয়ে ওঠেনি।

ছোটবেলা থেকেই হরিনাথ ছিলেন স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত একগুঁয়ে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো যেত না। শৈশবে তিনি যদি কোনদিন বিদ্যালয়ে যাবেন না বলে ঠিক করে থাকতেন, কোনমতে কেউ তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারতো না।[৭] সেকালে পাঠশালার গুরুমশায়রা বাস্তব অর্থেই যমদূতসদৃশ ছিলেন। জলধর সেন লিখেছেন : 'সেকালে পাঠশালার গুরুমশায়রা মা সরস্বতীর চাপড়াসী হইলেও যমদুতের এক একটা মানবীয় সংস্করণ বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেন'।[৮] সেসময়ে গুরুমশায়দের মারের ভয়ে ছাত্ররা পালিয়ে বেড়াতো। আবার অন্য ছাত্রদের সহায়তায় গুরুমশায় সেইসব পলাতক ছাত্রদের ধরে এনে ভয়ানক প্রহার করতেন। জলধর সেনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জবানীতে। কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :

তদানীন্তন গুরু মহাশয়দিগের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়।....ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যমস্বরূপ জ্ঞান করিত। কোন কোন বালক পাঠশালা হইতে পলায়ন কালে ব্যাঘ্র, সর্প, প্রেত কিছুরই ভয় করিত না।....এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরুমশায়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারোওয়ারী ঘরে মাচার উপর অনাহারে একদিন ও একরাত্রি থাকেন।[৯]

এইরকম এক শিক্ষকের 'বেত্রদণ্ডের' ভয়ে হরিনাথ একবার সমস্ত দিন একটা পরিত্যক্ত কুয়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। এরকম একগুঁয়ে ছেলে কোনদিন মানুষ হবে না বলে তাঁর হিতৈষীজনেরা যেমন মনে করতেন, তেমনি হরিনাথও 'বেত্রমাত্র সম্বল গুরুমশায়ের জ্ঞান-সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের প্রতি' শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারেননি।।[১০] রাজনারায়ণ বসুর বিবরণেও গুরুমশায়কে 'অতি ভীষণ পদার্থ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১]

লেখাপড়ার পথ বন্ধ হওয়ায় হরিনাথের 'হিতৈষী আত্মীয়গণ' নীল কুঠির এক 'নায়েবকে মুরুব্বি' ধরে হরিনাথকে সেই নীলকুঠিকে শিক্ষানবিশির কাজে নিযুক্ত করিয়েছিলেন। সমসময়ে যে সব 'ভদ্রসন্তান' লেখাপড়া শিখতে ব্যর্থ হতো, তাদের হয় নীলকুঠিতে নতুবা পুলিশের চাকরিতে নিযুক্ত করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার পরামর্শ দেওয়া হতো। এই একই উদ্দেশ্যে হরিনাথকে নীলকুঠিতে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কিছু স্বজন-বান্ধব। তাঁদের আশা ছিল হরিনাথ কিছুকাল পর 'আমীন বা গোমস্তার পদ' লাভ করে 'দুই হাতে পয়সা' লুটতে পারবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নীলকুঠির কর্মচারিদের অসৎ চরিত্রের পরিচয় তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেন। তাঁর চোখে যে তথ্য ধরা পড়ল, তা হলো এইসব নীলকুঠির কর্মচারিরা 'অধিকাংশই অসচ্চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী, প্রজাপীড়ক, মিথ্যাবাদী এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল অকপর্ম্মেই অকুণ্ঠিত।'[১২] হরিনাথ স্বভাবতই সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। তারপর তিনি 'গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত' এক মহাজনের দোকানে গোমস্তার কাজে যোগ দেন। কিন্তু 'ভাগ্যলক্ষ্মী এখানেও হরিনাথকে কৃপা' করেনি। মহাজনের অন্যায়-অভিপ্রায় পূরণ করতে রাজি না হওয়ায় হরিনাথকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এ সময়ের কথা হরিনাথ নিজে লিখেছেন:

'এই ঘটনার পর জ্যোঠা মহাশয় দুবেলা যে দুটী অন্ন দিতেন সে অন্নের বরাতও উঠিয়া গেল। এখন আমি যথার্থই অন্নবস্ত্রহীন পথের কাঙাল। প্রতিপালিকা খুল্ল পিতামহী কখনো তাঁহার উদরান্নের অর্দ্ধাংশ (পান্তাভাত, জামির পাতা ও লবণ) প্রদান করেন, কখন কোন ঠাকুরবাড়ির প্রসাদে এক বেলা

উদর পূর্ণ করি।...আমার বন্ধু দাদা লোকনাথ কুন্ডী রাত্রিকালে প্রায়ই আহার দান করিতেন।[১৩]

অর্থাভাবে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়ে কর্মহীন, অভিভাবকহীন হরিনাথ বখে যাওয়া ছেলেদের মতো সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে ও খেলে বেড়াতেন। হরিনাথের শারীরিক শক্তি ছিল অপরিমিত। সাহসেও তিনি ছিলেন 'সেকালের ছেলেদের মধ্যে গ্রামে অদ্বিতীয়'। দুর্বল এবং অন্যের হাতে লাঞ্ছিত বালকদের তিনি তাঁর 'সবল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা' করতেন। অথচ হরিনাথের বুদ্ধিমত্তা ও লেখাপড়া শেখার প্রতি আগ্রহ অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁরা যখনই হরিনাথকে কিছু কিছু বাংলা বই পড়তে দিয়েছেন, হরিনাথ যথাসময়েই তা পড়ে শেষ করেছেন।[১৪] এ হেন হরিনাথকে পড়াশুনা শেখাবার জন্য সক্রিয় ও আন্তরিক উদ্যোগ নিতে কাউকেই দেখা যায়নি। অথচ বই পড়ার প্রতি হরিনাথের ছিল অসীম আগ্রহ। তিনি যখন যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখানে কোনো বই পেলেই গোগ্রাসে খাওয়ার মতোই তা পড়ে ফেলেছেন। অথচ হরিনাথের পড়াশুনা শেখার কোনো সুযোগ ছিল না। নিদারুণ দারিদ্র্য আর অর্থকষ্ট তাঁর সামনে মূর্তিমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার রামমোহন রায়ের 'চূর্ণক' নামক গ্রন্থটি নকল করে তাঁকে পরিধানের বস্ত্র সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এ তথ্য দিয়েছেন হরিনাথের দুই সাহিত্য শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[১৫] এবং জলধর সেন।[১৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকতে পারে যে রামমোহন রায়ের 'চূর্ণক' শীর্ষক কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন পাঠে (১ আষাঢ় ১৭৬৬ শক। ১৩ সংখ্যা) জানা যায় যে রামমোহন রায়ের সঙ্গে 'একজন মহোপাধ্যায় ভট্টাচার্যের যে বিচার হয় তাহার চূর্ণক মুদ্রিত' হয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তত্ত্ববোধিনী কার্যালয়ে রক্ষিত হয়েছিল।[১৭] হরিনাথ এই 'চূর্ণক'* নকল করেছিলেন পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ লক্ষ্যে।

এ হেন হরিনাথ আত্মীয়স্বজনদের কারও কাছে নির্বোধ, কারও কাছে এঁচোড়ে পাকা বলে আখ্যাত হতেন। একে নিদারুণ দারিদ্র্য কারও আন্তরিক সহযোগিতা পান না, তার ওপর এ ধরনের মন্তব্যাদি হরিনাথকে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ করে তুলতো। এই সময় লেখাপড়া শেখার সংকল্প নিয়ে তিনি কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখনও কুষ্টিয়া-কলকাতা রেলপথ হয়নি। নদীপথে কলকাতায় যেতে দশ-বারোদিন সময় লাগতো। হরিনাথ কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সুযোগ সুবিধা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আবার স্বগ্রামে ফিরে আসেন।[১৮]

*এই 'চূর্ণক' সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: 'মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক' শীর্ষক রচনাটি। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১ম বর্ষ ১ সংখ্যায় (১ ভাদ্র, ১৭৬৫ শক)। এই সংখ্যাটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর ৩০, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলকাতা। পৃ. ৭-৮

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তাঁর যে হবে না এই উপলব্ধিকে মাথায় রেখে হরিনাথ এবার প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত শিক্ষালাভে মনোযোগী হন। এই প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত শিক্ষালাভের ব্যাপারে হরিনাথের সচেষ্ট হওয়ার পেছনে একটি কারণ সক্রিয় ছিল। মহাজনের গদিতে এবং নীলকরের কুঠিতে অসহায় মানুষজনের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হতো তা তাঁর মনকে ব্যথিত করেছিল। সে সময়ে গ্রামের জমিদারদের প্রজাশোষণও যে কি ভয়ঙ্কর ছিল তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গ্রামের আর্ত মানুষজনের কান্না-হাহাকারের প্রতিকার কিভাবে করা যায় এই চিন্তা তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করতো। সংবাদপত্রে এইসব অসহায় মানুষদের দুঃখ দুর্দশার কথা লিখে সরকারের কাছে প্রতিকার প্রার্থনার কথা তাঁর মনে আসে কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার অভাব হরিনাথের কাছে অধিকতর যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তখন স্ব-উদ্যোগে পড়াশুনা শুরু করেন। কুমারখালির ব্রাহ্ম-প্রচারক দয়ালচাঁদ শিরোমণির কাছে কিছু ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন। তাঁর কাছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যতগুলো সংখ্যা ছিল তা সবই তিনি পাঠ করেন। দয়ালচাঁদ শিরোমণির কাছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার খণ্ডগুলি ছাড়াও ব্রাহ্মধর্মের কিছু বইপত্র ছিলো—হরিনাথ শিক্ষালাভের উদগ্র তৃষ্ণায় সেসব পাঠ করেন।[১৯] এর ফলে তাঁর কিছু 'ভাষাজ্ঞান' হয়। বাড়িতে বসে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও সংগ্রহ করে পড়েন।[২০] এ ছাড়া 'সম্বাদপ্রভাকর' পত্রিকা যেখান থেকে যেমন পেতেন, পড়তেন। এর ফলে লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর কিছুটা ব্যুৎপত্তি জন্মে। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদপ্রভাকর'-এ পত্র-প্রতিবেদন পাঠাতে শুরু করেন। কিছু কিছু পদ্যও পাঠাতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেইসব লেখা সংশোধন করে প্রকাশোপযোগী করে নিয়ে প্রভাকরে প্রকাশ করতে থাকেন। এই পর্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে হরিনাথের পরিচয় হয়। পরিচয়সূত্রে হরিনাথ আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হন। তিনি তাঁর 'স্বগ্রামের প্রজাগণের দুঃখ ও অভাবকাহিনী সাধারণের গোচর করিবার জন্য' সংবাদ প্রভাকর-এ 'প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।' সেসময় জমিদারেররা নিজেদের প্রজাবর্গের 'দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা' বলে মনে করতেন। সুতরাং 'কারণে অকারণে' তাঁদের যথেচ্ছ নির্যাতন সহ্য করতে হতো। হরিনাথ এইসব ঘটনা সাধ্যমত লিখে পাঠাতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে। এই সব 'বিবরণ' তাঁর 'হস্তগত' হলে তিনি 'তাহা সযত্নে প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন, কোন ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতেন এবং প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান' করতেন।[২১]

পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদপ্রভাকর'-এর অনুসরণে হরিনাথ নিজেই প্রকাশ করেন 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'। এই পত্রিকায় একদিকে তিনি যেমন সাহসের সঙ্গে নিপীড়িত প্রজার পক্ষে কলম ধরেন, তেমনই শহর কলকাতা থেকে দূরে গ্রাম মফস্বলে তরুণদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করে তাদের লেখা গ্রামবার্তায় প্রকাশ করে একটা সুস্থ সংস্কৃতির পরিবর্ধন ও প্রসারে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি

হরিনাথ বাউলগানের দল গঠন করেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য-বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দিয়ে গান লিখিয়ে সুরারোপ করে, তাদের নিয়ে গ্রামগঞ্জে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। এসব গান বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

হরিনাথের জন্মস্থান কুমারখালির কুণ্ডুপাড়ার অনতিদূরবর্তী চাপড়ার সাঁওতা গ্রামে হরিনাথের বিবাহ হয়।[২২] এই সাঁওতা গ্রামটি ছিল ভাঁড়ারা গ্রামের সন্নিকট। এই ভাঁড়ারা গ্রামে ছিল সাধক লালন ফকিরের বসতভিটা। হরিনাথের স্ত্রীর নাম স্বর্ণময়ী। হরিনাথ-স্বর্ণময়ী আট (৮) সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। আট সন্তানের মধ্যে পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের নাম যথাক্রমে—সতীশচন্দ্র, বাণীশচন্দ্র, বিজয়, বসন্ত এবং সুরেন্দ্র। কন্যাদের নাম—আনন্দময়ী, চপলা ও যোগমায়া।[২৩] পুত্রদের মধ্যে বিজয় ও বসন্ত শৈশবেই গতায়ু হন। হরিনাথের লেখা উপন্যাস, কবিতা-গানে তাঁর পুত্রকন্যাদের নাম (বিজয়, বসন্ত, আনন্দময়ী, চপলা যথাক্রমে 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস, 'আনন্দময়ীর আগমনে' গীতিকবিতায় এবং 'চিত্তচপলা' উপন্যাসে) বিভিন্নভাবে উপস্থিত হয়েছে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ (এপ্রিল ১৬, ১৮৯৬) বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হরিনাথের জীবনাবসান হয়।[২৪] ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হরিনাথ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় জলধর সেন এক জায়গায় লিখেছেন : হরিনাথ তাঁর 'সাধ্বী স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই, শুধু আছে তাঁহার নাম, আর আছে তাঁহার সারবান গ্রন্থরাশি।'[২৪]

১৩০২ বঙ্গাব্দের ২২ চৈত্র হরিনাথের জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেবার তাঁর জীবন রক্ষা হয়। এর আগে বহুবার তিনি অসুস্থ হয়েছেন, কর্মজগত থেকে সাময়িক বিশ্রাম নিয়েছেন, একটু সুস্থ হলেই আবার কর্মাঙ্গনে ফিরে এসেছেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, পরিমিত আহারের অসংকুলান, তার ওপর সংসার নির্বাহ ও গ্রামবার্তাপ্রকাশের নিরন্তর চিন্তা, দেনাগ্রস্ততা এবং সর্বোপরি জীবন-বিপন্ন-হওয়ার-সম্ভাবনার মধ্যে কালাতিপাতের দরুন হরিনাথ ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এ সময় একবার তাঁকে একমাসেরও বেশি সময় বিভিন্ন কারণে বাটিকামারার মাঠে 'রাস্তার মধ্যে' অতিবাহিত করতে হয়েছিল।[২৬] ক্ষয়রোগে তাঁর জীবনদীপের রুগ্ন শিক্ষা অবশেষে নির্বাপিত হয়।

হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর তিন প্রধান সাহিত্য শিষ্য সমসময়ের তিনটি পত্রিকার গুরুর স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় গুরুর স্মৃতিতর্পণ করেছেন একবারই। দীনেন্দ্রকুমার রায় করেছেন বারকয়েক; আর জলধর সেন প্রায় সারাজীবনই বিভিন্ন লেখায় গুরু হরিনাথকে অমর করে রেখেছেন।

হরিনাথের মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই লিখেছিলেন :

> ...'বিজয় বসন্ত' প্রণেতা হরিনাথ মজুমদার বাঙলা সাহিত্য জগতে সুপরিচিত হইলেও, তাঁহার জীবন কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত নহে। আমাদের দেশে জীবিত

সাহিত্যসেবকদিগের সমাদর নাই, সংবাদপত্রেও তাঁহাদের জীবনী বা প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয় না। সেইজন্য কি জীবনে, কি মরণে, তাঁহারা চিরদিনই অনাদরে পড়িয়া থাকেন।

হরিনাথের জীবনকাহিনী নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দারিদ্র্যের কথায় পরিপূর্ণ। কলিকাতার ন্যায় গুণগ্রাহী বিদ্বৎসমাজের বুকের মধ্যে থাকিয়া, ধনকুবের মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির হৃদয়বন্ধু অমর কবি মধুসূদন দত্ত যে দেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবন বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লীসমাজে বাস করিয়া, জরাজীর্ণ পর্ণকুটীরের মধ্যে ছিন্নকন্থাশায়ী হরিনাথ যে অনাদরে জীবন বিসর্জন করিলেন, তাহাতে আর দুঃখ কি?[২৭]

আর দীনেন্দ্রকুমার রায়, অক্ষয়কুমারের পূর্বোক্ত রচনার অব্যবহিত পরে লিখেছিলেন:

....কাঙাল হরিনাথের (হরিনাথ মজুমদার) মৃত্যুতে বাংলাদেশের একটি অংশে লোক-কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে; যাহারা তাঁহাকে জানিত, ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধাভক্তি করিত তাহাদিগের ত কথাই নাই, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি যাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন...তাঁহারাও তাঁহার মৃত্যুতে সন্তপ্ত ও ব্যথিত। সত্য বটে তিনি সমগ্র দেশের উপর একটা বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া যান নাই....কিন্তু এক প্রদেশের এক অংশে, শিক্ষাবিহীন অজ্ঞানান্ধকারপরিবৃত হীন সমাজে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করেন, প্রতাপশালী জমিদার, মহাজন ও নীলকরের অখণ্ড অত্যাচারের হস্ত হইতে দীন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন বিপন্ন করিয়াও যেরূপ সংগ্রাম করেন এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অভাব মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বীরের ন্যায় যেরূপ জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাতে তাঁহার আসন মানব-হিতব্রত সন্ন্যাসীবর্গের সমশ্রেণীতে নির্দিষ্ট হইতে পারে।[২৮]

অক্ষয়কুমারের রচনায় হরিনাথের 'অনাদরে' মৃত্যুর জন্য মর্মস্পর্শী ক্ষোভ-চঞ্চলতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে হরিনাথের কর্মধারার সারাৎসার।

## তথ্যপঞ্জি


১। অশোক মজুমদার : স্মৃতিতর্পণ। দৈনিক কুষ্টিয়া। বাঙলাদেশ। জুলাই ২১, ১৯৯৬। পৃ. ২

২। Hiteshranjan Sanyal : Social Mobility in Bengal. Papyrus. Calcutta 1981 Edn. p. 40-41, 48-49 and 97

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরিনাথ মজুমদার। সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৩৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫

৪। আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত) : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ। বাংলা একাডেমী ঢাকা। পৌষ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩০-৩১

৫। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৭৮০

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত। পৃ. ৬

৭। দীনেন্দ্রকুমার রায় : কাঙাল হরিনাথ। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১০৭

৮। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৭৮০

৯। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত (মোহিত রায় সম্পাদিত)। প্রজ্ঞা প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫-৬

১০। ভারতবর্ষ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৮০

১১। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৭-৮

১২। ভারতবর্ষ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৮০

১৩। কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। প্রথম খণ্ড। ময়মনসিংহ। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩৭৭-৭৮

১৪। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৩

১৫। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : কাঙাল হরিনাথ। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২১

১৬। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৩

১৭। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র। পঞ্চম খণ্ড : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২। প্যাপিরাস। কলকাতা। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২০৩

১৮। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৪

১৯। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৩২০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫

# সমাজসেবা

প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে না পারায় হরিনাথের দুঃখের অন্ত ছিল না। আর এজন্যই অন্য বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করার চেষ্টায় তিনি সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামের দরিদ্র বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের কাজকে হরিনাথ তাঁর জীবনের একটি পালনীয় ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন একুশ বৎসর পূর্ণ হয়নি, এমনই সময় জানুআরি ১৩, ১৮৫৪ তারিখে তিনি কুমারখালিতে একটা বাঙলা পাঠশালা স্থাপন করে নিজে বিনাবেতনে ছাত্রদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেন।[১] প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী হরিনাথ শিক্ষাদানের স্বার্থে নিজে শেখার সক্রিয় ও সজীব প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় ছিলেন হরিনাথের বাল্যবন্ধু। তিনি তখন পাবনা স্কুলের শিক্ষক। ছুটি উপলক্ষে যখনই তিনি বাড়ি আসতেন, হরিনাথ তাঁর কাছে গিয়ে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয়' শিখতেন। মথুরানাথ যখন কুমারখালি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক হয়ে আসেন, তখন হরিনাথের নিজের শেখার এবং ছাত্রদের শেখানোর কাজটি অধিকতর সহজ হয়ে ওঠে।[২] হরিনাথের পরিশ্রম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ফলে হরিনাথকে আর অবৈতনিক থাকতে হয়নি। তাঁর বেতন হয় এগারো টাকা। বিদ্যালয়টির উন্নতি দেখে সরকার বিদ্যালয়টিকে মাসিক এগারো টাকা সাহায্য দিতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫ জন।[৩] চারটি শ্রেণী। তিনজন শিক্ষক। সমসময়ে 'পূর্ব্ব ভাগের বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত এচ. উড্রো' সাহেব হরিনাথের বিদ্যালয় পরিদর্শনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়টির জন্য মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন।

বিদ্যালয়টির ক্রমোন্নতির পর্যায়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক হরিনাথের বেতন নির্ধারণ করেন কুড়ি টাকা। কিন্তু এই কুড়ি টাকা গ্রহণ করলে যেহেতু অন্য সহশিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়, হরিনাথ তাঁর প্রিয় সহশিক্ষকদের স্বার্থে মাসিক পনেরো টাকা গ্রহণ করে[৪] তাঁদেরও বেতন বৃদ্ধির সুযোগকে অবারিত করেছিলেন।

স্ত্রীজাতিকে হরিনাথ বিদ্যাসাগরের মতোই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি নিজেও ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োগ-প্রচেষ্টায় তিনি নিজের বাড়িতেই *'একটি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া কয়েকটি বালিকাকে'*[৫] শিক্ষাদানের কাজ স্ব-উদ্যোগেই শুরু করেছিলেন। নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এই বালিকা বিদ্যালয় হরিনাথ

স্থাপন করেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। হরিনাথ তাঁর বাঙলা পাঠশালায় 'ইংরেজি শিক্ষার' পদ্ধতি অনুসারে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে এই বালিকা বিদ্যালয়েও তিনি 'যে প্রণালীতে শিক্ষাদান' করতেন, তা বালিকাদের পক্ষে অত্যন্ত 'কল্যাণকর' বিবেচিত হয়েছিল।[৬] 'ভাল ভাল পুস্তক' পাঠের সঙ্গে 'সামান্য' হিসাবরক্ষার পাঠ যেমন যুক্ত হয়েছিল, তেমনই 'সূচীকার্য্য' শিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সমসময়ে কুমারখালিতে হরিনাথের এই বালিকা বিদ্যালয়টি স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসারে একটা 'বিশেষ ভূমিকা' পালন করেছিল।[৭]

লেখাপড়া ত্যাগ করে গুণ্ডার দলে যে সব ছেলেরা প্রবেশ করে আধুনিক পরিভাষায় সমাজবিরোধী হয়ে উঠেছিল, সেইসব দুর্দান্ত ছেলেদের 'হিতার্থে' মথুরানাথ মৈত্রেয়র সহযোগিতায় হরিনাথ স্বগৃহের চণ্ডীমণ্ডপে পঠন সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রতি শনিবার বেলা চারটার পর সমিতির কাজ শুরু হতো। এখানে সংবাদ প্রভাকর, এজুকেশান গেজেট প্রভৃতি পত্রিকা রাখা হতো এবং সেইসব পত্রিকা থেকে 'পালাক্রমে' পড়াও হতো। এইভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে গুন্ডাপ্রকৃতির ছেলেদের অনেকের মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল। 'অনেকে গুণ্ডার দল পরিত্যাগপূর্ব্বক কাজের লোক হইয়া পরবর্তীকালে যশঃ ও অর্থোপার্জন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।' এতো গেল পঠন সমিতির কথা। নৈশ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হতো প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে। এই নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে হরিনাথের সহযোগী ছিলেন মথুরানাথ মৈত্রেয় এবং গোপালচন্দ্র সান্যাল। এই নৈশ বিদ্যালয়ে এঁরা ইংরেজি পড়াতেন, আর স্বয়ং হরিনাথ পড়াতেন বাংলা। এই নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ে অনেকে পরবর্তীকালে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে 'প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ' হয়েছিলেন।[৮]

নিজে যতদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ততদিন শিক্ষকরূপী যমদূতের সঙ্গে হরিনাথ নিজে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছাত্র-দরদিভাব তিনি লক্ষ্য করেননি। তাঁদের ছাত্রনিগ্রহ তাঁকে ব্যথিত করতো। নিজে শিক্ষকতার ব্রতযুক্ত হওয়ার সময় হরিনাথ এসব কথা মনে রেখেছিলেন এবং নিজেকে আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। হরিনাথের বাঙলা বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পঠন সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষাদানপ্রণালী ও সহশিক্ষকদের সঙ্গে আচার-আচরণ তাঁকে একজন ছাত্রদরদি ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। হরিনাথের পত্রিকা-পরিচালনা, বাউলগানের দল পরিচালনা প্রভৃতি কাজে এইসব ছাত্ররাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সক্রিয় সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন। শিক্ষক হরিনাথের শিক্ষাদর্শের সার্থকতা এখানেই। হরিনাথের শিক্ষাব্রত সম্পর্কে জলধর সেন লিখেছেন :

> আমরা হরিনাথের ছাত্র, শিক্ষকতা কার্য্যে কেশ পরিপক্ক হইয়া আসিল, অনেক স্থানে এ পর্যন্ত অনেক শিক্ষক দেখিয়াছি কিন্তু হরিনাথের ন্যায় শিক্ষাদানে

> নিপুণ, ক্ষমতাশালী শিক্ষক এ পর্য্যন্ত একজনও দেখিলাম না। কিরূপভাবে শিক্ষা দিলে একটি নূতন বিষয়ও বালকবালিকাগণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহা সহজে তাহাদের আয়ত্ত হয়, তাহা তিনি উত্তম জানিতেন। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ হইলে তিনি শিক্ষকশ্রেষ্ঠ স্পেনসারের সমান সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন।[৯]

শিক্ষাব্যাতীত বালক-বালিকাদের কুপথ থেকে ফিরিয়ে স্বাভাবিক জীবনধারার মূলস্রোতে নিয়ে আসা যায় না বলেই হরিনাথ মনে করতেন। অশিক্ষার অন্ধকারের বিরুদ্ধে শিক্ষার আলোকসংগ্রামে তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত সৈনিক। কোনরকম সংকীর্ণ মনোগত চিন্তাভাবনার বাইরে তিনি চিন্তাবিন্যাসের বাস্তবায়নের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষার উন্মেষের চিন্তার সঙ্গে তিনি সঠিকভাবে যুক্ত করেছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাস্তব অনুশীলন। সংগ্রামের কথা এজন্যই, যে, সমসময়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রীতিমতো লড়াই করে বিদ্যালয় সংস্থাপন করতে হয়েছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রভর্তির প্রশ্ন ও তারও চেয়ে বড় যে প্রশ্ন, দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকতার কাজ পরিচালনা—এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রয়োজননিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ক্ষেত্রেও হরিনাথ ছিলেন অনন্য এবং অসাধারণ। বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে সমস্তরকম প্রতিকূলতাকে তিনি সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করেছিলেন। সেসময়ে স্ত্রীশিক্ষার নামে 'সকলেই' আতঙ্কিত হতেন। স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখলে 'বিধবা' হয় এই অমূলক বিশ্বাস সেসময় 'শিক্ষিতপ্রধান রাজধানী' সহ পাড়াগাঁয়ে তো ছিলই। বাস্তবিক মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে—এছিল সমসময়ের দিগ্‌ব্যাপ্ত প্রচার। এসব কথা মেয়েদের মা-বাবার মনের ওপর চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র অগাস্ট ১৬, ১৮৫৮ তারিখের সংখ্যার স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হরিহরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর (যিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী) কথাবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে পদ্মাবতীর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির বাড়ি গিয়াছিনু সেখানে মাসী পিসী সকলেই এসেছিলেন, তাদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলিলে তাঁহারা সকলে বললেন মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেউ বল্‌লে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে রাঁড় হয়। মাগো সে কথাটা শুনে অবধি আমার মনটা ধুক পুক কর্‌ছে।....আমার মেয়ে অমনি থাকুক। যে কয়দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাইবার জন্য চূড়ামণিকে দিয়া ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।[১০]

এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হরিনাথ ব্রতচ্যুত হয়ে পিছিয়ে আসেনি। তাঁর 'অদম্য তেজ ও উৎসাহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে জানিত না।' তাঁর কাছে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গবিশেষ বলে বিবেচিত হতো। 'সমাজের এক অঙ্গকে যদি শিক্ষার দ্বারা উন্নত করা হয়' তবে অপর অঙ্গকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হরিনাথের দৃঢ় অভিমত ছিল : 'সমাজের মঙ্গলের জন্য যেমন বালক-শিক্ষার প্রয়োজন, তদ্রূপ বালিকা শিক্ষার প্রয়োজন।'[১১] এই চিন্তাচর্চার জায়গা থেকে তিনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচার-প্রসারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন।

এভাবে শিক্ষাদানের বাইরেও তিনি তাঁর চিন্তাচর্চাকে প্রসারিত করেছিলেন। শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, গ্রামের যুবকরা যাতে 'নির্দোষ' আমোদ উপভোগ করে সময় অতিবাহিত করতে পারে তার জন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, যাত্রা, পাঁচালি ও কীর্তন রচনা করে স্থানীয় যুবকদের দ্বারা যেসব অভিনয় করাতেন।[১২] এখানেই হরিনাথ থেমে থাকেননি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিবারণ এবং নীলকর-জমিদারদের অত্যাচার-প্রপীড়ন থেকে অসহায় দরিদ্র প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুবিচার প্রার্থনাকে হরিনাথ জরুরি প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছিলেন। শরীরী শক্তি প্রয়োগে তিনি অনেক সময়ই বেশকিছু সংখ্যক অত্যাচারী নীলকরদের এলাকা-ছাড়া করা সত্ত্বেও হরিনাথ এই বোধে উপনীত হতে দ্বিধা করেননি যে নীলকর-অত্যাচার থেকে প্রজাদুর্দশার কোন স্থায়ী সমাধান এই প্রক্রিয়ায় নেই। তাছাড়া জমিদারদের প্রজাপীড়ন তো আছেই। সেক্ষেত্রে এই দাওয়াই খাটবে না। তাঁর সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত ছিল। প্রথমত, সংঘশক্তি সংগঠনের মাধ্যমে এর প্রতিকারে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মাধ্যমে অসহায় প্রজাবর্গের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ সরকারের কাছে জানিয়ে এর প্রতিকার বিধান করা। তাছাড়া হরিনাথ জেনেছিলেন যে বাঙলা সংবাদপত্রের মর্ম অবগত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার একটি অনুবাদ কার্যালয় খুলছেন।[১৩] এর দায়িত্বে থাকছেন রবিন্সন সাহেব। হরিনাথ এই সংবাদে আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছিলেন এই কারণেই যে তাঁর পরিবেশিত সংবাদ অনুবাদের মাধ্যমে সরকারের কর্ণগোচর হবে সহজেই। হরিনাথ এই দ্বিতীয় পথটিকেই অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর*-এ গ্রামীণ সমস্যার বিভিন্ন বিবরণ পাঠানো সত্ত্বেও তাঁর মন ভরছিল না। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার গুরু হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে হরিনাথের মতের মিল ঘটছিল না। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাব হরিনাথ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর বিরোধকে প্রকটিত করেছিল। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। হরিনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে দৃঢ় এবং সক্রিয় অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার

মাধ্যমে মেয়েরা চাকরি করুক, তা চাইতেন না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল : 'আমরা স্ত্রী জাতির উচ্চশিক্ষার দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জনের প্রত্যাশা করি না।'[১৪] এখানে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরোধিতা করেও শেষ পর্যন্ত আর এক ধরনের রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে হরিনাথের আর একটি বিষয়ে বিরোধ হয়েছিল। এই বিরোধ ছিল নিপীড়িত প্রজার স্বার্থরক্ষার বিষয়ে। প্রজাস্বার্থরক্ষার ব্যাপারে হরিনাথ তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অনেক সময়েই তর্কবিতর্ক করতেন। প্রজাপীড়নের ক্ষেত্রে হরিনাথ দেশি জমিদার আর নীল ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন পার্থক্য রেখা টানতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যাপারে হিন্দু পেট্রিঅট পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর মতভেদ হয়েছিল। মথুরানাথ মৈত্রেয় এবং হরিনাথ নীলকরদের অত্যাচার সংক্রান্ত খবরাখবর একই সঙ্গে সংবাদ প্রভাকর এবং হিন্দু পেট্রিঅটে পাঠাতেন। হরিনাথের পাঠানো সংবাদ পেট্রিঅট ইংরেজিতে তর্জমা করে নিত। কিন্তু 'জমির মাপে ও ফসলের মাপে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও দাদনের ব্যবসায় দেশী বিদেশীদের মধ্যে' হরিনাথ কোন 'প্রভেদ' দেখেননি। এই প্রশ্নে পেট্রিঅটের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বে তিনি পেট্রিঅটের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করেছিলেন।[১৫]

এসব ঘটনা হরিনাথকে সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্তে উপনীত করে। কারণ তাঁর ধারণাই হয়েছিল নিজের পরিচালনাধীনে সংবাদপত্র না থাকলে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। প্রভাকর ও পেট্রিঅটে সংবাদ লেখার এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকাপাঠের মাধ্যমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি নিয়েই ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে (এপ্রিল ১৮৬৩) হরিনাথ প্রকাশ করতে থাকেন তাঁর সুবিখ্যাত 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'। এটি ছিল গ্রামবার্তার মাসিক সংস্করণ। এরপর ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৯) থেকে প্রকাশিত হতে থাকে গ্রামবার্তার পাক্ষিক সংস্করণ এবং ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে (এপ্রিল ১৮৭০) গ্রামবার্তার সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শুরু করে ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত মোট দীর্ঘ সাড়ে বাইশ বছর ধরে গ্রামবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রামবার্তা-পর্যায়ে হরিনাথ নিজের সমস্ত সামর্থ্য উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই সংবাদপত্র-এর কাজ ও দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য হরিনাথ শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতার চাকরি পর্যন্ত ত্যাগ করে সর্বক্ষণের জন্য সংবাদপত্রের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থেকেছেন। গ্রামবার্তায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-নির্ভর সংবাদে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল এবং পরিণতিতে গ্রামের মানুষের পক্ষে সুফল ফলেছিল। তাছাড়া এই পত্রিকাকেই কেন্দ্র করে হরিনাথ কুমারখালিতে গড়ে তুলেছিলেন একটি সাহিত্যের পরিমণ্ডল, যা ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বেশ কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিল

## তথ্যপঞ্জি


১। আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। বাংলাদেশ। ১৯৮৮ সংস্করণ। পৃ. ১৯

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬

৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮

Dictionary of National Biography (Vol-III), Ed. S. P. Sen. Institute of Historical Studies, Calcutta. 1974 Edn. p. 22-23

৪। প্রাগুক্ত

৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। ভারতবর্ষ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৮১

৬। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৮

৭। আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১

৮। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭-৮

৯। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৮

১০। স্বপন বসু : বাংলার নবচেতনার ইতিহাস। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ১৯৮৫ সংস্করণ। পৃ. ৩০৫

# সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ সময়েও হরিনাথের গ্রামে সংস্কৃতিচর্চার সুস্থ ও সজীব দিকটির বিকাশ ছিল কার্যত অবরুদ্ধ। শহর কলকাতার আলোর ঝলকানি শহরের সীমারেখা পার হয়ে বাঙলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামদেশের অন্ধকারের মালিন্যে ভাঙনের রূপালি রেখার অঙ্কনে সমর্থ হয়নি। হাঁটা পথে কলকাতা থেকে দশ-বারোদিনেরও অধিক পথের দূরবর্তী কুমারখালিতে কলকাতার নগর-সভ্যতার কলস্রোত এসে পৌঁছায়নি। অথচ ততদিনে গোঁড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের বিদ্রোহ, ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ও দেবেন্দ্রনাথের হাতে তার বিকাশমুখীনতা সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কোন ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যুক্ততা ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মীয়সংস্কারের বিরুদ্ধে মানবতাবোধের জায়গা থেকে ঘোষিত একক সংগ্রামে ব্রাহ্মসহ সমাজের শিক্ষিত প্রগতিশীল অংশকে সামিল করে এক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলন রক্ষণশীলদের বাধার প্রাচীর টপকে গ্রামগঞ্জে বার্তাবাহী হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিধর্মী ও বিজ্ঞানমনস্ক রচনা শিক্ষিতমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এ সময় হরিনাথ দুচোখ ভরে প্রত্যক্ষ করছেন কুমারখালি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে নীলকর-মহাজন-জমিদারদের নির্মম প্রজাশোষণের দিকচিহ্নগুলি। অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে যাওয়া হতভাগ্য মানুষজনের জন্য তিনি আন্তরিক ব্যথা অনুভব করেছেন। বালক ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজেই শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব নিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। সংবাদ প্রভাকরে এবং হিন্দু পেট্রিঅটে গ্রামের মানুষজনের দুঃখদুর্দশা ও অত্যাচার-নিপীড়নক্লীষ্টতার সংবাদ পাঠিয়ে তার সুরাহা প্রত্যাশা করছেন। একই সঙ্গে লক্ষ্য করছেন নীলকর-জমিদারদের অত্যাচার-প্রপীড়নে ওষ্ঠাগত-প্রাণ গ্রামবাসীরা নিরুত্তাপ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। গ্রামের শিক্ষিত মানুষজন যাঁরা, তাঁরাও 'নিতান্ত অকর্মণ্য জীবন' অতিবাহিত করছেন।[১] সেসময়ে মেয়েরা শুধু ঝুমুর পাঁচালি শুনতে ভালোবাসতেন, পুরুষেরা তরজা ও কবির লড়াইয়ে আমোদ উপভোগ করতেন। আর সাহিত্য আলোচনা বলতে চিল 'ঈশ্বর গুপ্ত ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের অপাঠ্য কুৎসা কষায়িত কবিতা পাঠ।'[২] এতেই তাঁরা জীবন ধন্য করতেন।

সেসময়ে সাধারণ জনজীবনও ছিল নিস্তরঙ্গ। শতাব্দী-প্রাচীন সাংস্কৃতিক মনন পুরোমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল। সেসময় জনসাধারণের রুচিও ছিল 'ভিন্নরূপ'। 'অধিকাংশ পল্লীবাসী' সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় কারও 'চণ্ডীপগুপে বা পণ্যালয়ে' সমবেত হয়ে মাটির প্রদীপের রুগ্ন আলোয় বসে রামায়ণ-মহাভারতের 'মধুর গাথা' শুনতেন। 'সন্ধ্যা সমাপনের' আগে থেকেই কথক ঠাকুরের দল গ্রামে গ্রামে বর্ধিষ্ণু পরিবারের গৃহ-সংলগ্ন 'ছায়ামণ্ডপে' বসে মালাচন্দনে 'বিভূষিত' হয়ে কথকতা প্রচার করতেন। আর সেখানে জড়ো হতো গ্রামের বালক থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই। সন্ধ্যার পর কোথাও হরিনাম সংকীর্তন হতো, কোথাও 'রাম-রসায়ন' হতো। উৎসবের সময় গ্রামদেশে 'যাত্রা, পাঁচালী,ঢপ, কবি ও তরজার ধুম' পড়ে যেতো। এসবের মধ্যে দিয়ে অবশ্য 'ঠাকুর দেবতাগণের পবিত্র' কথার আলোচনাই হতো। তখন 'বাঙ্গালায় ধন ছিল, ধান ছিল, বাঙ্গালীর মনে সুখ ছিল।' তখন সংবাদপত্রের প্রচার-প্রসারতার দিন আসেনি। এহেন পল্লিবাসীরা রাজনৈতিক আন্দোলনকে 'নিষ্ফল' মনে করে কোনরকম উৎসাহ এ ব্যাপারে দেখাতো না।[৩]

হরিনাথ সমসময়ের পল্লিগ্রামের এই চিত্ররূপ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য-শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও, তাঁর অভিভাকত্বে হরিনাথের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও, হরিনাথ গুপ্ত কবির অশ্লীল কবিতাচর্চাকে কোনদিন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন অশ্লীল ভাব ও চিন্তার একান্তই বিরোধী। বলা যায় এদিক থেকে হরিনাথ ছিলেন যথেষ্টরকম বিশুদ্ধতাবাদী। পল্লিবাসীর চোখে শিক্ষার আলো দেওয়ার ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হরিনাথ সংস্কৃতির বহমান ধারার পরিবর্তন চাননি। তিনি তাঁর বিশুদ্ধতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে সমাজে সংস্কৃতির চলতি ধারাস্রোতকে বহাল রেখে তার বিকাশের প্রত্যাশী ছিলেন। 'অনর্থক দলাদলি, পরনিন্দা, কুৎসা এবং মন্দকার্য্যে কালাতিপাত' ব্যতিরেকে গ্রামের মানুযজন যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান, সংকীর্তনে আগ্রহী হন, এটাই ছিল হরিনাথের চিন্তায় প্রার্থীত দিক। আর এজন্যই তিনি সংকীর্তন, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রা এবং 'সাধারণের আমোদজনক সদ্ভাবপূর্ণ সংগীত' রচনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।[৪] নিজে নাটক লিখে তিনি গ্রামের ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করাতেন।

সেসময় বাহারদানেশ, চাহার দরবেশ, বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার প্রভৃতি 'গ্রন্থই উপন্যাসের স্থান' নিয়ে ছিল। এসব গ্রন্থ পাঠে 'পাঠকের মনে কুৎসিত ভাবই উদ্দীপিত' হতো।[৫] বাহারদানেশ সম্পর্কে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। বাহারদানেশ একটি বৃহৎ গদ্যকাব্য। এই 'উপন্যাসটি' আসলে একটি প্রেমকাহিনি। এই কাহিনিতে 'নারীজাতির অসতীত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নিন্দনীয় চরিত্রের উপাখ্যান' আছে। 'নারীনিন্দার কাহিনীগুলি....জঘন্য।' এই গল্পের ন্যায় 'অশ্লীল গল্প' অন্যভাষাতেও বিরল। এই গ্রন্থ কোনমতেই বালকদের পাঠ্যপুস্তক হওয়ার যোগ্য নয়।[৬]

এ হেন পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষের সুস্থ রুচির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হরিনাথ 'উপন্যাস সৃষ্টির আদি যুগে' লেখেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস। এই 'বিজয়বসন্ত' বাঙলা ভাষায় লেখা অন্যতম প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে।[৭] 'বিজয়বসন্ত' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৭৮১ শকে, অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। 'বিজয়বসন্ত' প্রথমে পদ্যে রচিত হয়, তবে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে হরিনাথ শিষ্য জলধর সেন জানিয়েছেন।[৮] কিন্তু এই পদ্যোপন্যাস কবে রচিত হয়েছিল, তা তিনি জানাননি। তবে কাঙাল হরিনাথের এক পৌত্রের লিখিত স্বাক্ষ্যে জানা যায় পদ্যে বিজয়বসন্ত লেখা হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে।[৯] তখন এই বিজয়বসন্ত অভিনীত হতো। হরিনাথের অন্যতম সাহিত্য শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন :

> শৈশবে আমরা 'বিজয়বসন্ত' যাত্রার দলে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি। এখনও মনে পড়ে কত বৃদ্ধ শ্রোতা করুণরসের প্রস্রবণস্বরূপ 'বিজয়বসন্ত' নাটকের অভিনয় দর্শনে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই;....চিত্র হিসাবেও বিজয়বসন্ত খাঁটি ভারতীয় চিত্র। এই চিত্রের কোনও স্থানে বৈদেশিক সাহিত্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় না।[১০]

### তথ্যপঞ্জি


১। জলধর সেন : হরিনাথ মজুমদার। দাসী, জুন ১৮৯৬। পৃ. ৩০৫

২। জলধর সেন : প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৫

৩। দীনেন্দ্রকুমার রায় : বঙ্গ সাহিত্যে হরিনাথ। মানসী। আষাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৬৬৬

৪। দীনেন্দ্রকুমার রায় : কাঙাল হরিনাথ। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১০৮

৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫

৬। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০

৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। বিশ্ববাণী। কলকাতা। ১৯৮৩ সংস্করণ। পৃ. ১০৪

৮। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫

৯। অতুলকৃষ্ণ মজুমদার : কাঙাল হরিনাথ ও তৎকালীন পত্রপত্রিকা। কাঙাল হরিনাথ স্মরণিকা-১, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। কুমারখালি। পৃ. ১৫

১০। দীনেন্দ্রকুমার রায় : বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথ। মানসী, আষাঢ় ১৩২১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৬৬৫

# কাব্যসরস্বতীর সেবক হরিনাথ

বালক বয়স থেকেই হরিনাথ স্বভাব কবি ছিলেন। এ তথ্য জানা যায় হরিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্রের লিখিত কাঙাল হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং জলধর সেনের কাঙাল-জীবনী থেকে। অল্পবয়স থেকেই কুমারখালির সংকীর্তন অনুষ্ঠান ও কবির লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে নিয়মিত দর্শক-শ্রোতা হিসেবে তিনি হাজির থাকতেন। অভিভাবকহীন বাউণ্ডুলে জীবনচর্যায় এই সুযোগ তাঁর কাছে অবারিত ছিল। কুমারখালিতে কীর্তনের খুব প্রচলন ছিল। সমস্ত রাত্রি জুড়ে সংকীর্তনানুষ্ঠান চলতো। অনেকের সঙ্গে স্বভাবকবি হরিনাথও তাৎক্ষণিক পদ-রচনা করে সেই অনুষ্ঠানে স্বকণ্ঠে গাইতেন। হরিনাথের গান শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী যেমন বিস্মিত হতো, তেমনি অনেকে অশ্রুসম্বরণ করতে পারতো না। হরিনাথের জীবনীকার লিখেছেন :

> অনেকে সেই সকল গান শুনিয়া ভাবে গদ গদ হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন ও আনন্দে নৃত্য করিতেন। তাঁহার রচিত কবির গান ওস্তাদী দলের গান হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না।[১]

কবির লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে থাকতে হরিনাথ একসময় এই লড়াইয়ে অংশ নিতে শুরু করেন। হরিনাথের গানের 'বাঁধুনি ও বিষয় গৌরব' অনেক ওস্তাদের তুলনায় 'উৎকৃষ্ট' ছিল। তবে কবির লড়াইয়ে যে অশ্লীলতার প্রবণতা ছিল, হরিনাথ সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। অশ্লীলতা তিনি আদতে বরদাস্ত করতে পারতেন না। কবির লড়াইয়ে অংশ নিতে গিয়ে তিনি যে বাঁধনদারির কাজ করতেন, সেখানে অশ্লীলতার নামগন্ধ ছিল না। এরকম কবির লড়াইয়ে সারারাত তীব্র প্রতিযোগিতার পর অবশেষে 'হরিনাথের দলই জয়মাল্য গ্রহণ' করাত।[২] হরিনাথের এই স্বভাবকবিত্ব পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা ও গীতিরচনার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছিল।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সম্বাদপ্রভাকর'-এ হরিনাথের কবিত্বশক্তির প্রথম প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। প্রভাকরে তিনি যেমন গ্রামীণ সংবাদ-প্রতিবেদন পাঠাতেন, তেমনই মাঝে মধ্যে তাঁর কবিতাও পাঠাতেন প্রকাশের অদম্য ইচ্ছার বশবর্তিতায়। জুন ১৮, ১৮৫৭ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে হরিনাথের দুটি 'পদ্য' প্রকাশিত হয়। হরিনাথ ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি নাগাদ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে একটি চিঠি সহ 'কতিপয় পদ্য' প্রকাশার্থ পাঠান। চিঠিটি নিম্নরূপ :

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়। মল্লিখিত কতিপয় পদ্য রচনা সংশোধিত করত ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক প্রান্তে স্থান দানে পদ্য রচনোৎসাহোৎসুক করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদনেতি।

কুমারখালী বাধিত

১২৬৪ সাল ১২ বৈশাখ শ্রী হরিনাথ মজুমদার[৬]

কবি সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হরিনাথের সেই 'কতিপয় পদ্য'-এর মধ্যে থেকে দুটি পদ্য মাত্র প্রকাশের জন্য বিবেচিত করেছিলেন এবং প্রায় দেড় মাস পর প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন। পদ্যদুটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি :

**ত্রিপদী**

জয় জয় হে মুকুন্দ, পরমাত্মা চিদানন্দ,
অনন্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিতা।
নির্ব্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়
নিরঞ্জন নিখিল নির্ম্মাতা।

এবং

**পয়ার**

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজয় সর্ব্ব ফলদাতা।
বিশ্বহর্ত্তা বিশ্বকর্ত্তা বিভু বিশ্বত্রাতা।
* * *
মনের নিয়ন্তা হও, জ্ঞাত মন গতি।
পরিপূর্ণ কর আশা, অগতির গতি।

এখানে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, হরিনাথ তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে রীতিমতো কবিযশোপ্রার্থী হয়ে কবিতা লিখেছেন এবং সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকের কাছে সেইসব কবিতাগুচ্ছ পাঠিয়েছেন। সম্পাদককে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন হরিনাথকে 'রচনোৎসাহোৎসুক' করে তোলেন। উদ্ধৃত দুটি পদ্যাংশে অনুপ্রাসের যে প্রবণতা, তা বলাই বাহুল্য, ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব-অনুসারিতার ফলশ্রুতি। গুপ্তকবিও এই গ্রামদেশের নতুন কবিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন দুটি পদ্য প্রভাকরে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হরিনাথ জীবনীতে হরিনাথের 'প্রাথমিক রচনা' হিসাবে অক্টোবর ২১, ১৮৫৭ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হরিনাথের 'টাকা' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পদ্যদুটিই প্রমাণ করে যে ১৮৫৭-র ২১ অক্টোবরের আগেও হরিনাথ প্রভাকরে পদ্য লিখেছেন। পূর্বোক্ত পদ্যে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রের প্রভাব যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনই পরবর্তীকালে লেখা হরিনাথের বিভিন্ন কবিতায়ও এই প্রভাব কোন-না-কোনভাবে থেকে গিয়েছিল। এঁদের 'বিশেষতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের' প্রভাব পুরোপুরি অতিক্রম করতে না পারলেও হরিনাথ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতার প্রভাব থেকে নিজেকে প্রথম থেকেই মুক্ত রেখেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্য-শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও এই জায়গায় হরিনাথ গুরুর সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

হরিনাথের কবিতা-নাটক-গদ্যরচনা বা উপন্যাসে লোকশিক্ষার বিষয়টি তাঁর চিন্তাশ্রয়িতায় প্রথম থেকেই প্রাধান্য পেয়েছিল। অশ্লীল রচনা ও ভাবধারা থেকে বালকচিত্তকে মুক্ত করতেই তিনি 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস লিখেছিলেন। অক্টোবর ২১, ১৮৫৭ তারিখের প্রভাকরে হরিনাথের 'টাকা' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার অন্তর্তরঙ্গে লোকশিক্ষার বিষয়াবলী সুপ্রকাশিত। পূর্বোদ্ধৃত পদ্যদুটির পরবর্তী চারমাসের মাথায় 'টাকা' শীর্ষক এই দীর্ঘ কবিতাটি তার ভাব ও বক্তব্যের নির্যাসে, প্রকাশভঙ্গিমার বিশিষ্টতায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর কয়েকছত্র উদ্ধার করছি :

তোমার কারণে লোক, লাঠালাঠি করে।
কত শত জমীদারে, গেল ছারখারে।।
তোমার কারণে ঘটে, অঘট ঘটনা।
পুত্র হয়ে জনকেরে করে প্রবঞ্চনা

পরের দৃষ্টান্ত আগে, দিয়ে এতক্ষণ।
নিবেদন করি কিছু, আত্ম বিবরণ।।
হই নাই যতদিন, তোমার অধীন।
অচিন্তায় কত সুখে, কাটায়েছি দিন।।
* * * *
সকলি করেছ তুমি, বাকী কি রেখেছ।
বন্ধু বিচ্ছেদের সূত্র, সূচনা করেছ।।
ইহা হোতে কষ্ট বল, কি আছে অধিক।
ধিক ধিক্ ধিক্ টাকা ধিক ধিক্ ধিক্।।

এখানে হরিনাথের প্রতিপাদ্য বক্তব্য প্রশ্নাতীত না হতেই পারে, তবে তাঁর কবিতাটি যে সমাজচেতনার আলোয় আলোকিত এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আগের পদ্যদুটির বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই কবিতাটির বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর আকাশপাতাল পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী গ্রামীণ কবি হরিনাথের এই কবিতার নিহিত বক্তব্য মনোনিবেশের দাবি রাখে। পূর্ব-উদ্ধৃত পদ্যদুটির বিপ্রতীপে বর্তমান কবিতাটি হরিনাথের মানসিক বিকাশের ও সমাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতরূপের পরিচায়ক।

এর প্রায় কুড়ি বছর পর হরিনাথের নিজের পত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় হরিনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যার নিহিত ভাব ও প্রকাশভঙ্গিমা আরও বেশি উন্নত ও পরিণত। আট পংক্তির পুরো কবিতাটিই উদ্ধার করছি :

বর্ষায় আকাশ ফর্সা, বর্ষা শীতকালে।
অকালে সমুদ্র বন্যা, কি আছে কপালে।।
তৃণ বিনে গাভী বৎস, রুগ্ন জীর্ণ জরা।
ধরার অসাধ্য আর ধরাভার ধরা।।
কারে বলি কেবা শোনে কাঙ্গালের কথা।
মরমে হাসিয়া যায় মরমের ব্যথা।।
নিতান্ত বিধাতা বাম ভারতের প্রতি।
নতুবা তাহার কেন এ হেন দুর্গতি।[৪]

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব এখানে স্পষ্ট। গুপ্ত কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশের পাঠেই এই প্রতীতি জন্মে :

বামনের অভিলাস ধরিবারে শশী
উর্ধ্বভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি।।
তুরঙ্গের খর গতি খর করে শখ।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক।।[৫]

তবে দুটি কবিতার চিন্তা ও ভাবগত দুস্তর পার্থক্যও এখানে স্পষ্টরেখা অঙ্কন করেছে ভাষা ও শব্দের ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থনায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেহেতু হরিনাথের সাহিত্য রচনার গুরু এবং পথপ্রদর্শক, সেইহেতু অন্য অনেকের মতো হরিনাথকেও তিনি আন্তরিক পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছিলেন এবং তাঁর পদ্য বা কবিতা প্রভাকরের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করে তাঁকে কবিতা 'রচনোৎসাহোৎসুক' করে তুলবেন এই প্রত্যাশা অত্যন্ত স্বাভাবিক। গুপ্তকবি হরিনাথের কবিতা সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে তা প্রভাকরে প্রকাশ করতেন। হরিনাথের প্রথম রচনা হিসেবে পূর্বোক্ত পদ্যদুটি প্রভাকরে প্রকাশিত হয় ১২৬৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথমে (জুন ১৮, ১৮৫৭)। গুপ্তকবি প্রয়াত হন ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ (জানুয়ারি ২৩, ১৮৫৯)। সুতরাং প্রথম পদ্যপ্রকাশের পর হরিনাথের সঙ্গে গুপ্ত কবির সংযোগ ঘটেছিল মাত্র দেড় বৎসরাধিক কাল। কবি হরিনাথকে গুপ্তকবির প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষণাদান, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়ার সময়সীমা মাত্র দেড়বছর। গুপ্ত কবির প্রয়াত হওয়ার চার বছরের মাথায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে (বৈশাখ ১২৭০ বঙ্গাব্দ) হরিনাথ স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা গ্রামবার্তার প্রকাশ শুরু করেন। স্বভাবতই গ্রামবার্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ প্রভাকর বা অন্য কোন পত্রিকায় তিনি আর লেখার অবসর পাননি।

হরিনাথ ছন্দোবদ্ধ পয়ারে যে সব পদ্য বা কবিতা রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই ছিল একটি সুনির্দিষ্ট নীতিশিক্ষার সম্প্রচার। 'টাকা' শীর্ষক পূর্বোক্ত কবিতা বা পদ্যে যেমন একটি নির্দিষ্ট নীতিকথার সন্ধান মেলে, অন্যত্রও তা সুলভ। এই নীতিকথার কথামালা হরিনাথের কাব্যকৃতিতে সুপ্রকট। হরিনাথের 'পদ্যপুন্ডরীক' বালকপাঠ্য পদ্যের বই। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থের 'নাশের হেতু' শীর্ষক পদ্যটিও এই একই প্রচার-প্রচারণার অঙ্গ বিশেষ। এই পদ্যে হরিনাথ লিখেছেন :

বুদ্ধি-নাশ হেতু, মাদক সেবন।
ঋদ্ধি-নাথ হেতু, জ্ঞাতি বিরোধন।।
স্বাস্থ্য-নাশ হেতু, রাত্রি জাগরণ।
ক্লান্তি-নাশ হেতু, অমূল চিন্তন।।

* * *

সুখ-নাশ হেতু, পর-সুখে দাহ।
সর্ব্বনাশ হেতু, বালক-বিবাহ।।

এখানে দেখা যাচ্ছে কবি হরিনাথ 'মাদক-সেবন'-কে এবং 'বালক-বিবাহ'কে 'বুদ্ধিনাশ' এবং 'সর্ব্বনাশ'-এর ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন। মাদকসেবন ক্রিয়াকে হরিনাথ কোনও দিন মেনে নিতে পারেননি। অন্য কবিতায়ও তিনি মদ্যপানের নিন্দা ও বিরোধিতা করেছেন। যশস্বী সমালোচক সুরেশচন্দ্র মৈত্র ১৮৫৮ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় প্রকাশিত 'উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যগ্রন্থ'-এর একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন। সেই তালিকায় তিনি হরিনাথ মজুমদারের 'পদ্যপুন্ডরীক'-কে 'উল্লেখযোগ্য' বাংলা কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন।[৬]

হরিনাথের শিক্ষাই ছিলো :

ধর্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম্ম সাজে কাজ নাই।।
কপটতা পরিহর।
ভাল হও ভাল কর।।[৭]

এই নিজে ভালো হয়ে অপরের ভালো করার মধ্যেই হরিনাথ জীবনের সার্থকতা সন্ধান করেছিলেন। নির্বিবাদ, নিষ্কলঙ্ক, সরল, সহজ জীবনাচরণের পক্ষপাতী হরিনাথ লিখেছেন :

মরণের দিন দেখ সব ফক্কিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার।।
আমি ধনী, আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলে দেখ একরূপ গতি।।
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কে চিনিতে পারে।
তবে কেন মর জীব ধন-অহংকারে।।

পুঁথি পড়, পাঁজি পড় কোরান-পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান।।[৮]

এই সত্যধর্মের সাধনায় হরিনাথ নিজেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যাপৃত রেখেছিলেন। তাঁর জীবনদৃষ্টি তাঁর পদ্য বা কবিতার অন্তর-সজ্জায় অন্তর্লীন। সত্যসন্ধিৎসার প্রক্রিয়ায় তিনি ধর্মানুবর্তনকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সত্য এবং ধর্ম তাঁর কাছে অবিচ্ছেদ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। নিজের সর্বস্ব পণ করে প্রজার স্বার্থরক্ষায় তিনি যে গ্রামবার্তায় কলম ধরেছিলেন সমস্ত ভয়-ভীতি-প্রলোভন উপেক্ষা করে, তিনি যে-কর্তব্যের স্বার্থে এমনকি কলকাতার ঠাকুর জমিদারদের বিরুদ্ধাচরণে নির্মম হয়েছিলেন, তাও এই সত্যের পথানুবর্তিতায় ধর্মপালনের লক্ষ্যে। শেষ জীবনে যে তিনি সাধনচর্যায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, যার কথা তাঁর 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'-এ লিপিবদ্ধ আছে, তার পূর্বাভাষ তাঁর এইসব পদ্য বা কবিতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর 'পরমার্থগাথা' কাব্যপুস্তিকাটি মোট ৩১টি কবিতা নিয়ে সংকলিত হয়েছে (গ্রন্থাবলীতে)। এই পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার পরে বলে জানা যায়। এর কবিতাগুলি হরিনাথের সাধকজীবনের উপলব্ধি ও আকুলতায় পরিপূর্ণ। এর 'মানবজীবন' শীর্ষক গীতি-কবিতায় হরিনাথ লিখেছেন :

এই ত মানব-জীবন ভাই!
এই আছে আর,—এই নাই।
যেমন পদ্মপাত্রে, জল টলে সদাই;—
তেম্‌নি দেখিতে দেখিতে নাই।[৯]

এই 'পরমার্থগাথা'-র অন্য একটি কবিতায় হরিনাথ লিখেছেন—

তুমি সত্য তুমি নিত্য, অনিত্য ভব-সংসারে।
আলোক ছাড়িয়ে আমি রইলাম পড়ে অন্ধকারে।।[১০]
(পাপাচার)

দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক 'কবিকল্প' প্রকাশিত ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। এই 'কবিকল্প'-এর 'সতী' অংশে হরিনাথ যা লিখেছেন, তা অত্যন্ত সুখপাঠ্য—

দরশনে কৃত্তিবাস চলিলেন পীতবাস
কৃত্তিবাস নিবাস কৈলাসে।
ইন্দ্র, চন্দ্র, করি-যান আরোহন করি যান,
দক্ষযজ্ঞ দেবতা উল্লাসে।।
পীতাম্বর পদ্মাসনে, যথাবিধি সম্ভাষণে,
রত্নাসনে বসালেন হর।
অন্য দেব পরিকর, পান স্বর্ণ-পরিকর,
শোভাকর সভা মনোহর।[১১]

শব্দচয়ন, অলঙ্কারের প্রয়োগকৌশলে হরিনাথ এখানে অনেক পরিণত। দক্ষদজ্ঞ বিষয়ক কাহিনি হরিনাথের আগে অনেকেই লিখেছেন স্ব স্ব দক্ষতার প্রদর্শনে। হরিনাথও উনিশ শতকের সত্তরদশকে এসে লোকশিক্ষার কাব্যোপকরণ হিসেবে সেই দক্ষযজ্ঞ কাহিনিকেই বেছে নিয়েছেন। আট, আট ও দশমাত্রার শব্দ গ্রন্থনার ক্ষেত্রে হরিনাথ এখানে দাশরথি রায়ের অনুসারী হলেও শব্দের বর্ণাঢ্য ও সালঙ্কারী গুণপনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। দাশরথি রায় তাঁর 'দক্ষযজ্ঞ' পালায় লিখেছেন—

শুনি তখন পঞ্চানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন
শীঘ্র বড় ব্যাঘ্রচর্ম্ম আন।।
আনিলে পোষাকী ছাল, পরিলেন মহাকাল
দেখি সতী করিলেন পয়াণ!
গিয়া কহেন সব ভগ্নীগণে, চল শিব-দরশনে,
শুনে সবে মহানন্দে যান।।[১২]

'গিয়া কহেন সব ভগ্নীগণে'—এখানে আট মাত্রার স্খলন প্রকট, কিন্তু হরিনাথের উপরোক্ত পংক্তিগুলোতে মাত্রার স্খলন নেই বরং মাত্রার নিটোল বন্ধনে এবং রূপ-শ্রুতিমাধুর্যে তা বাস্তবিক 'মনোহর'।

সতীর পতিনিন্দাশ্রবণে মৃত্যুর ঘটনা শুনে শিবের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায়ও লিখেছেন। আবার হরিনাথও লিখেছেন। তিনজনের প্রাসঙ্গিক রচনাংশ উদ্ধার করছি :

**ভারতচন্দ্র রায়**

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।।
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে।।
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্র সদ্যোমরা হস্তীছালা।।
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে।।
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।।[১৩]

**দাশরথি রায়**

শুনিয়া উন্মত্ত হর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
জটা ছিঁড়ি গঙ্গাধর, ফেলিলা তখন।।
জন্মিলা বীরভদ্র তাতে, কহে আসি বিশ্বনাথে
কহ প্রভু! কি জন্যেতে করিলে সৃজন।[১৪]

**হরিনাথ মজুমদার**

চমকিত থাকি থাকি,        ক্রোধে শিব রক্ত আঁখি
ধীরতা হারাইলেন ধীর।
জটাধর জটা ধরি,        ফেলিলেন ছিন্ন করি
তাহে জন্মে বীরভদ্র বীর।।[১৫]

সতীর মৃত্যুসংবাদে শিবের যে প্রতিক্রিয়া ভারতচন্দ্র প্রকাশ করেছেন, তাতে শব্দবিস্ফোরণের তীব্রতা আছে, কথকতার মাধুর্য নেই। দাশরথির বর্ণনায় এই দোষদুষ্টতা অনুপস্থিত, বরং সেখানে বীরভদ্রের জন্মকথা বর্ণনাধর্মিতায় অনেক হৃদয়গ্রাহী। তবে হরিনাথের বর্ণনা এখানে পরিশীলিত, অনেক বেশি বাঙ্‌ময়।

হরিনাথের কবিতায় তাঁর পূর্বসূরীদের কাব্যকৃতির বিষয়গত, ভাবগত ও অলঙ্কারগত মিল ও ছায়াপাত, হরিনাথের চিন্তাগত সাযুজ্যের জায়গা থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বালকবয়সে কুমারখালির কীর্তন বা কবির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে হরিনাথ তাঁর স্বভাব-কবিত্বের জায়গা থেকে যে সব গীতিকবিতা মুখে মুখে রচনা করে গাইতেন, তার একটা সুস্থ বিকাশ এইসব কবিতা-গানে স্পষ্ট অনুভূত হয়।

তাঁর 'বিজয়া' পাঁচালির শুরুতে **হরিনাথ** লিখেছেন :

গিরিপুরে গিরিজায়        আনিতে গিরীশ যায়
গিরীশ হরিষ অতিশয়
কৃত্তিবাসে ভালবাসে        বসায়ে ভাল বাসে
আদরে কুশল জিজ্ঞাসায়।।[১৬]

যমক ও অনুপ্রাশের ব্যবহারের যে নিদর্শন হরিনাথ এখানে রেখেছেন বা আদতে অভিনব কিছু নয়, একথা বলাই বাহুল্য। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাপাঠের এবং রচনা-প্রভাবের ছাপ এখানে বিমূর্ত থাকে না।

তবে গিরিরানির খেদোক্তির যে বর্ণনা হরিনাথ দিয়েছেন, তা রামপ্রসাদ সেন বা দাশরথি রায়ের বর্ণনার মতো উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়। দাশরথি যখন লেখেন :

মা প্রাণ-উমা!—
মাকে কোন্ প্রাণে মা!
বললি আমায় বিদায় দে মা!
পারি, প্রাণকে বিদায় দিতে,
তোরে নারি পাঠাতে
প্রাণ-উমার কাছে কি প্রাণের উপমা।।[১৭]

তখন মাতৃ-প্রাণের বেদনা মূর্ত হয় আন্তরিকভাবেই। অন্যদিকে রামপ্রসাদ সেন যখন লেখেন :

গিরি, এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না[১৮]

কিম্বা

তনয়া পরের ধন　　　　না বুঝিয়া বুঝে মন
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার[১৯]

তখনও তা মাতৃ-হৃদয়ের সন্তান-বাৎসল্যের স্বাভাবিক আকুতির অন্তঃস্থল থেকেই ক্রন্দনার্ততায় উৎসারিত হয়। বরং এর প্রতিতুলনায় হরিনাথ অনেকখানি বিবর্ণ। হরিনাথ লিখেছেন :

আমার উমা যায় কৈলাস, হিমালয় করি শূন্য।
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন।।[২০]

বিষয়বস্তুর ওপরে টপ্পা বা কবিগান ধরনের কথা বা শব্দচয়নের প্রবণতা এখানে দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

সাধারণ সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে যখন হরিনাথ পদ্য-কবিতা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন তখন শব্দ-অলঙ্কারের প্রয়াস-প্রচেষ্টায় তা অনেকসময়েই যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠার শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু ভাবের গভীরতা থেকে হরিনাথ যখন কথা বলতে চেয়েছেন তখন তা অন্য এক আবেদনে দ্যোতিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী যা বলেছেন, তা এখানে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে ঈশ্বরগুপ্তের

> কবিতাও যে স্থানে স্থানে অলঙ্কারের অযথা প্রয়োগের জন্য কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই, একথা বলা চলে না। অবশ্য, তিনি প্রথম জীবনে কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং দাশরথি রায় প্রভৃতি পাঁচালিকারদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকাটা স্বাভাবিক, সে যুগের রুচিও অবশ্য এজন্য অনেকটা দায়ী, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় অলঙ্কার প্রয়োগ সর্বত্র রসের পরিপুষ্টিসাধন করে নাই।[২১]

একথা সাধারণভাবে হরিনাথ সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো হরিনাথও কবির দলে বাঁধনদারি করেছেন বালক বয়সে। কখনো-কখনো কবির দলে ওস্তাদিও করেছেন এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ওস্তাদকে কবির লড়াইয়ে পরাজিত করে বাহবা কুড়িয়েছেন। এসবের পূর্বপ্রস্তুতিতে তিনি স্বীকার করেছেন, একসময় 'আমি গান শুনিতাম না, গান গিলিতাম। একদল যখন 'চাপান' দিয়া যাইত, তাহার পর অপর দল অসিয়া কি 'উতোর' দেয়, তাহা জানিবার জন্য এমন উৎকণ্ঠা হইত যে, তাহা আর বলিতে পারি না।'[২২] এইভাবে চাপান-উতোরের ছন্দোবদ্ধ কথামালা শুনতে শুনতে তিনিও কথা বানিয়ে মালা-গাঁথার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বভাবতই সমসময়ে

কবিগানের প্রচলিত ধারার সংস্কৃতি-চেতনাকেই তিনি আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার মতো তাঁর কবিতায় যে অপটু অনুপ্রাস-যমকের সমারোহ লক্ষ্য করা যায় তা সেই প্রাক-আধুনিক মননধর্মিতার অনিবার্য ফলশ্রুতি। হরিনাথ যখন লেখেন[২৩] :

প্রজার প্রাণ যায় প্রজানাথ ত্যজ আলস্য।
এ দুর্ভিক্ষে, দিয়া ভিক্ষে, কর রক্ষে হে শ্রীবৎস।।
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নাশে সৃষ্টি, ক্ষেতে নাই শস্য;
পয়োধরে জননী মরে, শিশু কাঁদে তার বক্ষ পরে,
কেবা তারে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাকুল সব মনুষ্য;
ভীষণ কাণ্ড, উল্কাপিণ্ড নাশে ধ্বজ, গজ, অশ্ব;
শব আহারে, দ্বন্দ্ব করে শিবা শকুন বিকটাস্য

তখন তার আর মর্মন্তুদ বক্তব্যের চিত্র সত্ত্বেও ঈশ্বরগুপ্তীয় অনুপ্রাস-নির্মাণের অপটু-প্রয়াসে সার্থকতা লাভে সমর্থ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরূপ একটি উদাহরণ[২৪] :

বামা, হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে সকল শাসিছে
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিছে
গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে
ছলিতে ভুবনময়।।

ঈশ্বরগুপ্তীয় এ প্রভাব হরিনাথ অনেকসময়েই অতিক্রম করতে না পারায় তাঁর রচিত কবিতাকে চটুলতার বাইরে স্থির-সংযমী ভাব-গম্ভীর রূপদানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরকম আর একটি নমুনা :

শ্রীচরণে স্থান দাও হে, প্রাণ যায় প্রাণকান্ত।
পিতা দক্ষ, হয়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ, আজ নিতান্ত।।
তব আজ্ঞে, আজ অবজ্ঞে, আসি যজ্ঞে, হ'ল মানান্ত
ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত।।[২৫]

অথচ হরিনাথ যখন অন্তরের তাগিদ থেকে প্রার্থনায় নতজানু হয়ে গীতি-কবিতা লিখেছেন, তখন তা অন্যরূপে, অন্য আবেদনময়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষে দেশ ও প্রজার হাহাকার শুনে কবি হরিনাথ লেখেন[২৬]:

কিবা দোষে, বঙ্গদেশে, না বরিষে পর্জন্য।
বণ্যে বিনে, নদীক্ষীণে জলাশয় জলশূন্য।।

অন্ন বিনে ক্ষীণকায়, পিপাসাতে প্রাণ যায়
এ দুঃখ জানাব কারে মাগো! তোমা ভিন্ন।
পল্লীবাসী দিবানিশি, কাঁদে অন্ন জলের জন্য।
সহেনা আর হাহাকার, মাগো! একবার হও প্রসন্ন।।

এখানে অলঙ্কার কবিতার ওপর আধিপত্য করেনি, কবিতাই অলঙ্কারের ওপর আধিপত্য করে আবেদন ও হৃদয়গ্রাহ্যে সফল হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেছেন : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পারমার্থিক ও ভক্তিরসাত্মক' বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও এবং সেসব কবিতার মধ্যে অনেক স্থানে 'দেহের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের মহিমার কথা' স্মরণ করিয়ে দিলেও 'সাধকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও কাতর আকুতি' তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি।[২৭]—এ বক্তব্য কিন্তু হরিনাথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 'সাধকের গভীর অর্ন্তদৃষ্টি বা ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও কাতর আকুতি' হরিনাথের গানে সহজলভ্য। এখানে হরিনাথ অনেক বেশি হৃদয়ের কারবারি। যেমন—

(১) শূন্য ভরে একটী কমল আছে কি সুন্দর!
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর।।[২৮]

(২) ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ, যার নামেতে পাষাণ গলে।
যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন, শূন্য পবন স্থলে জলে।।[২৯]

(৩) নদী বলরে বল, আমায় বল, রে
কে তোরে ঢালিয়া দিল এমন শীতল জল রে।[৩০]

(৪) দেখ, আসমান জুড়ে আছে আজব পুরুষ একজনা।
লোকে, যাহা হেরে, যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা।।[৩১]

(৫) দেখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে,
যে দিনে সে তলব দেবে।
কোথা তোর রবে বাড়ি, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে;
বল্ দেখি চেন ঝুলান, ঘড়ি তোমার, সেই দিনেতে কে পরিবে।[৩২]

(৬) আজব দুনিয়ার একি, দেখি আজব কারখানা।
ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখেনা।।[৩৩]

(৭) আমারে পাগল করে যে জন পালায়
কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে
হিয়া আমার ফেটে রে যায়।।[৩৪]

(৮) ভবে আসা যাওয়া আজব কারখানা।
তুমি, পড়ে শুনে, চোকে দেখে, তবু হলে রাতকানা।।[৩৫]

(৯) মনের কি বিষম আশায়, কি তামাসা,
ভাবতে গেলে মগজ নড়ে।
মন আমার আকাশ পাতাল, ধায় রসাতল,
তবু রে পিপাসা বাড়ে ,

* * *

কাঙাল কয় দিলে প্রবোধ মন হয় অবোধ,
ছল করিয়ে সুপথ ছাড়ে;
ওরে সে গুপ্তিপাড়ার মাটীর মত
শিব গড়াতে বানর গড়ে।[৩৬]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, তাঁর কবিতায় দুটি প্রধান দোষ পরিলক্ষিত হয়, (১) অশ্লীলতা এবং (২) 'শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা'। তাঁর মতে শব্দ এবং অনুপ্রাস-যমকের ঘনঘটায় কবিতার 'ভাবার্থ' অনেক সময়ই 'ঘুচিয়া মুছিয়া যায়'। সংস্কৃত সাহিত্যের 'অবনতির' সময় থেকে 'যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আগেই কবিওয়ালা বা পাঁচালিকারের কবিতা-পাঁচালিতে এসবের আধিক্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়েরর কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস-যমক আর কোন বাঙালিতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।[৩৭]

এখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় 'মার্জিত রুচির অভাব'-জনিত কারণে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছেন। গুপ্তকবির সাহিত্য শিষ্য হিসেবে হরিনাথ কিন্তু অমার্জিত রুচি পরিহারে প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। মার্জিত রুচির অভাব তাঁর কবিতা সহ রচনাবলীতে দুর্নিরীক্ষ্য। বিশুদ্ধতাবাদী হিসেবে অশ্লীল ভাবপ্রকাশক চিন্তা ও শব্দবন্ধে তার প্রকাশ তিনি চিরদিনই পরিহার করেছেন। অনুপ্রাস-যমকের প্রকট রেখাপাত তাঁর কবিতার একটা পর্যায়ে ঘটলেও, পরে গীত রচনার ভাবনিমগ্নতায় তা দূরীভূত হয়েছিল। সাধক মনের আকুতি নিয়ে তিনি যখন গান-পাঁচালি রচনা করেছেন তখন হরিনাথকে অনেক পরিণত মনে হয়। তিনি যখন তাঁর পাঁচালি-গানে লেখেন :

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে আর তোমা বিনে

তখন দাশরথি রায়ের কথা মনে পড়ে। দাশরথি-রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র-রামনিধি গুপ্ত-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর ছায়াপাত বিভিন্নভাবে বিভিন্নসময়ে হরিনাথের চিন্তা-মননে ঘটেছে। কিন্তু চিন্তার পরিণতিপ্রাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হরিনাথ তাঁর স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। সাতটি উচ্ছ্বাস-এর সম্মিলনে তাঁর 'ভাবোচ্ছ্বাস' নাটকে হরিনাথের আকুতি ধরা-না-পড়ে পারে না। কাঙাল জীবনীকার লিখেছেন : হরিনাথের ভবোচ্ছ্বাস নাটকটি 'অতি সুন্দর উপাদেয় নাটক'। নাটকটি সমসময়ে কুমারখালিতে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছিল। কুমারখালি 'বৈষ্ণবপ্রধান' স্থান হওয়ায় নাটকটির খুব 'আদর' হয়েছিল। বৈষ্ণব কবিগণ যেসব রসের অবতারণা করে গেছেন, হরিনাথ তাঁর 'ভাবোচ্ছ্বাসে' তার 'এমন সুন্দর' অভিব্যক্তি নিয়ে এসেছেন যে তা পড়লে হৃদয় 'পুলকিত হয়'[৩৮] কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়—

(১) আমার ব্যাকুলিত মন।
গৃহেতে রহেনা, প্রবোধ মানে না, সদা ভাবে জলদবরণ।।[৩৯]

কিম্বা

বঁধু, দাঁড়াও হে দাঁড়াও।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হইয়ে, বাঁশরী লইয়ে,
চাঁদমুখে একবার বাজাও।।[৪০]

(পূর্ব্বরাগে মধুর রসোল্লাস)

(২) দিদি কি ঘটে, গোঠে না জানি।
অস্তে গেল দিনমণি, এল না মোর নীলমণি।[৪১]

(বাৎসল্ল-রস-তরঙ্গ)

(৩) কি কাল ভূজঙ্গে দংশলি তোর অঙ্গে,
কমলিনী কেন এমন হলি।
(রাধে) না জানি তুই কি গরল খেলি।।[৪২]

কিম্বা

ভুলিব কেমনে তারে, বল বল সখি!
নয়ন মুদিলে দেখি, হৃদয়কমলে কমল-আঁখি।[৪৩]

(রূপানুরাগ-রস)

(৪) যাই বঁধু যাই বলো না।
তোমারে পেয়েছি হে একা দেখা, সখা যেতে দিব না।।[৪৪]

(সাধারণ রসোল্লাস)

(৫) যায়, নিকুঞ্জ বাহিরে নিকুঞ্জবিহারী।
চরণ, চলিতে না চলে, রাধা বক্ষঃস্থলে, নীলাঞ্চলে
নিবারে নয়নবারি।।[৪৫]

(খণ্ডিত মধুর-রসাভাস)

(৬) মম প্রাণবল্লভ কোথায়, দূতী আমার বলনা।
সখি, প্রাণবল্লভ গেলে মম, প্রাণ কেন গেল না।[৪৬]

(কলহান্তরিতা মধুর রসাভাস)

এই 'ভাবোচ্ছাস' পর্যায়ে ৩৯টি গান সংকলিত হয়েছে। এর বিন্যাস নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| পূর্বরাগে মধুর রসোল্লাস পর্যায়ে | ৩ টি গান |
| বাৎসল্য-রস-তরঙ্গ পর্যায়ে | ৩ টি গান |
| রূপানুরাগ রস পর্যায়ে | ১০ টি গান |
| সাধারণ রসোল্লাস পর্যায়ে | ৪ টি গান |
| উৎকণ্ঠা মধুর-রসাভাস পর্যায়ে | ২ টি গান |
| খণ্ডিতা মধুর-রসাভাস পর্যায়ে | ৬ টি গান |
| কলহান্তরিতা মধুর রসাভাস পর্যায়ে | ৭ টি গান |
| রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্যায়ে | ১ টি গান |
| | ৩৬ টি গান |
| এ ছাড়া প্রার্থনাগীতি আছে | ৩ টি |
| মোট গান | ৩৯ টি |

'ভাবোচ্ছ্বাস'-এর গীতি-কবিতায় মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন পদাবলীর ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন জ্ঞানদাসের এই চরণ দুটি—

রূপ হেরি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।।[৪৭]

আর হরিনাথ লিখেছেন—

শ্যামের প্রীতি-অঙ্গ লাগি
কাঁদে প্রতি অঙ্গ[৪৮]

হরিনাথের ধর্মবোধ তাঁকে কালী-কৃষ্ণের একাত্মরূপের বন্দনায় ভক্তমনের আন্তরিক আকুতি নিয়ে ভক্তিবিহ্বলতায় আনত করেছিল। তাঁর ভক্তি-আবিলতায় কালী-কৃষ্ণ একাকার হয়ে গেছে :

ভক্তিগুণে ভগবান্, নানা রূপে মূর্ত্তিমান
এ প্রত্যয় অপ্রত্যয় হলে।

দূরেতে থাকুক অন্য, কালী কৃষ্ণ হন ভিন্ন
ভক্তি ফলে বিপরীত ফলে।।[৪৯]

অন্যত্র আবার লিখেছেন :

হরি, কখন সুন্দর, নবজলধর
কখন নবীনা কিশোরী[৫০]

অন্যত্র আবার—

ভক্ত, যেমন বাঞ্ছা করে, তেমনি রূপ হেরে,
ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু হরি;
কাঙাল-ফিকিরচাঁদে কয়, বিশ্বাসীর হৃদয়
বিশ্বরূপে দেখে বিশ্বম্ভরী।।[৫১]

এখানে দাশরথি রায়ের 'কৃষ্ণকালী' পালা থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি হরিনাথ এবং দাশরথির রচনা-নিদর্শন হিসেবে। 'শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ' প্রসঙ্গে দাশরথি রায় লিখেছেন :

(১) কুঞ্জ-কাননে কালী ত্যেজে বাঁশী বলমালী
করে আমি ধরি শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যামা-শ্যামে ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত!
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত![৫২]

(২) কৈ গো কুটিলে! বলে শ্রীনন্দনের নন্দন কই।
শঙ্করহৃদি সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী।।[৫৩]

(৩) শ্যাম হলেন নিকুঞ্জে শ্যামা
কি বা রূপ নিরূপমা
আয়ান করিছে নিরীক্ষণ

(৪) সাধ পুরাতে সাধের বঁধু
শ্যাম আমার আজি শ্যামা হলো।।[৫৫]

হরিনাথ তাঁর 'কৃষ্ণকালী লীলা'র 'প্রস্তাবনা' পর্যায়ে 'নট'-এর মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন, তা এখানে উদ্ধারযোগ্য :

...পরমব্রহ্মই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী বা প্রসবিতা; সেই স্বরূপের অবলম্বনে তিনি যখন বিশ্বজননী মূর্ত্তিতে কাতর সন্তানকূলকে কোলে তুলে অভয় দিয়েছেন, ত্রিজগতের কালভয় নিবারণ করে নিজ নিস্তারিনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তখনই শাস্ত্র তাঁহাকে কালভয় নিবারণী কালী নামে অভিহিত

করেছেন। আবার সেই পরমব্রহ্ম যখন বিশ্বজনক পুরুষমূর্ত্তির অবলম্বনে শ্যামসুন্দর সেজে ভক্তহৃদয়ে গোলোকলীলা প্রকাশ করে, ভক্তের বিষয় আকৃষ্ট হৃদয় মনকে আকর্ষণ করেছেন, শাস্ত্র তখনই তাঁর নাম কৃষ্ণ রেখেছেন। অতএব, কি কালী, কি কৃষ্ণ সকলই সেই পরমব্রহ্মের স্বরূপ নাম; তবে লোকে কালী কৃষ্ণ ভিন্ন ভাবে কেন? আমার বোধ হয়, যাঁহারা পুরাণ রচনা করেছেন, সেই সকল ঋষিগণই এই সকল ভেদজ্ঞানের কারণ।[৫৬]

দাশরথি রায়ের 'কৃষ্ণকালী' পাঁচালির অনেক পরবর্তীতে হরিনাথ 'কৃষ্ণকালী লীলা' রচনা করেন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) যখন দাশরথির মৃত্যু হয়, তখন হরিনাথের বয়স চব্বিশ বছর। ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। হরিনাথ সাহিত্য-গুরুর অনুসরণে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হলেও সমসময়ের এবং তার পূর্ববর্তী পাঁচালিকার কবি-লড়াইয়ের রচয়িতা সহ অন্যান্য কবিদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেছিলেন নিজের পাঠাভ্যাসের বহুমাত্রিকতার সূত্রেই। সামাজিক বিভিন্ন প্রবণতা হরিনাথকে লেখার বিষয় যোগাতো। হরিনাথ তাঁর নীতি আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে সেই সব প্রবণতার প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতেন। তবে হরিনাথ তাঁর এইসব সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে পাঁচালি-গীতাভিনয়ের সাবেকি প্রকরণ ব্যবহার করতেন। তাঁর 'কৃষ্ণকালী-লীলা'র প্রকাশের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে এই পাঁচালি-গানটি হরিনাথের 'সাধন সঙ্গীত' সম্প্রদায়ের দলে গাওয়া হতো। প্রকাশক সতীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

বর্ত্তমান সময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ভ্রমবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অভেদতত্ত্বময় কৃষ্ণকালীপরমতত্ত্বে ভেদ কল্পনা করিয়া অপরাধী হইতেছেন এবং ধর্ম্মরাজ্যের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন দেখিয়া মহাত্মা কাঙাল ভক্তসমাজে ভগবানের 'কৃষ্ণকালী' লীলাতত্ত্ব প্রচার করেন।[৫৭]

এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হরিনাথ সমসময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও ভাববিভেদের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই 'কৃষ্ণকালী-লীলা' পাঁচালি লিখে প্রচার করেছিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে দলাদলিজনিত বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীকরণের জন্যও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। এক সাধকের সমন্বয়ধর্মী দর্শনের বৈভবালোকে হরিনাথ পরস্পরের ভ্রাতৃভাব রক্ষা করে মানুষে মানুষে বৈরিভাব দুর করতে চেয়েছিলেন। হরিনাথের 'কৃষ্ণকালী-লীলা' এই দিক-বিচারে ভক্তের আকুতি।

কৃষ্ণকালীর একাত্ম-রূপের রূপাভিসারে ভক্ত কবির অন্তরের উচ্চারণ অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(১) দেখ ললিতে! আচম্বিতে শ্যাম যে আমার শ্যামা হোল।
ঐ যে, চূড়া বাঁধা যুক্তবেণী, মুক্ত হোয়ে পায়ে পোল।।[৫৮]

(২) ওগো কিশোরি! তোমার বংশীধারী
হলেন আজ শ্যামাসুন্দরী,
রূপের তুলনা কি আছে
(ধনী লো)
ত্রিভুবন মাঝে, পীতাম্বর হরি, দিগম্বরী।।[৫৯]

(৩) শ্যাম আর শ্যামা আমার, ভিন্ন ভেদ কোথায় বল।[৬০]

(৪) মা আমার মুক্তকেশী, এইখানে যে দাঁড়িয়ে ছিল।
ওকে মুক্ত কেশ যুক্ত করে, মাথায় চূড়া বেঁধে দিল।[৬১]

হরিনাথের বিজয়া এবং কৃষ্ণকালী লীলার ভাবাশ্রয়িতারয় রামপ্রসাদ সেনের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

হরিনাথের সাহিত্যাদর্শে যে বিষয় বা বিষয়াবলী নিহিত আছে, তা হলো প্রচলিত সমাজ-সংস্কৃতিতে দেশীয় যে চিন্তাচর্চা দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচর্যায় রয়ে গেছে, তার অনুবর্তিতায় গীতি-সাহিত্য রচনা করতে হবে। মূলগতভাবে হিন্দু ধর্মীয় ভাবকে অক্ষুন্ন রেখে উদার মনমনস্কতায়, অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিতে, তার বিকাশ ঘটানো। ফলে বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গতা, রামপ্রসাদের ভক্তিমনস্কতা, মঙ্গলকাব্য, কৃষ্ণ ও কালীকীর্তন প্রমুখ সৃষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাস্রোতের মধ্যেই তিনি অবগাহন করেছেন। এছাড়া কবির লড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতির মধ্যেকার অশ্লীলতা বর্জিত গ্রহণীয় দিকগুলিকে গ্রহণ করার ও রচনাক্ষেত্রে তার ভাবগ্রাহিতার প্রয়াস পেয়েছেন। সমসময়ের সামাজিক বিষয়ের চিন্তাভাবনাও তাঁর কবিতা-গানে পাওয়া যায়, তবে তার গুণমান তাঁর ভক্ত মনের পরিণতির প্রতিতুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বিষয়নিষ্ঠা সেখানে বড়ো হয়ে উঠেছে, ফলে ভাবনিষ্ঠার গভীরতা নেই। আবার অন্যদিকে ভক্ত মনের আকুতি নিয়ে যখন তিনি কাব্যগীতি রচনা করেছেন, তখন ভাবনিষ্ঠার গভীরতা বিষয়নিষ্ঠার ওপর আধিপত্য করেছে। আবার বাউল গান রচনা করার সময় তাঁর আবেশগত চিত্ত ভাববিহ্বলতায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মনের মানুষের সন্ধানে মুক্তবিহঙ্গ হয়েছে। জগৎ ও জীব সম্পর্কে এক নিবিষ্ট ভাব-গাম্ভীর্যে হরিনাথ সেখানে আবার অনন্য। এই হরিনাথ মজুমদার আবার মনের ও দৃষ্টিঔদার্যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন, ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে সে গান সদলবলে গিয়ে গেয়েওছেন দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হয়েও। আবার বাউল সুর ও কীর্তনাঙ্গে রিপনস্তুতি করেছেন, রানি ভিক্টোরিয়ার বন্দনা-গীতিও গেয়েছেন। হরিনাথের সাহিত্যাদর্শে নিহিত থেকেছে সত্যনিষ্ঠা থেকে ধর্মবোধ জাগ্রত করার বিষয়টি। ধর্মভাবে ভড়ং তাঁর কাছে অসহ্য ছিল।

**তথ্যপঞ্জি**

১। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬
২। জলধর সেন : প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬

৩। সংবাদ প্রভাকর। জুন ১৮, ১৮৫৭
৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ২৯ মাঘ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (ফেব্রুয়ারি ১০, ১৮৭৭)। পৃ. ৩২১
৫। ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ১৩৮১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. চোদ্দ
৬। সুরেশচন্দ্র মৈত্র : বাংলা কবিতার নবজন্ম। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। কলকাতা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫৭৩-৭৪
৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত। পৃ. ৪১
৮। প্রাগুক্ত
৯। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬
১০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২
১১। প্রগুক্ত। পৃ. ১২৫
১২। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : দাশরথি রায়, পাঁচালী। কলকাতা। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৪৭৪
১৩। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২৩
১৪। দাশরথি রায়, পাঁচালী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৭৯
১৫। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬৪
১৬। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭১
১৭। দাশরথি রায়ের পাঁচালী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৩৫
১৮। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। কলকাতা। প্রকাশের তারিখ নেই। পৃ. ৭৬
১৯। প্রাগুক্ত
২০। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮৭
২১। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য। (ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। দত্তচৌধুরী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ১৩৮১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ) পৃ. সাত-আট
২২। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১৩
২৩। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫১
২৪। ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ একত্রে)। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড। কলকাতা। প্রকাশের তারিখ ছাপা নেই। পৃ. ৪২০
২৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৪
২৬। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ১৩ পৌষ ১২৮০ বঙ্গাব্দ (ডিসেম্বর ২৭, ১৮৭৩)। পৃ. ১
২৭। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : প্রাগুক্ত। পৃ. আট
২৮। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৩
২৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮৫-৮৬
৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৫-৬
৩১। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৬

৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪৬

৩৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬১

৩৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২০

৩৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫৫

৩৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫৩-৫৪

৩৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা। জীবনচরিত ও কবিত্ব। বঙ্কিম রচনাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৮৪

৩৮। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩৪

৩৯। কাঙাল সঙ্গীত। কুমারখালি (প্রকাশক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)। বৈশাখ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২২

৪০। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩

৪১। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪

৪২। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫

৪৩। প্রাগুক্ত। পৃ ২৭

৪৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০

৪৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫

৪৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৬

# হরিনাথের গদ্য ও ভাষাচর্চা

হরিনাথের গদ্য এক সময় ছিল অত্যন্ত জটিল, বলতে গেলে গুরু ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যের ভাষানুরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য রচনা সম্পর্কে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেছেন যে গুপ্তকবির 'গদ্যরচনা তো অনুপ্রাস যমকাদি অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় প্রায় অপাঠ্যই হইয়াছে...।'[১] এ বক্তব্য সমগ্র সত্যকে প্রতিফলিত করে না, ফলে এ বক্তব্যের সত্যতা খণ্ডিত। অনুপ্রাস যমকের আধিক্যে তাঁর গদ্য যেমন জটিল তেমনি মাঝে-মধ্যে তাঁর ভাষা আশ্চর্যরকম সাবলীল। এই জটিল ও সাবলীল ভাষার কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হতে পারে :

**জটিল নমুনা**

(ক) একে সঙ্গতি শূন্য জন্য ধনাগম তৃষা কৃশা হয় না, তাহার উপর আবার নানা প্রকার রোগ ভোগ করিলে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? প্রাণনাশা 'নাসা' নাসা বাসায় বাসা করিয়া নিয়তই সর্ব্বসুখের আশা হরণ করিতেছে। হর্ষনাশক 'অর্শঃ' বপুবর্ষ স্পর্শ করিয়া মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিমর্ষ করিতেছে।....বাতের...চর্ম্মভেদী ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার সময়ে মনের মধ্যে কোনরূপ মন্ত্রণার আবির্ভাব হয় না।[২]

(খ) বাক্যবাদিনী বর্ণচারিনী কণ্ঠবাসিনী ভ্রান্তিনাশিনী ভাব-অর্থ-অভিপ্রায়-প্রদায়িনী দ্বিদলকমলদল-বিহারিনী শ্রীশ্রীমতী দৈবশক্তি-দেবীর চরণ স্মরণ পূর্ব্বক এই 'প্রবোধপ্রভাকর' পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্তি পরবশ হইয়া প্রচুর প্রয়াসপরিপূরিত পরিশ্রম ও প্রযত্ন পুরঃসর লেখনী ধারণ করিলাম।[৩]

**সাবলীল ভাষার নমুনা**

(ক) বঙ্গদেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং জন্মাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, উড়িষ্যা রাজ্যে অথবা অপর কোন স্থানে বাস করিতেছেন, তাহারা এ রসের বিশেষ রসজ্ঞ হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারদিগের কর্ণ-কুহরে এ বিষয়ের ধ্বনি কখনই ধ্বনিত হয় নাই।[৪]

(খ) এবারকার অতিবৃষ্টিতে পদ্মা অত্যন্ত প্রবলা হওয়াতে অনেকের ঘর, বাটী, পথ, ঘাঠ ও স্থলসকল জলে প্লাবিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে সে জলের অদ্যাপি শেষ হয় নাই।[৫]

(গ) পাবনা জেলার মধ্যে ভদ্রলোকের অধিক। এবং হিন্দুই অনেক, মুসলমান অল্প। এক একটা গ্রাম কেবল বিশিষ্ট লোকেই পরিপূর্ণ। এখানকার মধ্যে শুঁড়ি, তিলি ও গোয়ালা জাতিতেই অধিক ধনি।[৬]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্ভবত তাঁর গদ্যের ভাষায় প্রাঞ্জলতার অভাব সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। জটিল ভাষারীতি তিনি সর্বাংশে বর্জন যেমন করতে পারেননি, তেমনি প্রাঞ্জল ভাষারীতি অনুসরণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেননি। ওপরের উদাহরণমালা থেকে এ বিষয়টি বোধকরি স্পষ্ট হয়। তবে অন্যের গদ্য অপাঠ্য হোক, এ তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। উত্তরকালের বঙ্কিমের যে গদ্য রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, বঙ্কিমের গদ্যচর্চার আদিযুগে তা কিন্তু অনুরূপ ছিল না। সে সময়ে বঙ্কিমের গদ্যও ছিল 'অপাঠ্য, বিষম!'[৭] এরকম একটি উদাহরণ :

যে লপনেন্দু শত ২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মন্ডিত হওত মৃন্মন্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।[৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষারীতি সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র রচনা এপ্রিল ২৩, ১৮৫২ তারিখের 'সম্বাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনা দেখে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'শঙ্কিত' হয়ে লিখেছিলেন :

ইঁহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন...। ...রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলিন্ প্রকাশার্থে যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন।...।[৯]

স্পষ্টতই বোঝা যায় ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'অভিধানের উপর অধিক নির্ভর' ভাষারীতিকে অনুমোদন করেননি।

হরিনাথও তাঁর গদ্যরচনার প্রত্যূষলগ্নে যে ভাষারীতির পরিবাহক ছিলেন তাও যথেষ্ট সাবলীল নয়। এরকম কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) অশেষ গুণাঙ্কিত শ্রীযুক্ত প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
নিম্নলিখিত কতিপয় পঁক্তি সংশোধন করিয়া আপনার বহুমূল্য পত্রাংশে যৎকিঞ্চিত স্থানদান দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধনে বাধিত করিবেন।[১০]

(খ) শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
সম্পাদক মহাশয়। উল্লিখিত কতিপয় পদ্য রচনা সংশোধন করত ভবদীয় জগদ্বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক প্রান্তে স্থানদানে পদ্য রচনোৎসাহোৎসুক করিতে আজ্ঞা হয় নিবেদনেতি।[১১]

(গ) পন্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।
প্রাঞ্জলিপূর্বক প্রণতি পরার্দ্ধ নিবেদনমিদং।
নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য রচনা সংশোধন করত ভবদীয় পৃথ্বী প্রপূজ্য প্রভাকর পত্রিকা প্রান্তে প্রকটন করিয়া জ্ঞান প্রপন্নকে জ্ঞান প্রদানে বাধিত করিবেন।[১২]

এখানেএকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। উপরোক্ত তিনটি গদ্য রচনার নিদর্শনগুলি সবই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে রচিত। তবুও প্রথম উদাহরণটি (এপ্রিলে লেখা) যতখানি সাবলীল ভাবের নিদর্শন, পরবর্তী দুটি কিন্তু সেরকম নয়। বরং অনেক বেশি অভিধান-নির্ভর এবং অনুপ্রাসের ভাবে জর্জরিত।

অথচ হরিনাথের গদ্যরীতি পরবর্তীকালে অনেক সহজ ও সাবলীল হয়েছিল। সংবাদ প্রভাকরেই তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরবর্তীতেও হরিনাথ প্রভাকরের অন্যতম প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন বলে কেদারনাথ মজুমদার জানিয়েছেন।[১৩] তবে গ্রামবার্তা প্রকাশ করার পরবর্তী সময় থেকে হরিনাথের গদ্যরচনা তাঁর নিজের পত্রিকার পাতাতেই স্বমহিমায় প্রকাশ পেতে থাকে। এক্ষেত্রে হরিনাথের গদ্য সাহিত্যিক-গদ্যের প্রতিতুলনায় সাংবাদিক-গদ্যেই অধিক স্বচ্ছন্দ ও ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে হরিনাথে গদ্য তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের তাগিদে নির্বাধ স্রোতস্বতীর মতো প্রবাহিত হয়েছে। হরিনাথের শেষতম গদ্যগ্রন্থ 'মাতৃমহিমা' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, যদিও তা রচিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত আগে, ১৩০২ বঙ্গাব্দে।

হরিনাথের পরিশীলিত গদ্যরচনার নমুনা হিসেবে গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, কাঙালের ব্রহ্মান্ডবেদ ও মাতৃমহিমা থেকে উদ্ধার করছি :

১। আমাদিগের নব্য দল সভ্যতা ও স্বাধীনতা ধরিয়া আজকাল বড়ই টানাটানি করিতেছেন। কেহ ইংরাজদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান সভ্যতা ও স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেছেন, কেহ ইংরাজ ভোজ্যে শরীর রক্ষা করাই সভ্যতা ও স্বাধীনতার মূল ভাবিতেছেন, কেহ মদ্য পানকে সভ্যতা ও স্বাধীনতা বলিয়া, নির্ণয় করিতেছেন।[১৪]

২। ....এক হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পাঁচটি সম্প্রদায় পৃথক হইলেও, ইহার যে কত উপসম্প্রদায় আছে, তাহার সংখ্যা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। এই সকল সাম্প্রদায়িক লোকেরা আপন আপন মত সমর্থন করিতে পরস্পরের প্রতি পরস্পর যে প্রকার দোষ অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহতে ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা ক্রমে অল্প হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।[১৫]

৩। ....নবু জাতিতে জোলা...। নবু সা স্বহস্তে দরগা ও দুর্গাবাড়ি পরিস্কার করিতেন। যাহাতে উক্তস্থান পবিত্র থাকে, সে বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। দরগা ও হরির আসনে তাঁহার যে অভিন্ন জ্ঞান ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, দরগার উপরে তিনি যেমন একখানি ঘর তুলিয়াছিলেন, তদ্রূপ হরির আসনও একখানি ঘরের দ্বারা আবৃত করেন।[১৬]

হরিনাথের গদ্য যে যথেষ্ট সুললিত ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর ক্রমাগত পরিচর্যার ফলশ্রুতিতে, তা এখানে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। হরিনাথের গদ্যের এই স্বচ্ছন্দ গমিতয়তা যে তাঁর গদ্যরচনার প্রাথমিক প্রয়াসে অনুপস্থিত ছিল তা বলাই বাহুল্য।

হরিনাথ সচেতন গদ্যশিল্পী ছিলেন। 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে তাঁর ভাষার যে রূপ ছিল, তার কিছু কিছু অংশ পরবর্তীতে ক্রমাগত সংশোধন করে ভাষাকে তিনি আরও সুন্দর, সুললিত, সহজগ্রাহ্য করে তোলার ব্যাপারে সদা-সক্রিয় থেকেছেন। 'বিজয়বসন্ত' বিদ্যাসাগরী ভাষার নির্মিতিতে এমনিতেই যথেষ্ট আকর্ষণীয় :

একদা নরপতি শারদী পৌর্ণমাসীর সায়ংকালে মহিষী সমভিব্যবহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন, এইকালে পূর্বদিক্ আলোকময় করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; চকোর চকোরী সেই সুধাময় কিরণে ক্রীড়া করিতে করিতে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইল; কুমদিনী প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল; বিটপিপুঞ্জের হরিদ্বর্ণ পল্লবে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি পতিত হওয়ায় এক আশ্চর্য মনোহারিনী শোভা প্রকাশ পাইল;—বোধহয়, যেন তরুমণ্ডলী অগণ্য হীরকখণ্ডে ভূষিতা হইয়া পবনান্দোলিত শাখাবাহু দ্বারা ঋতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে।[১৭]

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'-র ভাষাদর্শকে হরিনাথ গ্রহণ করেছিলেন 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাসে। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র ভাষা-নির্মিতির একটি উদাহরণ :

...কিঞ্চিৎ গমন করিয়া রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্প বয়সের তপস্বীকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল।[১৮]

বিদ্যাসাগরের এই ভাষাদর্শই হরিনাথকে 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাসের ভাষা-নির্মিতিতে প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। তথাপি হরিনাথ তাঁর এই উপন্যাসের দুরূহ-বোধ-হওয়া শব্দাবলী সহ অন্যান্য পরিবর্তন ক্রমাগত সাধন করে ভাষাচর্চার নজির রেখেছিলেন। 'বিজয়বসন্ত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ হরিনাথ উপন্যাসটির

'অধ্যায় বৃদ্ধি' সহ 'কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও দুরূহ শব্দগুলিও সহজ' করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং 'অনেকস্থান সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত'-ও করেছিলেন।[১৯]

গ্রামবার্তায় 'হীন' ছদ্মনামে হরিনাথের ধারাবাহিক প্রকাশিত 'প্রেমপ্রমীলা' উপন্যাসের ভাষাও উল্লেখযোগ্য। 'বিজয়বসন্ত'-এর উত্তরকালে প্রকাশিত এই উপন্যাসের ভাষা 'বিজয়বসন্ত'-এর ভাষাপেক্ষা আধুনিক। যেমন—

> একদা, রাজমহিষী রণকালী, শয়নাগারে উপবিষ্ট আছেন; সহচরীগণ নানাপ্রকার কৌতুক করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে যত্ন করিতেছেন, পরিচালিকাগণ কেহ তাম্বুলদানে, কেহ গন্ধদ্রব্য প্রলেপনে, কেহ তালবৃন্তব্যজনে তাঁহার বিলাস চরিতার্থ ও উল্লাসসাধন করিতেছে, কিন্তু মহিষী পূর্ব্বের ন্যায় কিছুতেই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন না।[২০]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি ও ভাষাচর্চার সঙ্গে হরিনাথ বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর গদ্যরচনায় সাধুভাষার অনুপ্রবেশ একারণে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবেই ঘটেছে। অক্ষয়কুমার দত্তকে হরিনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন; অক্ষয়কুমার দত্তকে হরিনাথ 'প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা' বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২১] তাঁর নামানুসারে হরিনাথ তাঁর মধুরানাথ মৈত্রেয়র পুত্রের নাম অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রেখেছিলেন। হরিনাথের গদ্যের ভাষাচর্চায় অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রভাবই সমধিক।

মূলত সাধুভাষার পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও হরিনাথ প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের চলিতভাষার রচনাদর্শ সম্পর্কে নিস্পৃহ-ঔদাসীন্য দেখাননি। প্যারীচাঁদ যখন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে' বক্রেশ্বরের মুখে চলিত তথা কথ্যভাষা বসাতে গিয়ে লেখেন: 'আপদে পড়িলেই বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয়। মকদ্দমার তদ্বির অবশ্যই করিতে হইবেক। বেতদ্বিরে দাঁড়িয়ে হারা ও হাততালি খাওয়া কি ভাল?'[২২]—তখন হরিনাথ বিদ্যাসাগরী ভাষার বিপ্রতীপে এই চলিত ভাষার প্রচলন-প্রয়াসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। চলিত ভাষার লিখিত রূপ সম্পর্কে তাঁর বিরোধ ছিল না। ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৬, ১৮৭৩) প্রকাশিত তাঁর 'অক্রূর সংবাদ'-এ হরিনাথ অবলীলায় কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। ভাষা নির্মাণে অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও হরিনাথ কথ্যভাষার লেখ্যরূপের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'অক্রূর সংবাদ'-এ হরিনাথের কথ্যভাষার উদাহরণ 'বিদূষক' ও 'প্রেমানন্দ'-এর মুখে বসানো ভাষায় অবয়বিত হয়েছে :

> বিদূষক। মহারাজ বুঝতে পারেন নাই বটে, বল্‌বামাত্র শর্ম্মা সব বুঝেছেন; পুরুত আর গুরু বেটার ভয়ে প্রকাশ করেন নাই। এখন আপদ শান্তি হল, দুবেটা বুড়ো চলে গেছে, সব বল্‌ছি শুনুন।...[২৩]

প্রেমানন্দ। ....বায়না চাইলে বলে সুদের টাকাই দুধের বায়না। হিসাবকালে মাসের একদিন কম্‌লে, কেটে লয়, সমান হলে সমান সমান। একদিন বাড়লে শালারা আর ধরে দেয় না। মুই বেস্‌ বুঝ্‌ছি, ভদ্দরলোক শালারা, চোর ডাকাতের বাবা।...[২৪]

বাঙলা ভাষার সাধু-গদ্যরীতিতে বিদ্যাসাগরের প্রভানুসারিতায় যে অনুশীলনগত বৈচিত্র্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ্য করা যায়, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক 'তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যান' ও সাংবাদিক গদ্যের সার্বিক চর্চা জীবন্ত প্রক্রিয়ায় থেকে গিয়েছিল। বাঙলা গদ্যের যে 'শক্তি ও সৌন্দর্য' বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেছিলেন তা উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আরও সমৃদ্ধিগত বিকাশলাভ করেছিল।[২৫] এই অন্তর্বর্তী সময়ে বাঙলাভাষার অন্যান্য গদ্যশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বশিক্ষিত গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী হরিনাথ মজুমদারও তাঁর আয়াস এ প্রয়াসগত যত্নে ভাষানির্মাণের সজীব অনুশীলন চালিয়ে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

## তথ্যপঞ্জি


১। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য। ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. সাত

২। ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১

৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৮

৪। ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী। প্রাগুক্ত পৃ. ১৩১

৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১১

৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২৩

৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালা-২২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩৫

৮। বঙ্কিম রচনাবলী। প্রাগুক্ত পৃ. ৯২১

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬

১০। সংবাদ প্রভাকর। ৪ বৈশাখ ১২৬৪ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৫, ১৮৫৭) পৃ. ৪

১১। প্রাগুক্ত। জুন ১৮, ১৮৫৭

১২। প্রাগুক্ত। অক্টোবর ২১, ১৮৫৭

১৩। কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫৩

১৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, অগাস্ট ১৮৬৯

১৫। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ। (কাঙাল-পৌত্র বৈদ্যনাথ মজুমদারের সৌজন্যে)। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯২

১৬। হরিনাথ মজুমদার : মাতৃমহিমা। কুমারখালি। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২৯

১৭। হরিনাথ মজুমদার : বিজয়বসন্ত। ১৩২১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। কুমারখালি। পৃ. ১০

১৮। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ। তৃতীয় খণ্ড। সাক্ষরতা প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১৩৬

১৯। 'বিজয়বসন্ত'-এর (তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের 'বিজ্ঞাপন' অংশ দ্রষ্টব্য।

২০। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৮৮১)। পৃ. ৪

# উপন্যাস

হরিনাথ প্রণীত তিনটি 'উপন্যাস'-এর কথা জানা যায়। 'বিজয়বসন্ত' ছাড়া অন্য দুটি হলো 'চিত্তচপলা' এবং 'প্রেমপ্রমীলা'। 'চিত্তচপলা'র প্রকাশকাল আবুল আহসান চৌধুরীর মতে 'বৈশাখ ১২৮৩ (ইংরেজি ১৮৭৬)'[১] কিন্তু গ্রামবর্তাপ্রকাশিকায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা গেছে 'চিত্তচপলা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের গোড়ায় (ইংরেজি ১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নাগাদ)। বিজ্ঞাপনটিতে 'চিত্তচপলা'কে বলা হয়েছিল 'জ্ঞাতি বিরোধীয় অপূর্ব্ব উপাখ্যান।'[২] 'উপন্যাস' হিসেবে বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয়নি, যদিও আবুল আহসান চৌধুরী একে 'জ্ঞাতি বিরোধীয় অপূর্ব উপন্যাস'[৩] হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। আবুল আহসান চৌধুরী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একে 'উপন্যাস' বলেছেন কোন খণ্ডের বা ভাগের উল্লেখ ব্যতিরেকেই। গ্রামবার্তায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপনটিতে লেখা হয়েছিল :

বিজ্ঞাপন।

**চিত্তচপলা।**

প্রথম ভাগ।

জ্ঞাতি-বিরোধীয় অপূর্ব্ব উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার প্রণীত উক্ত পুস্তকের

প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। ....ইত্যাদি।

সুতরাং 'চিত্তচপলা' একখণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। উক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের পরের সপ্তাহেই গ্রামবার্তায় আর একটি 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে হরিনাথের 'চিত্তচপলা'-র অগ্রিম গ্রাহকমূল্য সংগৃহীত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছিল, যাঁরা প্রথম খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়েছেন, তাঁরা প্রথম খণ্ডের মূল্যেই 'দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন'। আর যাঁরা দ্বিতীয় খণ্ড 'মুদ্রণের সাহায্যার্থে অগ্রিম মূল্য প্রদান করিবেন' তাঁরাও ঐ একই মূল্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড পাবেন।[৪]—এই বিজ্ঞাপন পাঠে বোঝা যায় 'চিত্তচপলা'-র প্রথমভাগ প্রকাশের পর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের এবং তার অগ্রিম মূল্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ 'চিত্তচপলা' ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়নি। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১৮ বৈশাখের সংখ্যা থেকে ঐ বছরের ২৬ চৈত্র পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ১৮৭৭ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত) প্রকাশিত গ্রামবার্তার

সংখ্যাগুলিতে 'বিজয়বসন্ত' 'অক্রুর-সংবাদ' 'পদ্যপুন্ডরীক' সহ 'চিত্তচপলা ১ম ভাগ'-এর বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এর অর্থ ১২৮৩ বঙ্গাব্দের সময়সীমায় 'চিত্তচপলা (১ম ভাগ)'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ 'চিত্তচপলা'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়নি। 'চিত্তচপলা'র দ্বিতীয় ভাগ আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি? 'চিত্তচপলা'র কাহিনির ভিত্তিভূমিতে নিহিত ছিল একটি বাস্তব ঘটনা। হরিনাথের এক গুণানুরাগী লিখেছেন, 'যে গৃহ-বিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি 'চিত্তচপলা' লিখিয়াছিলেন হরিনাথ সেই পরিবারের নাম করিয়া ঘটনাংশ আমাদের বুঝাইয়া দেন।'[৫] অবশ্য তিনি সেই পরিবারের নাম তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেননি।

হরিনাথের অপর 'উপন্যাস' 'প্রেমপ্রমীলা' গ্রামবার্তায় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (মাসিক সংস্করণ) থেকে মাঘ পর্যন্ত ১০টি সংখ্যায় অষ্টম অধ্যায় থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ১৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অধ্যায় দুটি প্রকাশিত হয় গ্রামবার্তার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ অধ্যায় দুটি যথাক্রমে পৌষ এবং মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রেমপ্রমীলা'র অষ্টম অধ্যায়টি। স্বভাবতই বোঝা যায় 'প্রেমপ্রমীলা' উপন্যাসের প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাব্দের গ্রামবার্তায়। ভাগ্যবিড়ম্বিত পরিচয়হীন প্রেম ও প্রমীলা নাম্মী দুই রাজকুমার-রাজকুমারীর কাহিনিই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

কিন্তু উপন্যাস হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বিজয়বসন্ত' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটি অসম্ভব জনাদর লাভ করে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের (১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার) গ্রামবার্তা পাঠে জানা যায় যে ঐ সময় পর্যন্ত বিজয়বসন্তের ৯টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার বহুকাল পর চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় হরিনাথ লিখেছিলেন যে, যেহেতু 'বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন' করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেইহেতু তারা 'Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে।' সমসময়ে যেসব রূপক ইতিহাস প্রচলিত ছিল (চাহার দরবেশ, বাহার দানেশ প্রভৃতি) তা 'অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ।' এসব পাঠে তাদের কোনপ্রকার উপকার না হয়ে বরং অপকার ও অনর্থের কারণ ঘটে। এসব কারণে বালকদের 'রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে' হরিনাথ 'বিজয়বসন্ত' রচনা করেন।[৬] কলকাতার ফ্রি চার্চ স্কটল্যান্ডস ইনস্টিট্যুশনের বাঙলা ভাষার অধ্যাপক ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার এই 'বিজয়বসন্ত' পড়ে 'সংশোধন' করে দিয়েছিলেন। এমনকি ব্রাহ্মসমাজের (কুমারখালি) প্রধান উপাচার্য আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও উপন্যাসটি পড়ে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৭]

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিজয়বসন্ত' অপ্রত্যাশিত জনাদর লাভ করে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দেই (অর্থাৎ প্রকাশের ৩ বছরের মধ্যে) উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংকরণ প্রকাশিত হয় (১৭৮৪ শক)। ইতিমধ্যে বইটি 'পাঠশালার পাঠ্য' হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বইটি 'অনেকানেক ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে' পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে 'সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমপূর্বক' বইটির 'আদ্যন্ত সংশোধন' করে দিয়েছিলেন।[৮] দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় হরিনাথ লিখেছিলেন :

> পূর্ব্বে ইহা পঞ্চ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ থাকায় কোন কোন বিষয় অস্পষ্ট ছিল। এই বারে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্তে একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।[৯]

পরবর্তী তিন বছরের মাথায় বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (১৭৮৭ শক)। এই তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় হরিনাথ জানান যে 'এবারেও অনেক স্থান সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত' হয়েছে।[১০] পরবর্তী চারবছরের মাথায় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'বিজয়বসন্ত'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় হরিনাথ আবারও লেখেন : 'এবারেও ইহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পরিবর্দ্ধনের সহিত সংশোধিত করিয়াছি।'[১১] 'বিজয়বসন্ত' এর প্রতিটি সংস্করণে এই ক্রমাগত পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধনের জীবন্ত প্রক্রিয়াটি হরিনাথের ভাষাচর্চার ধারাবাহিক প্রয়াস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যার (কার্তিক, দ্বিতীয় পক্ষ, ১২৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রামবার্তায় 'বিজয়বসন্ত' এর চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রামবার্তার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের (১৮৮১-৮২ খ্রিঃ) সংখ্যাগুলিতে 'বিজয়বসন্ত'-এর নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছিল। এই হিসেবে বোঝা যায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে 'বিজয়বসন্ত'-এর আরও পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, যা বইটির অসম্ভব জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়।

১৩২১ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ 'বিজয়বসন্ত'-এর চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হরিনাথের মৃত্যুত্তর পর্যায়ে এই নতুন সংস্করণের 'নিবেদন'-এ জলধর সেন লিখেছেন :

> কাঙাল হরিনাথ প্রণীত 'বিজয়বসন্ত' নামক সর্ব্বজন পরিচিত উপাখ্যানের ত্রয়োদশ সংস্করণ অনেকদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এতদিন নানা অসুবিধায় তাহার আর সংস্করণ হয় নাই। কিন্তু এখন অনেকেই কাঙালের 'বিজয়বসন্ত' পাঠ করিবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি এই পুস্তকখানির পুনঃ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছি এবং পূর্ব্ববর্তী কয়েকটি সংস্করণে যে সমস্ত ভ্রম প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।[১২]

জলধর সেনের এই 'নিবেদন'-অংশ থেকে জনা যায়, এই সংস্করণে বইটি কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের (২০৩/১/১ নম্বর) প্যারাগন প্রেসে ছাপা হয়েছিল। এই সংস্করণটি

দু'রকম মলাটে প্রকাশিত হয়েছিল, একটি কাগজের মলাট (সুলভ সংস্করণ) এবং অপরটি সিল্কের মলাট (শোভন সংস্করণ)। এই সংস্করণে তিনটি ছবিও মুদ্রিত হয়েছিল।

এই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় প্রায় দু'বছরের মাথায় (ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দে) 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় কলকাতায় গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স-এর প্রকাশনায়। এই পুস্তকের শেষে 'বিজয়বসন্ত'-এর একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ :

'চরিত্র-গঠনের সুকোমল উপাদান

চকচকে ঝকঝকে বাঁধাই

কাঙাল-হরিনাথের

**বিজয়-বসন্ত**

গল্পে শিক্ষা পাঠে শান্তি

রঞ্জিত নয়নাভিরাম চিত্রে সজ্জিত

সম্পূর্ণ নূতন আকারে বাহির হইল

শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে সাহিত্যে চির-নূতন এই অমূল্যরত্ন পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যাকে, ভ্রাতা-ভগিনীকে, স্বামী-স্ত্রীকে অর্পণ করুন। উহার আদর্শে ভবিষ্যৎ সংসার অনাবিল জ্যোৎস্নার রজতধারায় আলোকিত হইবে।'[১৬]

বটতলার বইয়ের ধরনের এই বিজ্ঞাপন-এর নমুনাটি নিঃসন্দেহে কৌতুককর।

'বিজয়বসন্ত'-এর কাহিনি জয়পুরের রাজা জয়সেনকে নিয়ে। জয়সেনের প্রধানা মহিষী রানি হেমবতী দুই পুত্রের—বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের—জন্ম দেওয়ার কিছুকাল পরে মারা যান। দাসী শান্তার আপত্তি সত্ত্বেও রাজা পুনরায় বিবাহ করেন। বৃদ্ধ রাজা তরুণী ভার্যার অনুগত হয়ে পড়েন। এই সুযোগ নিয়ে নতুন রানি দুর্জময়ী বিজয় ও বসন্ত সম্পর্কে রাজাকে ভুল বুঝিয়ে তাদের নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নির্বাসনে দুই ভাই ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দুজন দুধরনের জীবনযাপন করতে শুরু করে। পরে ঘটনাক্রমে দুজনেই দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করে। সস্ত্রীক বিজয় ও বসন্ত বনের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং একে অপরের সন্ধান করতে থাকে। এই পর্যায়ে বিজয়ের স্ত্রী সুকুমারী এবং বসন্তের স্ত্রী বিমলা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং একে অপরের দুঃখের কাহিনি শোনে। পরে এক স্বয়ম্বর সভায় বিজয় এবং বসন্ত তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। রাজা জয়সেনের সঙ্গেও পুত্রদের পুনরায় মিলন ঘটে।

'বিজয়বসন্ত' যে কেবলমাত্র ছাত্রপাঠ্যের জন্য জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয়। সাধারণ্যেও উপন্যাসটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। 'বিজয়বসন্ত'-এর অনুসরণে এর পরবর্তীকালে অনেক নাটক-গীতাভিনয় রচিত হয়েছিল। মতিলাল রায়ের 'বিজয়চণ্ডী' গীতাভিনয়টি

প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের শেষার্ধে। 'বিজয়চণ্ডী'র প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ মতিলাল রায় লিখেছিলেন :

> বিজয়চণ্ডী গীতাভিনয় প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষ হইতে আনুপূর্ব্বিক গৃহীত হয় নাই। কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার প্রণীত বিজয়বসন্ত নামক করুণরসপূর্ণ সুললিত কাব্যের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের শ্রুতি-সুখকর ও মনোজ্ঞ করিবার জন্য মূলগ্রন্থবর্ণিত উপন্যাসের অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি।[১৪]

হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-কে ভিত্তি করে যে 'বিজয়চণ্ডী' রচিত হয়েছিল, এ স্বীকৃতি স্বয়ং মতিলাল রায় তাঁর 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্যে পরিস্ফুট করেছেন। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যও 'বিজয়চণ্ডী' যে হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর অবলম্বনে রচিত সে কথা নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন।[১৫] বাঙলা সাহিত্যের দু'জন ইতিহাসকারও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[১৫ক]

সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিজয়বসন্তযাত্রা'র কথা উল্লেখ করেছেন। এর লেখক হিসেবে তিনি একবার মহেশচন্দ্র দাস দে, একবার নফরচন্দ্র দত্তের কথা বলেছেন।[১৬] অবশ্য তিনি একথাও একই সঙ্গে বলেছেন যে মহেশচন্দ্র দাস দে 'সম্ভবত অপরের লেখা' কিনে নিজের নামে 'ছাপাইতেন'।[১৭] এই 'সম্ভবত' শব্দটিকে কোন বিতর্কক্ষেত্রে না আনলে এতথ্যই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে যে নফরচন্দ্র দত্ত-ই 'বিজয়বসন্তযাত্রা'র লেখক। অবশ্য হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মতিলাল রায়ের সমসাময়িক মহেশচন্দ্র দাস দে-কেই 'বিজয়বসন্তযাত্রা'র রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর নামগত প্রভাব এখানে লক্ষণীয়।

এর অনেক আগে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গোপীমোহন ঘোষ-এর 'বিজয়বল্লভ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নামগত সাদৃশ্য থাকলেও অবশ্য 'বিজয়বসন্ত'-এর সঙ্গে 'বিজয়বল্লভ'-এর কোন কাহিনিগত মিল নেই। তবে 'বিজয়বসন্ত'-এর প্রভাব 'বিজয়বল্লভ'-এ অপ্রকট নয়।

১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় অমৃতলাল বসুর নাটক 'বিমাতা বা বিজয়বসন্ত'। এই নাটকটিরও বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য রয়ে গেছে হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর সঙ্গে। স্বভাবতই এই নাটকের 'কথাবস্তু' যে মৌলিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। অরুণকুমার মিত্রের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে বিজয়বসন্তের কাহিনি 'রূপকথার আকারে' বাঙলাদেশে 'বরাবরই' প্রচলিত ছিল। সেই কাহিনি নিয়ে জি.সি.গুপ্ত প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন। তবে নাটকের নাম বিজয়বসন্ত না রেখে, রেখেছিলেন 'কীর্তিবিলাস'। এই 'কীর্তিবিলাস'-এর কাহিনি শেষ পর্যন্ত বিজয়বসন্ত-এর প্রচলিত রূপকথার কাহিনিকে অনুসরণ করেনি।[১৯]

হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এ বিমাতা দুর্জময়ীর সপত্নীপুত্র বিজয়ের প্রতি কোন অনুরাগের আভাষ লক্ষিত হয় না, যা কিনা অমৃতলালের নাটকে লক্ষণীয়। অমৃতলালের

নাটকে রানি দুর্জময়ী শেষ পর্যন্ত সত্যঘটনা প্রকাশ করে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু হরিনাথের উপন্যাসে রানি দুর্জময়ী আত্মহত্যা করেনি। অমৃতলালের নাটকে হরিনাথের উপন্যাসের কাহিনিগত ভিত্তিই শুধু নয়, এমনকি প্রধান প্রধান চরিত্রের নামগত মিলও রয়ে গেছে (যেমন—জয়সেন, দুর্জময়ী, শান্তা, দুর্লতা, বিজয়, বসন্ত প্রভৃতি)।[২০]

এছাড়া ১৩২৮ বঙ্গাব্দে অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ 'সৎমা বা বিজয়বসন্ত' নামে একটি 'আখ্যানমূলক নাটক' লিখেছিলেন। তবে অবশ্য একে নাটক-এর পরিবর্তে যাত্রা বলাই শ্রেয়।[২১] এমনকি বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে 'বিজয়বসন্ত'-এর কাহিনিকে ভিত্তি করে একটি নির্বাক ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছিল।[২২]—এসব তথ্য নিঃসন্দেহে 'বিজয়বসন্ত'-এর প্রভূত জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

## তথ্যপঞ্জি

১। আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯
২। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ১৮ বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ২৯, ১৮৭৬)। পৃ. ১৭
৩। আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। প্রগুক্ত। পৃ. ২৯
৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ২৫ বৈশাখ ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (মে ৬, ১৮৭৬)। পৃ. ২৫
৫। চন্দ্রশেখর কর : কাঙাল হরিনাথের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি। মানসী, আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৪০৩
৬। 'বিজয়বসন্ত'-এর 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন'। কুমারখালি। ১৭৮১ শক
৭। প্রাগুক্ত
৮। 'বিজয়বসন্ত'-এর 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'। কুমারখালি। ১৭৮৪ শক
৯। প্রাগুক্ত
১০। 'বিজয়বসন্ত'-এর 'তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন'। কুমারখালি, ১৭৮৭ শক
১১। 'বিজয়বসন্ত'-এর 'চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন'। কুমারখালি, ১৭৯১ শক
১২। 'বিজয়বসন্ত'। 'নূতন সংস্করণ' (চতুর্দশ সংস্করণ)। কুমারখালি (জলধর সেন লিখিত 'নিবেদন', ১ আশ্বিন ১৩২১ বঙ্গাব্দ)
১৩। কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত। গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ভাদ্র ১৩২১ সংস্করণ। পৃ. ১৭৮
১৪। মতিলাল রায় : বিজয়চণ্ডী। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। কলকাতা। 'বিজ্ঞাপন' (১৫ মাঘ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ১-২
১৫। হংসনারায়ন ভট্টাচার্য : যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়। চলন্তিকা, নবদ্বীপ, নদীয়া। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১০০

১৫ক। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। চতুর্থ খণ্ড। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলকাতা। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫৮০

সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। উনবিংশ শতক। ইস্টার্ন পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৭০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১৩

১৬। সুকুমার সেন : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। ইস্টার্ন পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৭০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১২, ১১৭

১৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১২

১৮। হংসনারায়ন ভট্টাচার্য। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২২

১৯। অরুণকুমার মিত্র : অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য। নাভানা। কলকাতা। ১৯৭০ সংস্করণ। পৃ. ১৮৫

২০। প্রাগুক্ত

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯০

২২। আশা গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি.এম. লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১২

# বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত : বিজয়বসন্ত

হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-কে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথম উপন্যাসের সম্মান দিয়েছেন স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে। কাঙাল হরিনাথের পৌত্র অতুলকৃষ্ণ মজুমদার দাবি করেছেন যে হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস প্রথমে রচিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। তখন 'হস্তলিপি অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে নাটকে রূপ দিয়ে অভিনীত হতে থাকে'। এতে করে 'বিজয়বসন্ত'-এর 'প্রচুর চাহিদা' সৃষ্টি হয়। ফলে মুদ্রিত অক্ষরে 'বিজয়বসন্ত' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এই তথ্য দিয়ে অতুলকৃষ্ণ মজুমদার হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে দাবি করেছেন।[১]

আচার্য সুকুমার সেন 'বাঙলা উপন্যাসের মূল' সন্ধানে চারটি ধারার সন্ধান পেয়েছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় ধারায় তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'নীতিমূলক কাহিনী'-কে। এবং এই নীতিমূলক কাহিনি হিসেবে তিনি হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-কে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে 'বিজয়বসন্ত'-এর আগে আরও দুটি 'উপন্যাস'-এর কথা উচ্চারিত হয়। একটি হলো প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যপঞ্জিকা'য় ম্যলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে 'বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস' বলে 'সুস্পষ্টভাবে' ঘোষণা করা হয়েছিল।[৩] চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্রে লিখেছেন :

> বিষয়বস্তুর মৌলিকতার জন্য 'ফুলমণি ও করুণার' দান অবশ্যই স্বীকৃতি লাভ করবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। এর ছয় বৎসর পূর্বে 'ফুলমণি ও করুণা' প্রকাশিত হয়েছে। এই কাহিনীর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের কতকগুলি লক্ষণ সুস্পষ্ট। ...'ফুলমণি ও করুণা' এখন থেকে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে মর্যাদা লাভ করবে।[৪]

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই থামেননি। তিনি আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন *'শুধু যে কালবিচারে 'ফুলমণি ও করুণা' বাঙলা ভাষার প্রথম উপন্যাস তা নয়; গুণ বিচারেও এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে'।*[৫] *ফুলমণি ও করুণার বিষয়বস্তুকেও তিনি* 'মৌলিক' বলে ঘোষণা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বাঙলায় 'প্রথম উপন্যাস' জাতীয় কোনো আখ্যা দেননি। এ ধরনের বই 'বাঙ্গালায় প্রথম' বললেও তিনি অকপটে স্বীকার করেচেন যে বইখানি 'জনপ্রিয়' হতে পারেনি কারণ 'সাধারণ বঙ্গবাসী সমাজের জন্য ইহার কোন বাণী বা আবেদন ছিল না।'[৬]

ফুলমণি ও করুণার লেখিকা ম্যলেন্স নিজেও লেখাটিকে উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করেননি। তিনি একে বাস্তব ঘটনা নির্ভর নীতিদীর্ঘ 'গল্পই' বলেছেন।[৭] বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' ছিল শেক্সপীঅরের 'এরর অব জাজমেণ্ট'-র এর বঙ্গানুবাদ। পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সুশীলা চন্দ্রকেতু' ছিল শেক্সপীঅরের 'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট'-এর বাঙলা অনুবাদ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কৃত 'সুশীলার উপাখ্যান' এজওঅর্থ-এর উপন্যাসের অনুসরণ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরী বিনিময়' হোবার্ট কলটর-এর লেখার অনুবাদ। হরচন্দ্র ঘোষের 'চারুমুখচিত্তহরা' শেক্সপীঅরের 'রোমিও জুলিএত'-এর অনুবাদ।[৮] এভাবে দেখা যায় উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর লেখকরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে য়্যুরোপীয় বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের বাঙলা রূপান্তর বা বাঙলা-অনুসরণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। এর ফলে বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সন্দেহ নেই। তবে মৌলিক গল্প-উপন্যাসাদির সৃজনকর্মের প্রয়োজনীয়তা এতে করে উপলব্ধ হচ্ছিল, যা উপন্যাস বা উপন্যাস-ধর্মী রচনার প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অনুশীলনের জায়গায় নিয়ে আসছিল।

ম্যলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' আদৌ কোন মৌলিক রচনা নয়। উনিশ শতকের অনুবাদ বা অনুসরণগত যেসব গ্রন্থের নাম ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, ম্যলেন্স-এর ফুলমণি ও করুণাও তেমনি একটি অনুবাদ/অনুসরণগত কাহিনির বাঙলা রূপ। সুকুমার সেন ফুলমণিকে 'আকারে ও প্রকারে উপন্যাসের মত'[৯] বললেও স্বীকার করেছেন, বইটি 'সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, অনুবাদগর্ভ।'[১০] এ ব্যাপারে সবিতা দাস-এর বক্তব্য তিনি মেনে নিয়েছেন। সবিতা দাস লিখেছেন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ফুলমণি ও করুণা পুনরায় প্রকাশিত হলে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণ

> ....আলালের ঘরের দুলাল-এর পরিবর্তে এটিকেই বাঙলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক প্রকাশ বলে অনেকে ধরে নিলেন। এই ক-বছরে বইটি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কোন ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ।....বাঙলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় লেখক সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে পুরাতন

বাঙ্গালা বইয়ের রিভিয়্যুগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমরা এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পেয়েছি, যা থেকে বইটির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। বইটি.... 'The Week'-এর মডেলে লেখা এবং স্থানে স্থানে (বিশেষ করে কথোপকথনগুলিতে) প্রায় অনুবাদ।[১১]

একথা লেখার পর সবিতা দাস 'দ্য ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিস্ট, ১৮৫২ অগাস্ট'-এর ২৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে : ফুলমণির ভাবগত চিন্তা, পরিকল্পনা এবং উপাদান একটি সুবিখ্যাত ইংরেজি পুস্তক 'দ্য ইউক' থেকে নেওয়া। 'দ্য ইউক'-এর রবার্ট এবং মেরি, ফ্যানি, উইলি, হানা এবং শিশুটি সহ তাদের সন্তানদের চরিত্রগুলি ফুলমণি ও করুণায় বাঙলা ভাষায় প্রেমচাঁদ এবং ফুলমণি সহ সুন্দরী, সাধু, সত্যবতী ও শিশু প্রিয়নাথ নাম্নী তাদের সন্তানদের চিত্রিত করা হয়েছে। করুণা এবং তার স্বামী, তাদের পুত্রদ্বয় বংশী ও নবীন 'দ্য উইক'-এর ন্যানী, তার মাতাল স্বামী এবং তাদের দুটি সন্তানের বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণ বই কিছু নয়। ফুলমণি ও করুণার প্যারী চরিত্রটি 'দ্য উইক'-এর নেলি চরিত্রের প্রতিধ্বনিস্বরূপ। এছাড়া বইটির ঘটনা, কথোপকথনও ইংরেজি পুস্তকটি থেকে নেওয়া।[১২]

এরপর ফুলমণি ও করুণার প্রথম বাঙলা উপন্যাসের দাবি বাস্তব ভিত্তি বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। ফুলমণি আদৌ মৌলিক যে নয়, এটি যে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির মতো অনুবাদকর্ম, তা আর এরপর অস্পষ্ট থাকে না। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাসের দাবিকে মনিরুজ্জামান-ও 'অর্থহীন'[১৩] বলে উল্লেখ করেছেন। আনিসুজ্জামানও ম্যলেন্সের এই কাহিনির মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে। গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশের আগে 'আলালের ঘরের দুলাল' 'মাসিক পত্রিকায়' ১২৬১ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি ১২, ১৮৫৫) তারিখের সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করে। তিরিশ অধ্যায়ের আলাল সম্পূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস মনে করেন।[১৪]

১৮৪৮ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সময় পর্যায়ে পাঠকদের কাছে উপন্যাসপাঠের চাহিদা একটি বাস্তব তথ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই সময়সীমায় পঠিত উপন্যাসের সংখ্যা ৯৭৬৭ থেকে ১৩৬৯৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছিল।[১৫] ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২৭৮৬৪টি পঠিত বইপত্রের মধ্যে পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৫০৩৭, সাধারণ বইপত্র ৯১৩০ এবং উপন্যাসের সংখ্যা ১৩৬৯৭টি।[১৬]

পাঠকবর্গের উপন্যাস পড়ার চাহিদার সঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উপন্যাস-রচনা-প্রচেষ্টায় সামিল হওয়া লেখকগণের যে বিলক্ষণ পরিচিতি ছিল, তা বলাইবাহুল্য। প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিনাথ মজুমদার, গোপীমোহন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের গদ্যকাহিনিকে বিভিন্ন শব্দচর্চায় উপন্যাস অভিধা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

প্যারীচাঁদ তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন : 'অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে'[১৭]—আর সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্যারীচাঁদ সচেতনভাবে উপন্যাস-রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাঙলা ভাষায় উপন্যাস রচনার আদিযুগে প্যারীচাঁদ উপন্যাস রচনায় কতকখানি ব্যর্থ বা সার্থক সে আলোচনায় না গিয়ে একথা বলাই যায় যে চরিত্র সৃষ্টি, কাহিনি-বুনন, সমাজমনস্কতা প্রভৃতি দিক দিয়ে প্যারীচাঁদ অনেকখানি চেষ্টা করেছিলেন। জীবেন্দ্র সিংহরায় প্যারীচাঁদের আলালকে 'উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত' বলেছেন।[১৮] মনিরুজ্জামানও বলেছেন :

> কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তববুদ্ধি এবং কথার বয়ন-দক্ষতাই 'আলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্রকে প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।[১৯]

কিন্তু 'কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তববুদ্ধি এবং কথার বয়ন-দক্ষতাই' কি ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দানের পক্ষে যথেষ্ট? চরিত্রসৃষ্টি, জীবনদৃষ্টি, কাহিনির নিটোলরূপ, ঘটনার বিচিত্রতা এবং চরিত্রের দ্বন্দ্ব কি একান্তই গৌণ ব্যাপার? মনে রাখতে হবে প্যারীচাঁদ বা হরিনাথ মজুমদার যেসময় উপন্যাসলেখার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন সেসময় বাঙলা ভাষায় লেখা কোন উপন্যাসের নিটোল আদর্শ বা নমুনা তাঁদের সামনে ছিল না। সেসময় তাঁদের প্রয়াসে উপন্যাস-সৃষ্টির আদিযুগে উপন্যাসের লক্ষণ-চিহ্ন সন্ধানই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। উনিশ শতকের তিরিশের দশকে 'সমাচার দর্পণ'-এর পৃষ্ঠায় বা 'সম্বাদ কৌমুদী'র পাতায় কিম্বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'-আদিতে গল্প বা কাহিনি রচনার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, প্যারীচাঁদের আলাল-এ তার কতখানি বিকাশ ঘটেছে এবং তার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কাহিনি নির্মাণের প্রকুশলীপনায় তা কতখানি উপন্যাসের লক্ষণ-রেখায় চিহ্নিত হয়েছে, বোধ করি সেটাই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।—কিন্তু এসব প্রশ্ন তো মৌলিকত্বের গৃহীত সীমানার মধ্যেকার বিষয়। প্যারীচাঁদের 'আলাল' কি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা?

প্যারীচাঁদের আলালের গল্পের সূচনা আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের উষালগ্নে। প্যারীচাঁদ রামকমল সেনের 'আ ডিকশনারী ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলী' শীর্ষক পুস্তকটির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশের লিখিত রূপের সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর চতুর্থ অধ্যায়ের 'কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ' শীর্ষক অংশের প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করার মতো। রামকমল সেনের উক্ত ইংরেজি গ্রন্থের ভূমিকাংশের প্রায় অনুবাদ করেছেন প্যাবীচাঁদ তাঁর আলালের চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে। রামকমলের উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠার সঙ্গে প্যারীচাঁদের আলালের (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) ১১ পৃষ্ঠার অনুবাদগত মিল[২০] আলালের মৌলিকত্বের দাবিকে প্রশ্নাকুল করে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস প্যারীচাঁদের এই 'উপন্যাসের উপকরণ'

যে তাঁর 'একান্ত মৌলিক নয়' একথা নির্দ্বিধায় বলেছেন।[২১] এ ছাড়া রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'দুর্গামঙ্গল' যা ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, তার 'কঙ্কালীর অভিশাপ' অধ্যায়ের সঙ্গে প্যারীচাঁদের আলালের একাদশ অধ্যায়ের আশ্চর্যরকম মিল লক্ষ্য করা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত এ বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[২২] এই মিলের দিকটি একটু দেখানো যাক :

**'দুর্গামঙ্গল'**-এ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার লিখেছেন :

রাঢ়দেশী ভট্টাচার্য কহে দিয়া হাঁকি।
শুন বাফা কথাটি উত্তর করি ফাঁকি।।
শিরোমণি মেকটি মেরেছে ঐ স্থলে।
বঙ্গদেশী ভট্টাচার্য্য শুনি কিছু বলে।।

আর প্যারীচাঁদ **'আলালের ঘরের দুলাল'-এ লিখেছেন :**

কাশীজোড়া পণ্ডিত বলিলেন—
কেমন কথা গো? বাক্যটি প্রিমিধান কর নাই—
যে ও ঘটকে পট করে পর্ব্বতকে বহ্নিমান ধূম—
শিড়মণি যে মেকটি মেরে দিচ্ছেন।

এছাড়া ১৭৮০ শকাব্দের সংখ্যার (ইংরেজি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'-এর আদর্শ অনুসৃত বলে উল্লেখ করেছিলেন।[২৩]

হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' প্রথম মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে, আলাল-প্রকাশের ঠিক পরের বছর। বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী রচনা বা উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত কাহিনি যে নামেই অভিহিত করি না কেন উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে রচিত তিনটি গ্রন্থই এই আখ্যার দাবিদার হয়ে গেছে। ১৮৫২-য় ফুলমণি, ১৮৫৮-য় আলাল এবং ১৮৫৯-এ বিজয়বসন্ত। একটি দশকের নয় বছরের অন্তর্বর্তী সময়সীমায় উপন্যাস-রচনা-প্রয়াসের এই তিনটি স্বাক্ষর বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। বাঙলা ভাষায় উপন্যাসের কোন লিখিত নমুনা না থাকায় মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। ফুলমণি ও আলাল এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' সম্পর্কে ফুলমণি-আলালের মৌলিকতা-ক্ষুণ্ণকারী অভিযোগ তোলার কোন সম্ভাবনা বা পরিসর নেই। হরিনাথ স্বশিক্ষিত। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। তিনি ইংরেজি জানতেন না। ফলে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা তাঁর ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত বিষয়। 'বিজয়বসন্ত'-এর প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ হরিনাথ লিখেছেন :

> ইহা কোন পুস্তক হইতে অনুবাদিত নহে। সমুদায় বিষয়ই মনঃকল্পিত। ইহার আদ্যন্ত কেবল করুণ রসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ।[২৪]

হরিনাথের এই স্বীকৃতিতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, বিজয়বসন্তের আগের দুটি 'উপন্যাস'-এর অনুবাদজনিত সৃজনকর্ম সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ফলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তিনি তাঁর বিজয়বসন্ত অনুবাদকর্ম-না-হওয়ার বিষয়ের অগ্রিম ঘোষণা করেছেন।

'বিজয়বসন্ত'-এর কাহিনিটি এরকম : জয়পুরের রাজা জয়সেন, তাঁর মহিষী (পট্টমহিষী) হেমবতী। রানির কোন পুত্রর সন্তান না থাকায় মনোবেদনার কারণ হয়েছিল রাজা-রানি উভয়েরই। অবশেষে রানি পুত্রবতী হন। দুই পুত্র জন্মলাভ করে। নাম রাখা হয় বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার। বিজয় বড়ো। এরপর রানি মারা যান। কুলপুরোহিত ধৌম্য-এর কথায় রাজা পুনর্বিবাহে রাজি হন। বৃদ্ধ রাজার পুনর্বিবাহে দাসী শান্তা বারবার আপত্তি জানায়। শান্তার আপত্তি গ্রাহ্য হয় না। রাজপরিবারে নতুন রানির আগমন ঘটে। নতুন রানির নাম দুর্জময়ী। এই তরুণী রানির পরিচারিকা হয়ে আসেন দুর্লতা। দুর্লতা রানিকে কুপরামর্শ দিয়া রাজাকে বিজয়-বসন্ত সম্পর্কে বিরূপ করে তোলে। রানি মিথ্যা অভিযোগ তুলে রাজাকে জানায় যে তাঁর পুত্রদ্বয় বিজয় ও বসন্ত তাঁকে (অর্থাৎ রানিকে) যথেচ্ছ 'অযোগ্য কথা' বলে (অর্থাৎ গালাগালি করে) রীতিমতো মারধর করে পরণের কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে। তরুণী ভার্যার প্রতি অনুরক্তিবশত রাজা তাঁর কথা বিশ্বাস করে, কোনরকম তদন্ত নিরপেক্ষতায় বিজয়-বসন্তকে প্রথমত হত্যার আদেশ দেন, পরে প্রধান অমাত্যের অনুরোধ ও পরামর্শে প্রাণে না মেরে নির্বাসন দণ্ড দেন। নির্বাসনে বিজয় ও বসন্ত পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিপন্ন বসন্ত এক মুনির আশ্রমে আশ্রয় পায় ও সেখানে লালিত পালিত হয়ে বিদ্যার্জন করে পণ্ডিত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী সময়ে এক রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। অন্যদিকে বিজয় এক মত্তহস্তীর দ্বারা এক রাজমহিষীর নিকট আনীত হন। রাজা যুদ্ধে মারা গেলে তাঁর প্রিয় হস্তি রাজার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যে রাজপুত্র বিজয়কে দেখে তাকেই রাজা মনে করে রাজমহিষীর কাছে নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে সেই রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু ভাই বসন্তের জন্য বিজয়ের মনস্তাপ নিরসিত হয়নি। রানিকে নিয়ে বিজয় বসন্তের সন্ধানে বেরোন এবং বনের মধ্যে একে অপরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে বসন্তও সস্ত্রীক দাদা বিজয়ের অন্বেষণে বনের মধ্যে একে অপরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বিচ্ছিন্নতার পর্যায়ে একে অপরকে খুঁজতে থাকে। এই পর্বে দুই ভাইয়ের স্ত্রীরা একে অপরের দেখা পেয়ে নিজ নিজ দুঃখের কাহিনি শোনায়। বিজয়ের পত্নীর নাম সুকুমারী, বসন্তের বিমলা। শেষ পর্যন্ত সুকুমারী-বিমলার পুনর্বিবাহের ঘোষণায় স্বয়ম্বর সভায় বিজয় ও বসন্তের সঙ্গে সুকুমারী-বিমলা পুনর্মিলিত হয়। রাজা জয়সেন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রদের ফিরে পেয়ে খুশি হন, বিজয়-বসন্ত সস্ত্রীক নিজরাজ্য জয়পুরে ফিরে গেলে দাসী শান্তা আনন্দে উদ্বেল হন।

এই 'বিজয়বসন্ত' রচনা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে হরিনাথ 'বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে যৎকিঞ্চিত উপকার' সাধন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের মতো হরিনাথও 'Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস'[২৫] পড়ার পাঠক-ইচ্ছার চাহিদাকে মেটাতে 'বিজয়বসন্ত' লিখেছিলেন। তবে নগর সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত প্যারীচাঁদ তাঁর ভাবনাকে যেভাবে গ্রতিত করতে চেষ্টা করেছেন, কলকাতা শহরের আলোকচ্ছটায় সীমানার বাইরে কুমারখালির মতো একটি গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা, প্রথাগত শিক্ষালাভে বঞ্চিত স্বশিক্ষিত হরিনাথ তাঁর ভাবনাকে সেভাবে গ্রথিত করেননি, করা সম্ভবও ছিল না। প্যারীচাঁদ উপন্যাস-পাঠের আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন 'প্রায় সকল লোকেরই মনে', আর গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিনাথ উপন্যাস-পাঠের আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন ব্যাকরণ-পদার্থবিদ্যা-ভূগোল প্রভৃতি পাঠে 'নিতান্ত ক্লান্ত' বালকদের মধ্যে।

বালকদের 'চিত্তরঞ্জন'-এর লক্ষ্যে রচিত হলেও 'বিজয়বসন্ত'-এর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টতা লক্ষণীয় :

(১) একটি নিটোল কাহিনি
(২) ঘটনার ঘনঘটা ও বিচিত্রতা
(৩) রাজপ্রাসাদ এবং অরণ্য-অশ্রমের দ্বিবিধ সংস্কৃতি
(৪) প্রাক-বিবাহ অনুরাগ
(৫) সমাজ-দৃষ্টি
(৬) করুণ রসসৃষ্টির মাধ্যমে মিলনান্তক পরিণতি

প্রথমত, কাহিনির বর্ণনার মধ্যে কোন খাপছাড়া ভাব নেই। কোন অসংবদ্ধতা, কোন বিচ্ছিন্নতা, কোন সংযোগহীনতা দুর্নিরীক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, বিজয় ও বসন্তের মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং শেষ পর্যন্ত তা রহিত হয়ে নির্বাসন দণ্ডাদেশ, বনের মধ্যে দুই ভাইয়ের বিচ্ছিন্নতা, দুই ধরনের প্রক্রিয়ায় দুজনের জীবনযাপন ও বিবাহ, বিবাহোত্তরকালে বনের মধ্যে পুনরায় বিচ্ছিন্নতা এবং পরবর্তীতে মিলন-কাহিনিতে ঘটনার ঘনঘটা ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। এছাড়া মত্ত হস্তি কর্তৃক বিজয়ের রাজপ্রাসাদে আনার ঘটনা ও বর্ণনা, যুক্তিবিপন্নকারী হওয়া সত্ত্বেও, রোমাঞ্চ-সৃষ্টিতে আলাদা মাত্রাযুক্ত করেছে।

তৃতীয়ত, রাজপ্রাসাদ ও অরণ্য-আশ্রমের দুই ধরনের কৃষ্টির পক্ষপাতহীন চিত্রাঙ্কন মনোযোগের দাবি রাখে। প্রাসাদ এবং আশ্রমের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টি-প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থত, উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের অন্তিম পর্বে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র সৃষ্টির অনেক আগে, কাহিনিতে প্রাক-বিবাহ অনুরাগের চিত্রাঙ্কন হরিনাথের আধুনিক মন-মনস্কতার পরিচয় বহন করে। 'বিজয়বসন্ত' থেকেই এর উদাহরণ :

> রাজতনয়া বিমলা, তাঁহার (অর্থাৎ বসন্ত-এর) বিমল রূপে ও নির্ম্মল গুণে নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমতী মহিষী, কল্যকার ভাবালোকনেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। এবং তিনি....বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রের, ও বিজয়চন্দ্রের প্রতি বিমলার প্রীতি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে উভয়ের অনুরক্তভাবলোকনে আপ্ত ও আত্মজনদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন।[২৬]

বিমলা-বসন্তের প্রাক-বিবাহ অনুরাগের চিত্র যেমন হরিনাথ 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনেক আগেই অঙ্কন করেছেন, তেমনি এই প্রাক-বিবাহ অনুরাগের প্রতি রাজমহিষীর প্রশ্রয় ও সমর্থনের চিত্রও এঁকেছেন, যা কিনা সমসময়ের গ্রাম-সমাজে চিন্তা-বিপ্লবের সমার্থক। বালকদের জন্য লিখিত 'উপন্যাস'-এ এই সব কাহিনি-পাঠে বালকেরা উত্তরকালে পরিপূর্ণ পাঠক হয়ে উঠুক, হরিনাথ এটাই চেয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁর দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়।

পঞ্চমত, 'বিজয়বসন্ত'-এ হরিনাথের সমাজ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যে সব পুরুষ 'স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী' তাঁদের হরিনাথ উমা-র মুখ দিয়ে 'কুসংস্কারবিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দ্দয় পুরুষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। যারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাদের সম্পর্কে এই উমা-কে দিয়েই হরিনাথ বলিয়েছেন :

> কুসংস্কার বিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দ্দয় পুরুষদিগের কথা কি কহিব, তাঁহারাই অবলা স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী, যদি তরুণ বয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকাগণের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাঁহাদিগের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না, কেহ রাম রাম...শব্দ করিয়া কানে হাত দেন। আবার কেহ কেহ কৌতুক করিয়া কহেন, এখন কতই হবে। স্ত্রীলোকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া রাজসভার সভ্য হইবে, পুরুষেরা তাহাদের পরিচ্ছদ লইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া থাকিবে। এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য তাহার কিছুই জানেন না, কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যাভ্যাস, এই কুসংস্কার তাহাদিগের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।[২৭]

এছাড়া বৃদ্ধ রাজার পুনর্ব্বিবাহে হরিনাথের আপত্তি শান্ত-র মাধ্যমে নথিবদ্ধ হয়েছে 'বিজয়বসন্ত'-এ। রাজার নির্ব্বিচার সিদ্ধান্তগুলিও এই 'উপন্যাসে' আলোচিত হয়েছে। এমনকি এই 'উপন্যাসে' হরিনাথ সহমরণ-এর প্রয়াসকে যুক্তিভিত্তিক নিবৃত্ত করেছেন।[২৮] 'ব্যাভিচারিনী' পত্নী পরিত্যাজ্য একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাভিচারাক্রান্ত পুরুষকে' ও স্ত্রী পক্ষে ত্যাগ করা যে সঙ্গত[২৯]—সাহসের সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছেন।

ষষ্ঠত, 'বিজয়বসন্ত'-এর কাহিনি নিছক করুণরসের প্রবাহে শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তা মিলনান্তক হয়েছে। তরুণী ভার্য্যানুরক্ত রাজার নির্ব্বিচারবাদ শেষ পর্যন্ত

আত্মসমালোচনায় প্রণত হয়েছে, অনুশোচনান্তে পুত্রদ্বয়কে সস্ত্রীক তাঁর রাজসভায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সত্যানুসন্ধানী হরিনাথ এভাবে সত্যের তথা 'ধর্মের' জয় ঘোষণা করেছেন।

এদিক দিয়ে বিচার করলে হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস প্রচেষ্টার সচেতন ফসল বলা যায়। 'বিজয়বসন্ত'-এর মৌলিকত্ব এবং এর ঘটনা সংস্থাপন চরিত্রের গতিময়তা প্রভৃতি এর কাহিনি বুননকে নিটোল রূপ দান করেছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাস-প্রচেষ্টার প্রথম ফসল হিসেবে 'বিজয়বসন্ত' সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আশা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

> তৎকালীন ইংরাজী ও সংস্কৃতে প্রভাবিত (কিছু পরিমাণে ফার্সী) যুগে হরিনাথ দেশের জলমাটির একটি সুমিষ্ট অন্তরঙ্গ সৌরভ বহিয়া আনিয়াছেন। ....বিজয়বসন্তকেই বাংলা সাহিত্যে বালক-বালিকাদিগের জন্য পূর্ণাঙ্গ এবং স্বাধীন উপন্যাসের সম্মান দেওয়া উচিত।[৬০]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র-ও লিখেছেন :

> 'বিজয়বসন্ত'...একটি উপন্যাস এবং গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত। সেকালে শিশুসাহিত্যে মৌলিক রচনা একরূপ বিরল ছিল।....গ্রন্থখানিকে যথার্থ শিশুসাহিত্যভুক্ত করার পক্ষে কয়েকটি আপত্তি থাকলেও বাংলার শিশুপাঠ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানিকে প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।[৬১]

সুকুমার সেন হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'কে উপন্যাস বা ঐ ধরনের কিছু বলে চিহ্নিত করেননি। তবে 'বিজয়বসন্ত'-এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 'বিদ্যাসাগরের অনুসরণ' করে যাঁরা সংস্কৃত কাব্য বা ইংরাজি গ্রন্থের 'অনুবাদ বা অনুসরণ' করে কিম্বা 'তদনুকরণে মৌলিক অথবা স্থানীয় গালগল্প' নিয়ে বাঙলা গদ্যে 'আখ্যায়িকা' রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিনাথ। তাঁর মতে 'হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' সাধারণ্যে কিছু আদর লাভ করিয়াছিল। একটি সুপরিচিত দেশীয় রূপকথা অবলম্বনে কাহিনী পরিকল্পিত।'[৬২] এর বেশি তিনি আর কিছু বলেননি।* শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন : 'কেউ কেউ বলেন, কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' প্রথম উপন্যাস। এতে মতদ্বৈধ আছে।'[৬৩] তিনি এই 'কেউ কেউ' বলতে কাদের কথা বলেত চেয়েছেন, তা যেমন বলেননি, তেমনি 'বিজয়বসন্ত'-কে প্রথম উপন্যাস বলার ক্ষেত্রে 'মতদ্বৈধ' কোথায় তারও উল্লেখ করেননি।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' শীর্ষক পুস্তিকায় রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন :

> প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয় বল্লভ'...।[৫৪]

রাজনারায়ণ বসু 'উপন্যাস সৃষ্টিকর্ত্তা' হিসেবে প্যারীচাঁদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু 'প্রথম উপন্যাস' সৃষ্টির কৃতিত্ব দিয়েছেন গোপীমোহন ঘোষকে তাঁর 'বিজয় বল্লভ'-এর জন্য। রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্যের অর্থ এটাই দাঁড়াই যে 'হাস্যরসাত্মক উপন্যাস'-এর রচয়িতা প্যারীচাঁদ প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেতে পারেন না, যা কিনা গোপীমোহন ঘোষের প্রাপ্য। এ বক্তব্যে বিরোধাভাষ থেকে যায়।

গোপীমোহন ঘোষ-এর 'বিজয় বল্লভ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। সুকুমার সেনের মতে এটিও 'বিজয়বসন্ত'র মতো 'একটি প্রচলিত রূপকথাকে উপন্যাসের ছাঁচে' ঢালার প্রচেষ্টিত রূপ মাত্র।[৫৫] অন্যদিকে 'বিজয়বল্লভ' প্রকাশের পরপরই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় 'বিজয়বল্লভ' শীর্ষক একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনায় লেখা হয়েছিল :

> সদাখ্যায়িকা নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারে বাঙ্গালাতে এখন এরূপ একখানিও গ্রন্থ নাই। আখ্যায়িকা নাম দিয়া কতকখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই আখ্যায়িকা নামের যোগ্য নহে।...সম্প্রতি একখানি সদাখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়াছে; তাহার নাম 'বিজয় বল্লভ'। শ্রীযুত বাবু গোপীনাথ ঘোষ ইহার প্রণেতা।[৫৬]

এই সমালোচনা-অংশ থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো—(১) 'বিজয়বল্লভ'-এর আগে অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগে 'একখানিও' প্রসিদ্ধির যোগ্য 'সদাখ্যায়িকা' প্রকাশিত হয়নি (২) আখ্যায়িকা নামে ১৮৬৩-পূর্ব সময়ে যা প্রকাশিত হয়েছে তার 'অধিকাংশই আখ্যায়িকা নামের' অযোগ্য (৩) 'সম্প্রতি' অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি 'সদাখ্যায়িকা' প্রকাশিত হয়েছে, তার নাম 'বিজয়বল্লভ' এবং এর রচয়িতা 'গোপীনাথ ঘোষ'।

এই বক্তব্য অনুযায়ী ফুলমণি, আলাল বা বিজয়বসন্ত—এর কোনটিও 'সদাখ্যায়িকা' বিশেষণের উপযুক্ত নয়। 'বিজয়-বল্লভ'-ই প্রথম 'সদাখ্যায়িকা' যা ১৮৬৩-তে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজয় বল্লভ'-এর রচয়িতার নাম এখানে গোপীমোহন ঘোষের পরিবর্তে ভুলক্রমে গোপীনাথ ঘোষ বলে উল্লেখিত হয়েছে।

'বিজয় বল্লভ'-এ উপন্যাস পরিকল্পনার আরও বিকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। বিজয়বসন্ত-এর চার বছর পরে উপন্যাস পরিকল্পনায় তিনি আরও অনেক সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, সন্দেহ নেই। এর মাত্র দু-বছর পর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাই বলে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে 'বিজয় বল্লভ'-কে বাঙলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস

বলা যায় না। 'বিজয় বল্লভ'-এ হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ভাষাচর্চাতেও গোপীমোহন হরিনাথের মতোই বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করেছিলেন।

১৯২৭ সংবৎ অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের 'রহস্যসন্দর্ভ'-এ লেখা হয় :

> বহুকালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার মনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশ সিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ক এক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের পরিবর্ত্তে মানুষিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং কয়েকখানি সুচারু প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নভেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু সেই অনুরাগের অনুরাগী।[৩৭]

শুধু যে ইংরেজিতে সুশিক্ষিত কয়েকজন মাত্র ভূত-প্রেতের পরিবর্তে 'মানুষিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত' হয়েছিলেন, তা নয়। ইংরেজি-না-জানা হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-ও 'মানুষিক ঘটনার উপন্যাস রচনার' প্রয়াসী উদাহরণ।

হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' কোনওরকম অনুবাদ ব্যতিরেকে বাঙলা ভাষায় লেখায় প্রথম উপন্যাস প্রচেষ্টা। কাহিনির বিষয়বস্তু ছাড়া এর ভাষাও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। 'বিজয়বসন্ত' লেখার আগে আলালী ভাষার প্রচার হওয়া সত্ত্বেও হরিনাথ তাঁর উপন্যাস প্রচেষ্টায় আলালী ভাষাকে নয়, বিদ্যাসাগরের ভাষারীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। ফুলমণি, আলাল ও বিজয়বসন্ত-এর ভাষার নিদর্শন নিচে দেওয়া হলো :

(১) 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর ভাষা

> ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পরমেশ্বর প্রাচীন ধার্ম্মিক লোকদের চরিত্র বর্ণনাকরণ দ্বারা আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেন, তাহাতে যেন তাহারা ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে নিদর্শনরূপ জানিয়া তাহাদের ন্যায় সদাচারী হইতে চেষ্টা করে।[৩৮]

(২) 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষা

> যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাল্‌কে মধ্যস্থ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে ২ বেড়ায়, জমিতে ছোঁয় ২ করিয়া ছোঁয় না সুতরাং উল্টেপাল্টে লইলে তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে।[৩৯]

(৩) 'বিজয় বসন্ত'-এর ভাষা

> মহারাজ করুণ স্বরে ....নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা অসাধ্য। অনন্তর রাজার অমাত্যবর্গ মহিষীর শব লইয়া যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। ভূপতি, প্রণয়িনীর শোকবাসরে শয়ন করিলেন।...[৪০]

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, হরিনাথের লেখায় 'বিদেশীয় ভাবের ছায়ামাত্রও হয় নাই' আবার সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন 'টুলো পণ্ডিতগণের' রচনার মতো দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগও তাঁর লেখায় নেই। হরিনাথের লেখা কখনও পাঠকের 'ভীতি উৎপাদক' হয়নি।[৪১] দীনেন্দ্রকুমার এখানেই থামেননি। তাঁর মতে 'বিজয়বসন্ত' যদি 'ইংরাজি বা অন্য কোনও ইউরোপীয় ভাষায় রচিত' হতো, যদি তা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে প্রকাশিত হতো, তাহলে 'বিজয়বসন্ত' একদিন 'রাসেলাস' 'পল ভার্জিনিয়া' বা 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর মতো 'সর্ব্বজন সমাদৃত গ্রন্থরাজীর ন্যায়' বিভিন্ন ভাষায় সমাদৃত হতো।[৪২]

এ বক্তব্যে ভাবাবেগজনিত অতিশয়োক্তির প্রাবল্য সত্ত্বেও, লেখকের ক্ষোভের আত্যন্তিকতা অ-ধরা থাকে না।

### তথ্যপঞ্জি

১। অতুলকৃষ্ণ মজুমদার : কাঙাল হরিনাথ ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকা। কাঙাল হরিনাথ স্মরণিকা-১ এবং ২ (১৩৮৭ এবং ১৩৮৮-৯০ বঙ্গাব্দ)। কুমারখালি। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫ এবং ৬

২। সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮৪

৩। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : ভূমিকা (হানা ক্যাথেরীন মলেন্স : ফুলমণি ও করুণার বিবরণ। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিসার্শ প্রা: লি: কলকাতা। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ) পৃ. সাত

৪। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত। পৃ. আট

৫। প্রাগুক্ত। পৃ. বত্রিশ

৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : পরিচিতি। প্রাগুক্ত। পৃ. তিন, পাঁচ

৭। Preface. প্রাগুক্ত। গ্রন্থের মূলনামপত্রের পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮। বদরুল হাসান : উনিশ শতক/নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস। জগৎমাতা পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৯৯০ সংস্করণ। পৃ. ৩৭

# ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যোগ্য উত্তরাধিকার : সাহিত্য-সাধক হরিনাথ

সত্যোৎসারিত নীতিবোধ এবং নীতি-উৎসারিত সত্যসন্ধিৎসা হরিনাথকে আক্ষরিক অর্থেই 'কাঙাল' করে তুলেছিল। এ কাঙাল শব্দ কোন কাঙালিপনা বা ভিক্ষাবৃত্তির পরিচায়ক নয়। এ কাঙাল সত্যসন্ধিৎসায়, সত্য ও ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপসহীন সংগ্রামের ব্রতচর্যায় জীবনাচরণকে অতি সাধারণ স্তরে নিয়ে এসে সাধারণ হতদরিদ্র-প্রপীড়িত মানবাত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠার সমার্থক। মানবমুক্তির লক্ষ্যে এই 'কাঙাল' সাধক শব্দের সমার্থক। মার্কসীয় পরিভাষায় যাকে শ্রেণীচ্যুতি ঘটানো বা ডিক্লাসড্ বলে, হরিনাথ সেই অর্থে শ্রেণীচ্যুত হননি, একথা সত্য। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় মানবমুক্তির লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাগত দর্শনের সঙ্গে হরিনাথের ভাবগত চিন্তনের কোন মিল ছিলনা। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি প্রপীড়িত হতদরিদ্র মানুষজনের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। তাদের সমস্যার সুরাহার জন্য কলম হাতে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও একাকী আপসহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তাঁর গ্রামবার্তার পাতায় পাতায় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বিধৃত হয়েছে, গ্রামবার্তায় পাতায় পাতায় মুমূক্ষু নির্যাতিত মানুষের ক্রন্দনধ্বনি শব্দায়িত হয়েছে, হতদরিদ্র মানুষের স্বার্থবিরোধী জমিদার-নীলকর-পুলিশ-বিচারব্যবস্থা তথা সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদ গ্রামবার্তার পাতায় পাতায় মূর্ত হয়েছে। জীবনসংশয় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভীত হননি, নীতি ও সত্যভ্রষ্ট হননি। নিজে ভালো হয়ে অপরের ভালো করার দীক্ষাদান থেকে বিরত হননি। গ্রামবার্তার উত্তর পর্যায়ে হরিনাথ বাউলগানের দল গড়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষের দরবারেই গেছেন। মানুষের উষ্ণসান্নিধ্য ছাড়া তিনি কখনও স্বস্তি পাননি।

গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিরক্ষর অসহায় মানুষজনের চোখে আলোকদান করার যে প্রয়াস তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শুরু করেছিলেন, সেই হরিনাথ পরবর্তী পর্যায়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে নিজের শিক্ষকতার চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে সর্বক্ষণের সংবাদপত্র কর্মী হয়েছিলেন। আরও পরবর্তীতে তিনি বাউলগানের ডালি নিয়ে সদলবলে গ্রাম-শহরের মানুষের কাছে গিয়েছেন। সাধনচর্যার পর্যায়েও তিনি জনমানুষ বিবর্জিত কোন পাহাড় বা নির্জনস্থানে পলায়নকামী হননি, এসময়েও তিনি স্বগ্রামেই স্থিত থেকেছেন।

গ্রামবার্তা-সংগঠনের পর্যায়ে হরিনাথ নিজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তরুণ সম্ভাবনাময় লেখকদের সাহিত্যরচনায় সক্রিয় উৎসাহ যুগিয়েছেন, গ্রামবার্তার পৃষ্ঠায় তাঁদের লেখা প্রকাশ করে তাঁদের লেখক হিসেবে ভবিষ্যত-প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছেন। নিজে ভালো হয়েই অপরের ভালো করার দর্শনগত ব্রতচর্যায় হরিনাথ তাঁর সাহিত্যশিষ্যদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শিক্ষাকর্মে ব্রতী হওয়ার আগে যখন হরিনাথের 'আহার নিদ্রার' সময় ও স্থানের কোন নির্দিষ্টতা ছিল না, সেসময় তিনি অধিকাংশ সময়েই কাটাতেন গ্রামের কৃষকদের মধ্যে, তাঁদের বাড়িতে তাঁদের দেওয়া খাবার আহার হিসেবে গ্রহণ করতেন। কোথাও কোন 'ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা লাইব্রেরীর' সন্ধান পেলে যেখানে গিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে বই পড়তেন।[১] গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের সান্নিধ্যে এসে তিনি তাঁদের দুঃখ যন্ত্রণা-দুর্দশার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আর এর সঙ্গে বইপড়ার অভ্যাসযুক্ততা তাঁকে পরবর্তীকালে কলম হাতে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রভূমি রচনা করেছিল। হরিনাথের লক্ষ্যই ছিল 'অন্যায় অত্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে'[২] নেতৃত্বদান করে সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। আর এই পত্রিকার জন্য তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন হৃতদরিদ্র মানুষজনের নিকট থেকে। 'গ্রামের দরিদ্র কৃষক প্রজা ও অসহায় মানুষেরা তাঁকে 'দেবতা' বলে ডাকতো এবং দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতো।'[৩]

'কপটতা পরিহর ভালো হও ভালো কর'—হরিনাথের এই নীতিকথা তাঁর জীবনাচরণ ও কর্মানুশীলনের আন্তরিক জায়গা থেকে উঠে এসেছিল। কার্যোপলক্ষে তিনি যখনই কোন গ্রামে গেছেন, সেখানে ছেলেমেয়েদের লেখার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি সাহিত্য রচনার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরের তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিত করেছেন, তেমনই সেইসব রচনা প্রকাশের ব্যাপারেও তাদের উৎসাহিত করতেন। চন্দ্রশেখর কর-কে হরিনাথ বলেছিলেন :

> যাহা কিছু লিখিবেন তাহাই প্রকাশ করিবেন। প্রকাশ করাই চৈতন্যের লক্ষণ। তদ্বিপরীতভাবই জড়ত্ব। দেখুন, অল্পবয়স্ক শিশুরা ধূলা কাদা দিয়া যদি কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহা হইলে উহা কিছু হউক বা না হউক সকলকেই দেখাইবে।...।'

তরুণ তথা নবীন লেখকদের রচনাকর্ম সম্পর্কে হরিনাথের আগ্রহের অন্ত ছিল না। গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পথানুসরণে হরিনাথ কলকাতা শহর থেকে দূরে কুমারখালিতে সাহিত্যরচনাশিক্ষাদানে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। হরিনাথের সাহিত্য-পাঠশালায় যেসব নবীন লেখকদের সমাগম ঘটতো, তাদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে সাহিত্য-সংসারে কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর মশাররফ হোসেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রশেখর কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিক কুমারখালি এবং তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশের স্রষ্টাই ছিলেন হরিনাথ।

সাহিত্যচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে হরিনাথ একদিকে যেমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি নিজেও অনুরূপ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগেই হরিনাথ 'অন্য কয়েকজন সমাজকর্মীর সহযোগিতায়'[৫] কুমারখালিতে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষে হরিনাথ এপ্রিল ১৫, ১৮৫৭ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে চিঠি লিখেছিলেন।

গ্রামবার্তা প্রকাশের সময়কালীন হরিনাথ 'একাদশীর সভা' নামে একটি সাহিত্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভায় 'ঘরোয়া পরিবেশে প্রতি একাদশীতে' সভার সদস্যরা বিভিন্ন লেখা পড়তেন ও তার ওপর আলোচনা হতো। এখানে যেসব রচনা পঠিত হতো, তা সভার সদস্যরা আগে রচনা করে এই সভায় পাঠের এবং আলোচনার জন্য নিয়ে আসতেন। হরিনাথ এবং তাঁর বন্ধু—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পিতা মথুরানাথ এইসব রচনাদির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতেন। এই সভায় সমসময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সংরক্ষিত করা হতো। এইসব পত্রপত্রিকা থেকে নির্বাচিত রচনাও পঠিত হতো। এই সভায় যে সব লেখকেরা লেখা পড়তেন, তাদের লেখা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পথানুসরণে, হরিনাথ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য করে তুলে গ্রামবার্তায় প্রকাশ করে সেইসব নবীন ও তরুণ লেখকদের আন্তরিক উৎসাহ দিতেন। 'গ্রামবার্তার স্থানীয় নিয়মিত লেখকরা'[৬] এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এছাড়া 'কুমারখালি সভা' ও 'অধ্যক্ষ সভা' নামে আরও দুটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিনাথ। হরিনাথের অন্যতম সাহিত্য শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সাক্ষ্যে জানা যায়, হরিনাথ এবং অক্ষয়কুমারের পিতা মধুরানাথ এবং তাঁদের সমবয়স্ক কুমারখালির যুবকরা অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাদি পাঠ করতেন এবং তাঁকে 'আদর্শ' বিবেচনা করে বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করতেন। হরিনাথ যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সাহিত্যপথের গুরু' এ স্বীকৃতিও স্বয়ং অক্ষয়কুমারের।[৭] অন্যত্র তিনি আবার উল্লেখ করেছেন :

> হরিনাথের আদর্শে, হরিনাথের উপদেশে, হরিনাথের সহায়তায় কুমারখালি প্রদেশে অনেকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল।[৮]

হরিনাথের আর এক সাহিত্য-শিষ্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবনীকারও উল্লেখ করেছেন যে কাঙাল হরিনাথ কুমারখালিকে 'সাহিত্যের মানচিত্রে চিহ্নিত' করেছিলেন। শিবচন্দ্রের হাতেখড়ি ও সাহিত্যসাধনায় দীক্ষার কাজও হরিনাথই করেছিলেন।[৯] জলধর সেনের হাতেখড়িও হরিনাথ দিয়েছিলেন। শিবচন্দ্র ও জলধরের বিদ্যারম্ভের কাজও হরিনাথের হাতেই হয়েছিল।[১০] জলধর সেন কাঙাল হরিনাথকে 'আমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, জীবনপথের একমাত্র পথদর্শক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[১১]

হরিনাথের সাহিত্যসভার প্রভাব পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গিয়েছে। হরিনাথের 'বিদ্যাৎসাহিনী সভা' 'একাদশী সভা' প্রভৃতির চারিত্রে গ্রামীণ চরিত্র বজায় ছিল। নতুন সাহিত্যসেবী ও নবীন সাহিত্য সেবাকাঙ্ক্ষীরা হরিনাথ প্রবর্তিত ও পরিচালিত এইসব

সাহিত্যসভায় আসতেন। সমসময়ের সাহিত্য জগতের জ্যোতিষ্ক সমাবেশ সেখানে ঘটতো না। গ্রামীণ পরিবেশে সাহিত্যচর্চার ও সাহিত্যরচনা শিক্ষার পাঠশালার চরিত্রই হরিনাথের সাহিত্যসভাগুলি অর্জন করেছিল। অন্যদিকে হরিনাথের এইসব সাহিত্যসভার পরবর্তীকালে দেখা গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 'প্রতি বৎসর' একটি 'সম্মিলনী' আহ্বান করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল 'সাহিত্যসেবীদের মধ্যে' পারস্পরিক 'আলাপ-পরিচয় এবং সদ্ভাব' বর্ধন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই সম্মিলনীর নামকরণ করেছিলেন 'বিদ্বজ্জন সমাগম'। এই সমাগমে সেসময় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ 'লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ' করা হতো।[১২] ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ শনিবার রাত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহবায়কত্বে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই বিদ্বজ্জন সমাগমের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'বাঙলা গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে' উপস্থিত ছিলেন। সমসময়ের 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার এপ্রিল ২৪, ১৮৭৪ তারিখের সংখ্যায় এর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ডিসেম্বর ২৩, ১৮৮২ তারিখেও কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এই 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানেও বহুসংখ্যক বাঙলা গ্রন্থকার, সম্পাদক সহ অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।[১৩]

হরিনাথের প্রয়াস-প্রচেষ্টায় যে সব সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্থায়িত্ব কতদিন ছিল নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। খোদ পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকের সময়সীমায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-সমিতিগুলির আয়ু গড়ে, সরকারি তথ্যানুযায়ী, ছিল বছর পাঁচেক।[১৪] এ তথ্যে অতিশয়োক্তি না থাকার সম্ভাবনা। কেননা গ্রামবার্তার ১২৭৯ বঙ্গাব্দের এক মুদ্রিত তথ্যে জানা যায় যে হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত 'কুমারখালি সভা'র ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন তারিখে। এই সভা ছিল মূলতঃ সামাজিক সমস্যা নিবারনী সভা। এ দিনের এই সভায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য 'কৃষক প্রভৃতির সংখ্যা' ভদ্রলোকদের 'সংখ্যাপেক্ষা' বেশি হয়েছিল।[১৫] এই সভার ষষ্ঠ অধিবেশন যদি ১২৭৯ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি অনুষ্ঠিত হয়, তবে অনুমিত হয় এই সভার প্রতিষ্ঠা কাল ১২৭৪ বঙ্গাব্দ নাগাদ। এই 'কুমারখালি সভা' সম্ভবত এরপর লুপ্ত হয়েছিল। কেননা গ্রামবার্তার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে প্রকাশিত এক পত্রপাঠে জানা যায়, 'কুমারখালি সভা' নামক আর একটি সভা ১২৮৩ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝির কিছু আগে স্থাপিত হয়েছিল। একই নামের দুটি সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ এই বিশ্বাসে উপনীত করে যে কুমারখালি সভা একসময় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে ঐ নামেই একটি নতুন সভা স্থাপন অথবা পুরানো সভাটির নবপর্যায়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। গ্রামবার্তায় এই সংক্রান্ত প্রকাশিত চিঠিটি উদ্ধার করছি :

প্রায় ৬ মাস অতীত হইল, অত্রস্থ যুবাদিগের প্রযত্নে এখানে 'কুমারখালী সভা' নাম্নী একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং এখন পর্যন্তও উক্ত সভার কার্য্য সুচারুভাবে চলিতেছে। উক্ত সভার উদ্দেশ্য 'ভাল হও ভাল কর'। এই সভার নামে যে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কারণ ইতিপূর্বে এখানে অনেক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু একটিও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।....যে সৎ উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংসাধিত হইলে যে আমাদিগের দেশের মহোপকার সাধিত হইবে তাহার কোন সংশয় নাই। আমি প্রায় প্রতিসভাতেই উপস্থিত হইয়া দেখিতেছি, সভ্যগণ 'ভাল হও ভাল কর' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং ইহাও দেখিয়াছি ও বলিতে পারি যে এই সভা স্থাপনাবধি এই সময়ের মধ্যে অত্রস্থ অনেক যুবকের মনের ভাব কতকাংশ উচ্চ পথাভিমুখ হইয়াছে....[১৬]

এই চিঠির নিচে পত্রকার হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল—'প্রণত ভ্রাতা। শ্রীজ—।'

এই চিঠির লেখক 'শ্রী জ—' এর আড়ালে জলধর সেন বলেই অনুমিত হয়। এই পত্রপাঠে কতকগুলি বিষয় ধরা পড়ে— (১) এই 'কুমারখালী সভা' পত্রটি লেখার অর্থাৎ ১৭ চৈত্র ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (চিঠিটি লেখার মাত্র দুই দিনের মাথায় গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হয়) তারিখের মাস ছয়েক আগে প্রতিষ্ঠিত হয় (২) এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন কুমারখালির যুবকেরা (৩) এই সভার উদ্দেশ্য ছিল 'ভাল হও ভাল কর' অর্থাৎ স্বয়ং হরিনাথের ঘোষিত আদর্শই এর ভিত্তি (৪) এর আগে কুমারখালিতে যেসব সভা স্থাপিত হয়েছিল তার কোনটিই 'অধিক কাল' স্থায়িত্বলাভ করেনি (৫) যে সৎ উদ্দেশ্যে এই সভা স্থাপিত হয়েছে (অর্থাৎ 'ভাল হও ভাল কর' আদর্শ পালনার্থে) তা সম্পাদনের জন্য এর সভ্যগণ 'বিশেষ চেষ্টা' করেছিলেন এবং (৬) এই সভাস্থাপনের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে এলাকার যুবকদের মনের ভাব 'কতকাংশ উচ্চ পথাভিমুখ' হয়েছিল।

এই চিঠিটির নির্গলিতার্থে প্রকাশ পায় সমকালে কুমারখালিতে হরিনাথের আদর্শনিষ্ঠা স্থানীয় যুবকদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল। হরিনাথের একটি কবিতার পংক্তি-আশ্রয়িতায় একটি উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছিল—এ ঘঠনা হরিনাথের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

তাছাড়া সমসময়ে 'কুমারখালি গীতাভিনয় সভা' নামে একটি সভার কথাও জানা যায়। হরিনাথ এই সভার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই সভা হরিনাথের 'অক্রূর সংবাদ' প্রকাশ করেছিল।[১৭] 'অক্রূর সংবাদ' প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এর প্রকাশক ছিলেন কুমারখালির 'বাজারস্থ গীতাভিনয় সভা'র অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার পাল। এই গীতাভিনয় সভার অনুরোধক্রমে হরিনাথ কয়েকখানি গীতাভিনয় রচনা

এ তথ্য জানা জায় প্রসন্নকুমারের 'অক্রূর সংবাদ'-এর 'বিজ্ঞাপন' পাঠে।[১৮] এই 'গীতাভিনয় সভা'র অধ্যক্ষের বক্তব্যের সূত্রে বোঝাই যায় হরিনাথ এই সভার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

কুমারখালিতে 'দরিদ্রবান্ধব পুস্তকালয়' শীর্ষক একটি পাঠাগারের কথাও জানা যায়। 'পুস্তকালয়' নাম হওয়া সত্ত্বেও একে পুস্তক বিক্রয়ের দোকানের পরিবর্তে কেন পাঠাগার বলতে চাইছি, যে বিষয়ে গ্রামবার্তায় প্রকাশিত একটি চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরো চিঠিটিই উদ্ধার করছি :

মান্যবর শ্রীযুক্ত গ্রামবার্ত্তা
সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

আমাদিগের দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়ের নিমিত্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার এবং অন্যান্য গ্রন্থকার প্রণীত যে কয়েকখানা পুস্তক প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অতিশয় উপকৃত হইয়াছি এবং তজ্জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্বলিত এই লিপিখানি, আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া এই কৃতজ্ঞতামূলক পত্রখানি আপনার বিখ্যাত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

অন্যান্য দেশহিতৈষী এবং গ্রন্থকার মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা, তাঁহারা দয়া করিয়া অর্থ কিম্বা পুস্তক দ্বারা সাহায্য করিলে পরম উপকৃত হইব।

কুমারখালী — অধ্যক্ষগণ[১৯]
দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়
তারিখ ১৪ বৈশাখ
১২৭৯ সাল

এই চিঠিটির নিহিত অর্থ এবং পুস্তক ও টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করার আবেদন আর যাই হোক কোন বিক্রয়কেন্দ্রের নয় বলেই প্রতীতি জন্মে। পাঠাগারের সাহায্যকল্পেই এই অর্থ ও পুস্তক প্রদানের আবেদন গ্রাহ্যযুক্তি-তে চলে আসে। কেউ কেউ এই 'দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়' হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত বলে থাকেন। তবে চিঠিটির বয়ানে সেরকম কোন আভাষ মেলে না। তবে হরিনাথ যে এই পুস্তকালয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন তা তাঁর নিজের এবং অন্যদের বই প্রদানের তথ্যেই ধরা পড়ে।

লেখালেখির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে হরিনাথ যাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন, দেখা গেছে তাঁরা হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যেমন নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন, হরিনাথের অনুপ্রেরণায় সভা-সমিতি গড়ে তুলেছেন, তেমনি তাঁরাই আবার হরিনাথের গ্রামবার্তার

সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, গ্রামবার্তার পরিচালনকর্মে এবং সাংবাদিকতা সহ অন্যান্য রচনাকর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন এমনকি হরিনাথের ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীতের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, গান রচনা করেছেন এবং গানের ডালি নিয়ে হরিনাথের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন। গ্রামবার্তার প্রেসের কর্মীরাও হরিনাথের গানের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই বাউল গানের সূত্রে লালন ফকিরের সঙ্গে হরিনাথের সখ্য-সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল। লালনের আখড়ায় হরিনাথের এবং হরিনাথের বাড়িতে লালনের যাতায়াত অবাধ ছিল। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গে, হরিনাথের গানের আখড়ায়, লালনের পরিচয় হয়। এর পরবর্তীতে দেখা গেছে শিবচন্দ্রের বাড়িতে লালন ফকির গান গেয়ে শুনিয়েছেন।[২০]

হরিনাথের বিনয়ীভাব, অন্যকে সহজেই আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।[২১] হরিনাথের 'সঙ্গলাভ' করে, তাঁর কুটিরে যে শান্তি পাওয়া যেত, তা অনেক ধনীর প্রাসাদেও দুর্লভ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন চন্দ্রশেখর কর।[২২] দীনেন্দ্রকুমার রায় স্বীকার করেছেন যে 'বেণুর বিমুগ্ধ মৃগ শিশুর ন্যায় কাঙালের আহ্বানে'[২৩] আকৃষ্ট হয়ে কিশোর বয়সে বহুবারই তিনি হরিনাথের কাছে ছুটে গিয়েছেন। জলধর সেন বিনম্রচিত্তে বলেছেন :

> মধ্যে মধ্যে অবসরকালে যে সামান্য সাহিত্য সেবা করি, হরিনাথ তাহার আদিগুরু, তিনি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছেন, শেষজীবনেও লেখা সম্বন্ধে তিনি নানা প্রকার উপদেশ দিতেন।[২৪]

মীর মশাররফ হোসেনকে লেখা সম্পর্কে উপদেশ দিতেন হরিনাথ।[২৫] মশাররফ নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনি একই সঙ্গে সংবাদ প্রভাকর এবং গ্রামবার্তার সংবাদ লিখতেন। প্রভাকর-এর সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা কাটছাঁট করে প্রভাকরে প্রকাশ করতেন। অন্যদিকে—

> কুমারখালী, আমার বাটী হইতে নিকটে। গ্রামবার্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম, সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম, প্রভাকরেও লিখিতাম। ....হরিনাথবাবু কবতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন। এক এক দিন বহুদূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন।[২৬]

কুমারখালিতে হরিনাথের সাহিত্য-সংগঠকের সার্থক ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে কাঙাল-শিষ্য লিখেছেন : বাঙলা সাহিত্যে হরিনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। এ বক্তব্যের সপক্ষে তিনি বলেছেন। :

> স্থূলদর্শী পল্লবগ্রাহীরা বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের বিশেষত্ব দেখিতে পান না; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, হরিনাথ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন রাজা

রামমোহন রায় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুসরণে কোদালী ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া বহু পরিশ্রমে যে প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন— আজ তাঁহারা নির্বিঘ্নে যেই পথে চলিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার কোদালীর সমালোচনা করিতেছেন! বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট যদি আমাদের মাতৃভাষা ঋণী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার— হরিনাথের ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।[২৭]

হরিনাথ সম্পর্কে এ বক্তব্য যথার্থ। হরিনাথ প্রকৃত অর্থে ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, কলকাতা শহর থেকে দূরে গ্রাম-মফস্বলে 'এত বড় জাগ্রত চিত্ত'[২৮] সে সময় আর দ্বিতীয় ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের পথানুসরণে দূর গ্রাম-মফস্বলে সাহিত্য-সংগীতের তথা সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও বিকাশে যে আত্যন্তিক ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা কৃতিত্বের দিক দিয়ে গুরুর চেয়ে কিছু কম ছিল না। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র লেখকগোষ্ঠী ছিল। তবে সেখানে ব্রাহ্মধর্মানুসারিতার প্রভাব ও প্রচারণা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো লেখক তৈরির পথকে সুগম করেনি। 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকগোষ্ঠীও ছিল। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নবহিন্দুবাদের মন-মনস্কতার আধিপত্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল (সার্বিক সাফল্যলাভ সবসময় না-হওয়া সত্ত্বেও)। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকারও লেখকগোষ্ঠী ছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের পত্রিকাকেন্দ্রিক লেখকগোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই সাহিত্যসংসারে প্রতিষ্ঠিত। নবীন, আনকোরা সম্ভাবনায় প্রতিভার লালন-প্রক্রিয়ায় যে দান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও হরিনাথ মজুমদারের ছিল তা কার্যত এখানে ছিল দুর্নিরীক্ষ্য। তাছাড়া একদিকে প্রজাপীড়ন ও গোবিন্দদাসের মতো কবির বিরুদ্ধে প্রপীড়ন ও প্রাণনাশের ধারাবাহিক চক্রান্তের চক্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর প্রজাস্বার্থবিরোধী চরিত্র আড়াল করার লক্ষ্যে সাহিত্যসংসারে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুচতুর প্রয়াস পেয়েছিলেন সর্বতোভাবেই।[২৯] এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথও কালীপ্রসন্নকে আনুকূল্যদানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রজাপীড়ক বিশেষত কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিজাতীয় বিদ্বিষ্ট মনোভাবের বিষয়টিকে প্রশ্নাকুল করেননি। কালীপ্রসন্নের চরিত্রের এই দ্বিবিধতা[৩০] সাহিত্য-আলোচনার মূলস্রোতে তাঁর প্রাপ্ত ও প্রাপ্য সম্মানক্ষেত্রে কোন দাগ কাটতে পারেনি।

প্রভাকর-সম্পাদক কবি-সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য-সংগঠকের ভূমিকা তাঁর সাহিত্য-শিষ্য হরিনাথকে যথেষ্ট ও আন্তরিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। নাগরিক সভ্যতার অন্তস্থলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য-সংগঠকের দায়িত্ব পালন আর শহরের আলোকসীমার বাইরে গ্রাম-মফস্বলে দাঁড়িয়ে সাহিত্য-সংগঠকের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন যে এক কথা নয়, এ বিষয়টি হরিনাথের অজানা ছিল না। তবু এই কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে তিনি পরাঙ্মুখ হননি। গুরুর পথানুসরণে শেষ পর্যন্ত প্রক্রিয়াগতভাবে

তিনি আরও উতরে গেছেন বলেই মনে হয়। এই বাস্তব প্রয়াসের প্রেক্ষাপটে হরিনাথ শিক্ষাদান-'রচনোৎসাহোৎসুক'করণ-গ্রামবার্তাপরিচালনা-বাউল দল গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিরলসভাবে সম্পাদন করেছেন। চিন্তাক্ষেত্রে অনাধুনিক সাবেকিআনার পরিপোষণা সত্ত্বেও হরিনাথ সুস্থ সংস্কৃতিবোধ, নীতিনিষ্ঠা, সত্যসন্ধিৎসার লক্ষ্যে আপসহীন প্রয়াস পেয়েছেন।

বিভিন্ন রচনাদির ব্যাপারে উৎসাহ ও আনুকূল্যদান ছাড়াও নবীন লেখকদের সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের 'বিজ্ঞাপন' ও সমালোচনা গ্রামবার্তায় প্রকাশ করে হরিনাথ তাঁদের নাম ও গ্রন্থের প্রচারের ব্যাপারেও যত্নশীল হয়েছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী'-র বিজ্ঞাপনের উদাহরণটিই দেওয়া যায় :

বিজ্ঞাপন

নূতন পুস্তক—**রত্নবতী।**

গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কুমারখালী গ্রামবার্ত্তার কার্য্যালয়,
গোয়াড়ি শ্রীযুক্তবাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
পুস্তকালয়, কলিকাতা প্রভাকর গ্রন্থালয়, সংস্কৃত পুস্তকালয়
ও নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উক্ত পুস্তকখানি তত্ত্ব করিলে
পাইবেন। মূল্য ছয় আনা

শ্রী মীরমশাররফ হোসেন
লাহিনীপাড়া।[৩১]

এই 'রত্নবতী'র সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল গ্রামবার্তার 'পুস্তক প্রাপ্তি' শীর্ষক কলমে। এই সমালোচনায় বলা হয়েছিল :

> আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি 'রত্নবতী' নামে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তকখানি কুষ্টিয়ার অন্তঃপাতি লাহিনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন প্রণয়ন করিয়াছেন।
>
> ....মুসলমান দিগের রচিত এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বোধহয়, পূর্ব্বে আর কাহারও মস্তক হইতে বহির্গত হয় নাই। এই রত্নবতীই প্রথম।....[৩২]

গ্রামবার্তায় কবিতা বা বিভিন্ন লেখাপত্তর আসলে হরিনাথ সে সম্বন্ধে মতামত সহ লেখকদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় পত্রিকার কাজকর্ম 'বন্ধুবান্ধবদিগের সহায়তায়' নির্বাহ হচ্ছিল। এমতাবস্থায় দপ্তরে আসা অনেক লেখার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। নতুন লেখকদের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল হরিনাথ গ্রামবার্তায় 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখেছিলেন :

> আমাদিগের পদ্যরচয়িতা বন্ধুগণও অনুগ্রহপ্রকাশে অপেক্ষা করিবেন, মস্তক কিঞ্চিৎ স্থির হইলেই তাঁহাদিগের লিখিত বিষয়গুলি ক্রমে দেখিয়া প্রকাশ করিব।[৩৩]

অন্যদিকে পাঠকদের তরফ থেকে চিঠিপত্র এলেই হরিনাথ নির্বিচারে সেসব চিঠি গ্রামবার্তায় প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন। ছাপার যোগ্য বলে যেসব চিঠি তিনি বিবেচনা করতেন, সেগুলোই কেবল গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হত। তবে যে চিঠি ছাপার যোগ্য নয়, সে চিঠি কেন ছাপা হবে না তার কারণ তিনি পত্রকারকে অবহিত করতেন। এজন্য তিনি 'পত্রপ্রেরকের প্রতি' কলম প্রবর্তন করেছিলেন। এরকম একটি চিঠি গ্রামবার্তায় না-ছাপার কারণ সম্পর্কে পত্রকারের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন :

> ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পত্র পরিত্যক্ত হইল। তিনি যে কালীসাধন লিখিয়াছেন তাহাতে পল্লীগ্রামীয় ও অসংস্কৃত লোকদিগেরই বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ ভাল চিকিৎসক দ্বারা রোগের চিকিৎসা করেন আয়ু থাকিলে বাঁচিবে। কালীসাধন বা বারের ধূলি বিশ্বাসে কি রোগ ছাড়ে?[৩৪]

হরিনাথের এই কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীভূত হয়ে সাহিত্য পাঠশালার শিক্ষক হিসেবে সাহিত্যশিষ্যদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা এক অসামান্য অবদান বলে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য।

### তথ্যপঞ্জি


১। বিশ্বনাথ মজুমদার : পল্লীপ্রাণ মহাত্মা কাঙাল হরিনাথের ৭৪ তম সাম্বৎসরিক স্মৃতি মহোৎসব। কাঙাল উৎসব স্মরণ পুস্তিকা।

২। বিশ্বনাথ মজুমদার : প্রাগুক্ত। পৃ. ১

৩। প্রাগুক্ত

৪। চন্দ্রশেখর কর : কাঙাল হরিনাথের সম্বন্ধে আমার স্মৃতি। মানসী, আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৪০৯

৫। ম. মনিরউজ্জামান : কাঙাল হরিনাথের মানসচেতনা। কাঙাল হরিনাথের ১৬১তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা। ১৪০১ বঙ্গাব্দ। কুমারখালি। বাঙলাদেশ।

৬। ম. মনিরউজ্জামান · প্রাগুক্ত

৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : বঙ্গভাষার লেখক। প্রথম ভাগ। কলকাতা। ১৩১১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৭৪৪

৮। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : কাঙাল হরিনাথ। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২৪

৯। হারাধন দত্ত : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। অধ্যয়ন। কলকাতা। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৬-৭

১০। জলধর সেন : আত্মজীবনী ও স্মৃতিতর্পণ (সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ)। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। ১৯৯১ সংস্করণ। পৃ. ১৫০

১১। জলধর সেন : প্রাগুক্ত। পৃ. ৫

১২। রবীন্দ্রনাথ : জীবনস্মৃতি। গ্রন্থপরিচয়। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ পৃ. ২০৭

১৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০৭-৯

১৪। মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে পূর্ববাংলায় সভা সমিতি। ডানা প্রকাশনী। ঢাকা। বাংলাদেশ। ১৯৮৪ সংস্করণ। পৃ. ১৪

১৫। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, চৈত্র, দ্বিতীয় পক্ষ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (মার্চ ১৮৭৩)। পৃ. ১

১৬। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ১৯ চৈত্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ (মার্চ ৩১, ১৮৭৭)। পৃ. ৩৮৩

১৭। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, শ্রাবণ, দ্বিতীয় সপ্তাহ ১২৮০ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৮৭৩)। পৃ. ১

১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরিনাথ মজুমদার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (প্রথম) সংস্করণ। পৃ. ৩০

১৯। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, বৈশাখ, তৃতীয় সপ্তাহ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (মে, ১৮৭২)

২০। বসন্তকুমার পাল : তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। ত্রিবৃত্ত প্রকাশনী। কুচবিহার। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৪৮-৪৯

# হরিনাথের দৃষ্টিতে বাঙলার বিদ্বৎসমাজ

উনিশ শতকি বাঙলার প্রথিতযশা বিদ্বৎজনদের সম্পর্কে হরিনাথ যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। নিজে প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী ও স্বশিক্ষিত গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-সংগঠক, নিপীড়িত কৃষক-প্রজার অকৃত্রিম সুহৃদ এবং বাউল গানের রচয়িতা হয়ে নিজের কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রভূমি হিসেবে গ্রাম-মফস্বলের জল-মাটি-হাওয়াকেই বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে কিশোর বয়সে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে একবার গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর থেকে হরিনাথ আর কলকাতামুখী হতে চাননি। বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুস্থানীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে কলকাতায় গিয়েছিলেন গান গাইতে। গ্রামবার্তা যে দশবছর কলকাতায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রেসে ছাপা হয়েছিল, সেসময়ে কার্যোপলক্ষে কলকাতা যাওয়া ছাড়া হরিনাথ শহর কলকাতার সমকালীন সংস্কৃতি তথা কালচারের সঙ্গে যোগসূত্র রচনার চেষ্টায় চেষ্টিত হননি। ১২৮০ বঙ্গাব্দে কুমারখালিতে প্রেস স্থাপন ও সেখান থেকে গ্রামবার্তা প্রকাশের কাজ শুরু হওয়ায় হরিনাথের সঙ্গে কলকাতা শহরের প্রত্যক্ষ সংযোগের সম্ভাবনা খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বিভিন্ন বিদ্বৎজন, তাঁদের সাহিত্যকর্ম ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি আদৌ অনাগ্রাহী ছিলেন না। বরং সে বিষয়ে তিনি যথাসম্ভব খোঁজখবর রাখতেন। তাছাড়া গ্রামবার্তার দৌলতে সমসময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামবার্তার পাতায় সেইসব পত্রপত্রিকা থেকে আহরিত হয়ে বিশেষ বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হতো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও তার সংবাদাদি সম্পর্কে মন্তব্যও তিনি গ্রামবার্তায় প্রকাশ করতেন। গ্রামবার্তা সম্পর্কে খবরাখবর সমসময়ের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাবলী, নির্দিষ্ট সীমাক্ষেত্রের বাইরেও, তিনি গ্রামবার্তায় প্রকাশ করতেন।[১]

রামমোহন রায়ের প্রতি হরিনাথ যথেষ্টরকম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হরিনাথের এই শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিম্নলিখিত বক্তব্যের ভিতর :

> ....রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র-মহাসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ৩য় উল্লাসে লিখিত ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত তন্ত্রানুসারে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে সময়োচিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া হিন্দুকুলের গৌরব এবং ঋষি প্রণীত হিন্দুশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বিধর্ম্মগ্রহণের স্রোতঃ ক্রমে মান্দ্য

হইয়া আসিল। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা ছিল, জ্ঞানাস্ত্রে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মদুর্গ যেমন অব্যাহত করিলেন, তদ্রূপ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের শিক্ষাদান ও ঋষি প্রণীত ধর্ম্মসাধন সময়োচিত করিয়া পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবেন।....হিন্দুগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাত্মা রামমোহন রায় অকালে দেহত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ অবস্থাতেই রহিয়া গেল।[২]

হরিনাথ এখানে রামমোহনকে হিন্দুধর্মোৎসারিত চিন্তানুবর্তিতায় ব্রাহ্মধর্মের 'সময়োচিত' প্রচারক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে রামমোহনের এই ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে 'হিন্দুধর্মদুর্গ' অব্যাহত অর্থাৎ অক্ষত থেকেছিল। অথচ রামোহনের সমসাময়িক ও রামমোহনোত্তর কালে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা'র রক্ষণশীল হিন্দু-নেতৃত্ব রামমোহনের বিরুদ্ধতায় অনড় ছিলেন। অব্রাহ্ম এবং হিন্দুচেতনাশ্রয়িতার চিন্তাচর্চা থেকে হরিনাথ যা বলতে চেয়েছেন তা রক্ষণশীল হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী।

প্রজাপীড়ক জমিদার হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতায় হরিনাথ নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও, প্রজাকল্যাণকারী ভূমিকা দেবেন্দ্রনাথ যখনই নিয়েছেন, হরিনাথ তখনই খোলামনে দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন। দ্বারকানাথ বা দেবেন্দ্র-পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রজাস্বার্থরক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের কারণে হরিনাথ সমালোচনামুখর হয়েছিলেন নীতিগত অবস্থান থেকে। এজন্য তিনি কখনও বিদ্বেষভাব পোষণ করেননি। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন : দেবেন্দ্রনাথ যতদিন 'মহর্ষি' নামে আখ্যাত হননি, ততদিন তাঁর জমিদারির প্রজারা তাদের দুঃখদুর্দশার কথা তাঁকে নিবেদন করে কিছু-না-কিছু ফললাভে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু 'মহর্ষি' হওয়ার পরবর্তীকালে 'প্রজার হাহাকার তাঁদের কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই'।[৩] এতদসত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের গুণপনার স্বীকৃতি দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। দেবেন্দ্রনাথকে 'শ্রদ্ধাস্পদ' বলে উল্লেখ করে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে 'তিনি এদেশের অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক'।[৪] আবার কুমারখালিতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনা হয়েছিল, তার জন্য বিরাহিমপুর পরগনার জমিদার 'শ্রদ্ধাস্পদ' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দশ টাকা 'মাসিক চাঁদা' দিয়েছিলেন—এ তথ্য হরিনাথই পরিবেশন করেছেন। শুধু তাই নয়, এই চিকিৎসালয়ের 'গৃহপ্রস্তুতের নিমিত্ত' দেবেন্দ্রনাথ যে দু'শ (২০০) টাকা 'দান' করেছিলেন—এ তথ্যও হরিনাথের লেখা থেকেই জানা যায়। দেবেন্দ্রনাথের এই মহানুভবতার জন্য হরিনাথ তাঁকে গ্রামবার্তার মাধ্যমে 'ধন্যবাদ প্রদান' করেছিলেন।[৫] আবার এর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের সময় অন্যান্য জমিদারেরা প্রজাস্বার্থে কিছু কিছু প্রশংসনীয় ভূমিকা নিলেও কুমারখালির প্রজারা 'ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঋষিবর শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমীদারিতে বাস করিয়া' সে ধরনের কোন সুবিধা যে পাননি[৬]—একথা হরিনাথ তথ্য ও সত্যের খাতিরে প্রকাশ করেছিলেন।

হরিনাথের মান্যতাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। হরিনাথ অক্ষয়কুমার দত্তের রচনার ভক্ত পাঠক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন'[৭] হরিনাথের প্রজাপ্রীতিতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল এবং গ্রামবার্তায় প্রজাদের দুর্দশার নির্মম চিত্র অঙ্কনে সাহসী ভূমিকা নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তত্ত্ববোধিনীতে হরিনাথের কাছে অন্যতম আকর্ষণ ছিল অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ। হরিনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে 'প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা'[৮] বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই হরিনাথ মথুরানাথ মৈত্রেয়র পুত্রের নামকরণ অক্ষয়কুমার রেখেছিলেন[৯] যাতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার দত্তের মতই বাঙলা সাহিত্যে উন্নতি করতে পারেন।

'বঙ্গভাষা কিরূপে এরূপ হইল?' শীর্ষক এক রচনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য-কে হরিনাথ 'কাব্যশ্রেষ্ঠ'[১০] বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে হরিনাথের গ্রামবার্তায় লেখা হয়েছিল :

> (আমরা) ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত গত ১৬ই আষাঢ় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দত্তজ একজন সুকবি ছিলেন। বঙ্গদেশ একটি রত্ন হারাইলেন এবং বাঙ্গলাভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। মৃণালে কণ্টকসদৃশ তাঁহাতে অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি দোষ ছিল কিন্তু সরলতা, পরোপকারিতা, অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শ্বেতপদ্মের ন্যায় লোকের মন মোহিত করিয়াছে। তৎসমুদায়ের সৌরভ কখন বিলুপ্ত হইবে না। ইঁহার এগার ও সাত বৎসর বয়স্ক দুটি পুত্র এবং এক কন্যা অনাথ হইলেন। বঙ্গবাসীরা তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন, এই প্রার্থনা।[১১]

মাইকেল মধুসূদনের সম্পর্কে এই বক্তব্যগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় পরিস্কারভাবে পরিস্ফুট হয় যা কিনা মধুসূদন সম্পর্কে হরিনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়—(১) মধুসূদন 'একজন সুকবি' ছিলেন, (২) মধুসূদনের মৃত্যুতে দেশ একটি 'রত্ন' হারিয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুতে বাঙলাভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, (৩) কিন্তু 'মৃণালে কণ্টক সদৃশ' মধুসূদনের 'অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি দোষ' ছিল, (৪) এতদ্‌সত্ত্বেও বহু সদ্‌গুণের জন্য তিনি এদেশীয় মানুষের মন জয় করেছিলেন।—বাঙলাদেশের 'রত্ন' স্বরূপ 'সুকবি' মধুসূদন সম্পর্কে হরিনাথের মনোভঙ্গি এরপর আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাসূচক বক্তব্য প্রকাশেই হরিনাথ তাঁর কাজ শেষ করেননি। তিনি গ্রামবার্তার মাধ্যমে 'কবিবর মধুসূদন দত্তের' অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়ের 'বিদ্যাশিক্ষা ও ভরণপোষণের' জন্য সাহায্যদানের আবেদন জানিয়েছিলেন।[১২] গ্রামবার্তার এই আবেদন যে সমসময়ে উৎসাহবর্দ্ধক ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামবার্তায় প্রকাশের জন্য প্রয়াত কবি মধুসূদনের 'সন্তানগণের লালন

পালন ও শিক্ষার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ'-এর লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঘটনায়। বিজ্ঞাপনটি দিয়েছিলেন কলকাতার ৩ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিটের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিনাথও যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে গ্রামবার্তার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের সূচনাতেই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেছিলেন। এই বিজ্ঞাপনটি পেয়ে হরিনাথ প্রকাশের ভূমিকাস্বরূপ লিখেছিলেন : 'আমরা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাদরে গ্রহণ করিয়া এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।'[১৩] এই চাঁদা যাঁদের ঠিকানায় পাঠাবার আবেদন জানানো হয়েছিল তাঁরা হলেন (১) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (২) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, (৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (৪) গৌরদাস বসাক, (৫) মনোমোহন ঘোষ, (৬) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৭) শিশিরকুমার ঘোষ, (৮) কৃষ্ণদাস পাল এবং (৯) উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে সংবাদাদি হরিনাথ সমসময়ের গ্রামবার্তায় প্রকাশ করেছিলেন। নদীয়া ডিভিসনের ইনসপেক্টিং পোস্টমাস্টার-এর পদ থেকে 'স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে' দীনবন্ধু অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। গ্রামবার্তায় এ খবর প্রকাশ করে হরিনাথ দীনবন্ধু মিত্রের এই পদোন্নতিকে 'উপযুক্ত লোকের' যথাযথ প্রাপ্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।[১৪] দীনবন্ধু মিত্র প্রয়াত হন ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৭ কার্তিক। মধুসূদনের মতো দীনবন্ধুর মৃত্যুতেও হরিনাথ গ্রামবার্তায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। হরিনাথ দীনবন্ধু সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা দীনবন্ধু সম্পর্কে হরিনাথের মনোভঙ্গি বুঝতে বিশেষ উপযোগী। হরিনাথ লিখেছেন :

> ইনি (দীনবন্ধু মিত্র) দীর্ঘকাল পৃষ্ঠাঘাতরোগে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মধ্যে একবার আরোগ্যলাভ করেন....পরিশেষে কাল সময় বুঝিয়া তাঁহার বহুমূল্যবান পরমায়ুটি হরণ করিয়াছে।
>
> দীনবন্ধু বাবু....বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, সম্পদ, সর্ব্ববিষয়েই....বঙ্গবাসীগণের নিকট পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনবৃত্ত অবগত নহি....
>
> ....নীলদর্পণের মনোহর চাকচিক্য, নবীন তপস্বিনীর সুমধুর পবিত্রপ্রেমভাব, লীলাবতীর লালিত্ব, সধবার একাদশীর আশ্চর্য হাস্যোদ্দীপক সুন্দর ভাবের ন্যায় নব ভাবে বঙ্গ রঙ্গভূমি আর সাজিবে না। বীণাপানির কাব্যোদ্যানস্থিত পবিত্র আসনগুলি শূন্য হইতে লাগিল। মাইকেলের দারুণ শোক বিস্মৃত হইতে না হইতেই হা মাতঃ বঙ্গভূমি! আবার তোমাকে বিষম শোকতাপ পাইতে হইল। দীনবাবুর আত্মা স্বর্গধামের বিমল আনন্দ উপভোগ করুন।[১৫]

নীলচাষিদের উপর নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতিবাদে 'হিন্দু পেট্রিঅট'-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় ভূমিকা হরিনাথকে বিমোহিত করেছিল। গ্রামবার্তা প্রকাশের আগে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাশাপাশি হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিঅট'-এও নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ক খবরাখবর

পাঠাতেন। ইংরেজি না জানায় হরিনাথ সেই সব সংবাদ বাংলায় লিখে পাঠাতেন। হরিশচন্দ্র সেইসব সংবাদ ইংরেজিতে তর্জমা করে পেট্রিঅটে প্রকাশ করতেন। পরবর্তীকালে গ্রামবার্তা প্রকাশের পর্যায়ে হরিনাথ নিজের পত্রিকাতেই প্রজার ওপর নীলকর-জমিদার-পুলিশের অত্যাচারের সংবাদাদি তথ্য সহ্ প্রকাশ করতেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্তীতে পেট্রিঅট যখন জমিদারদের স্বার্থসেবার পরকাষ্ঠা (বিশেষতঃ পাবনা-সিরাজগঞ্জ প্রজাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে) দেখিয়েছিল, তখন হরিশচন্দ্রের নীলবিদ্রোহ সময়কালীন ভূকিার এই বিপ্রতীপ অবস্থানে হরিনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি সেসময় সখেদে লিখেছিলেন : 'হা হরিশবাবু এই তোমার সেই পেট্রিয়ট?'

হরিশচন্দ্র সম্পর্কে হরিনাথের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে নিম্নলিখিত বক্তব্যের মধ্যে:

> নীলবিদ্রোহীর সময় হরিশবাবু নীলকরদিগের কূটযন্ত্র ছেদন করিয়া যে নির্ব্বোধ ও নিরীহ কৃষকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহাদিগের জন্য তিনি নিজের অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, কৃষকেরা যে কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং নিরুপদ্রব হইয়াছে, হরিশবাবু তাহার নিদান। এখন যে অনেক কৃষককে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে দেখি, এই সাহস হরিশবাবুই, তাহাদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।[১৬]

কবি মধুসূদনের প্রশংসা সত্ত্বেও হরিনাথ একজায়গায় তাঁর 'অমিতব্যয়িতা'-জনিত দোষের কথা উল্লেখ করেছিলেন। হরিনাথ যেমন অশ্লীলতার একান্তই বিরোধী ছিলেন, অনুরূপভাবে মদ্যপান তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, তা সেই মদ্যপ যত বড়ো ব্যক্তিত্বই হোন না কেন। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্য গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, তাঁর প্রিয় কবি ও প্রেরণাসঞ্চারকারী সাংবাদিক মধুসূদন ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মদ্যপানাসক্তিকে হরিনাথ নিন্দা না করে পারেননি। হরিনাথের মতে—

> মদ্যপান করিয়া উচ্ছিন্ন যায় নাই, এরূপ লোকই বিরল।...কত শত সুচারু শরীর রূপবান যুবা চিররুগ্ন হইয়াছেন, এবং অনেকে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র পরিবারদিগকে শোকাকুল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ....কি ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষীয় কোন দেশের ব্যক্তিরই পানাসক্ত হওয়া উচিত হয় না।[১৭]

মদ্যপান সংক্রান্ত এই বিরোধমূলক অবস্থান থেকে হরিনাথ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিন্দা করে তাঁদের মৃত্যুজনিত কারণে শোকগাথা রচনা করেছিলেন। 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত'-এর ১৮০ সংখ্যক গানে[১৮] হরিনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> হায় রে তোদের হাতে ধরি কাতরে করি রে মানা।
> তোমরা কেউ সুধা বলে হাতে তুলে, সুরা গরল পান কর না রে।
> (হাতে তুলে)

১।　মদ্য হয় কালভুজঙ্গ, ওরে যে করে তার সঙ্গ,
হায়রে তার ধনসাজ জীবন রহে না;
ঐ যে গরল পানে মলো প্রাণে, আর ত উঠে বসিল না রে।।
(সোনার হরিশ)

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে হরিনাথের শোকগাথা যে একান্তই আন্তরিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মদ হরিনাথের কাছে 'কালভুজঙ্গ' বলে বিবেচিত হতো। এই কালভুজঙ্গ-এর বিষপানে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রাণে মরতে হয়েছিল বলে হরিনাথ আক্ষেপ করেছেন। তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরও পানদোষ ছিল। এই গানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর নাম করে তিনি গেয়েছেন :

ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্গশশী, তারে খেল ঐ রাক্ষসী,
এর মত সর্ব্বনাশী কোথায় আর দেখি না।
খেলো কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর ভরিল না রে।।
(এ রাক্ষসীর)

অনুরূপভাবে পানদোষাক্রান্ত কবি মধুসূদন সম্পর্কেও শোক প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি গেয়েছেন :

কবিবর মধুসূদন, ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন,
করিলে সাধন এখন সে ধন আর মেলে না;
সে যে গরল খেলো ঢলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে।।
(সাধের মধুসূদন)

এরকম বঙ্গমাতার এক একজন কৃতি সন্তান মদ্যপানাসক্তির কারণে, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় সখেদে হরিনাথ কেঁদেছেন :

কাঙাল কয় মনের কথা, কাঁদে বঙ্গমাতা রাখ তাঁর কথা
ওরে ভাই
আপন মাথা আপনি খেয়ো না;
ওরে কাঁদিতে তার জনম গেল, মাকে আর ভাই কাঁদাও নারে
(তোদের পায়ে ধরি)

কবি ও সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র হরিনাথের গ্রামবার্তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সাহিত্যে অশ্লীলতাবিরোধিতার দরুন হরিনাথ ও হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে সখ্য নিবিড় হয়েছিল বলে মনে হয়। অব্রাহ্ম হরিনাথের কাছে ব্রাহ্ম-বিরোধী হরিশ্চন্দ্র মিত্রসুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন, সন্দেহ নেই। এই হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রয়াত হন ২০ চৈত্র ১২৭৮ বঙ্গাব্দ তারিখে সোমবার দুপুর ২টার সময়। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে, হরিনাথ লিখেছিলেন : 'হরিশবাবু কতকগুলি পুস্তক রচনা এবং কতিপয় সংবাদপত্রের সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালাভাষার সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছেন।' এই সূত্রেই হরিনাথ জানিয়েছেন

যে 'হরিশবাবু গ্রামবার্ত্তা সম্বন্ধেও আমাদিগকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।' এহেন হরিশ্চন্দ্রের 'স্মরণার্থ' কোন কীর্তিস্থাপন করা এবং সেই কাজে সাহায্য করা 'বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য' বলে তিনি মনে করতেন।[১৯]

হরিনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন না। ব্রাহ্মদের আচার-আচরণ-কাজকর্ম তিনি অনেক সময়েই অনুমোদন করতে পারেননি, তথাপি তিনি কোনরকম ব্রাহ্মবিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে হরিনাথের নিন্দা ও প্রশংসা একই সঙ্গে ভূমিকাভিন্নতায় ধ্বনিত হয়েছিল। হরিনাথের উদার মনের পরিচয় মেলে গ্রামবার্তার পাতায় ব্রাহ্মসভার সংবাদ প্রচারের মধ্যে। কুমারখালিতে 'ইষ্টকময় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির'[২০] প্রতিষ্ঠার সংবাদ তিনি নির্দ্বিধায় গ্রামবার্তায় প্রকাশ করেছিলেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ১৭ জ্যৈষ্ঠ এবং ৩০ আষাঢ় তারিখে যথাক্রমে শিলাইদহে ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান এবং কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব পালনের সংবাদ হরিনাথ তাঁর গ্রামবার্তায় প্রকাশ করেছিলেন।[২১] এরই সূত্রে দেখা যায় রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদও হরিনাথ তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। হরিনাথ-প্রদত্ত সংবাদে জানা যায় যে রমানাথ ঠাকুর প্রয়াত হন জুন ১০, ১৮৭৭ তারিখে, রবিবার, বেলা ১২টায়। গ্রামবার্তায় রমানাথ ঠাকুরের অবিচ্যুয়ারি লিখতে গিয়ে হরিনাথ রমানাথের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। রামমোহন ইংলণ্ডে যাওযার সময় রমানাথ যে 'ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রাস্টি ছিলেন'[২২] এ তথ্য হরিনাথের লেখায় পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ প্রসঙ্গে অবিচ্যুয়ারি লিখতে গিয়ে হরিনাথ কোনরকম সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ ঘটাননি।

আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারতসভা কলকাতায় স্থাপিত হলে হরিনাথ আহ্লাদিত হয়েছিলেন। এই সভার সভাপতি হয়েছিলেন শ্যামাচরণ সরকার। হরিনাথ এই সভাগঠনে উল্লসিত হয়েছিলেন কারণ আনন্দমোহন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ভদ্রলোক'-এর উদ্যোগে গঠিত এই সভার মাধ্যমে দেশের প্রজার স্বার্থ সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব* বলে তিনি মনে করতেন।[২৩]

প্রপীড়িত কৃষকদের মধ্যে থেকে, তাদের লড়াইয়ে নিজেকে সামিল করে নিজের জীবন বিপন্ন করেও যিনি কৃষকস্বার্থ নিয়ে ভাবিত ছিলেন, সেই হরিনাথ কোন কৃষক সংগঠনের কথা না ভেবে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদের নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা ভারতসভার মধ্যে প্রজার স্বার্থ সুরক্ষার সম্ভাবনা দেখে আশান্বিত হয়েছিলেন। খানিকটা বিসদৃশ মনে হলেও, এটাই বাস্তব তথ্য। সমসময়ের অনেক মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদের মতো হরিনাথও দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে (হরিনাথের মতে প্রজাস্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে) মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদের একটা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই ভারতসভা সেই সংগঠনের অনুপূরক হওয়ায় তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন। অবশ্য একই সঙ্গে অন্য অনেকের মতোই তিনিও এই সংগঠনে শারীরিকভাবে যুক্ত হননি। মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিচর্চার সীমায়িত ক্ষেত্রেই তিনিও তাঁর চিন্তাবিন্যাসকে আবদ্ধ রাখতে অধিকতর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

হিন্দু পেট্রিঅট, সোমপ্রকাশ-এর প্রচারের ফলে যে 'এ দেশীয় সংবাদপত্রের যুগান্তর উপস্থিত'[২৪] হয়েছিল একথা মুক্তকণ্ঠে গ্রামবার্তার পৃষ্ঠায় স্বীকার করা হয়েছিল। অন্যত্র আর একটি প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ, বান্ধব, বঙ্গদর্শন এবং আর্যদর্শন পত্রিকা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে কি ধরনের অবদান রেখেছে সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

> বঙ্গগৌরব-রবি সোমপ্রকাশ্ সভ্যজগতের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে অত্যুজ্জ্বল মনোবিমোহন সুবিমলকিরণ বিকীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে (পাঠকদিগকে) চিরযশস্বী করিতেছেন। বঙ্গদর্শন বঙ্গদর্শন উপলক্ষে গভীরতম সমুদ্রতল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ পরিদর্শন করিতেছেন, বান্ধব দেশে ২ নগরে ২ পল্লীতে এমনকি দ্বারে ২ গমন করিয়া অবিশ্রান্তভাবে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিতেছেন। আর্য্যদর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতির গুণগরিমা প্রকাশিত করিয়া লেখকদিগকে প্রকৃত আর্য্যসন্তান নামে আহূত হইবার অবসর প্রদান করিতেছেন....।[২৫]

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, সোমপ্রকাশ-বঙ্গদর্শন-বান্ধব-আর্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার উচ্চপ্রশংসা করা হলেও এই সব পত্রিকার সম্পাদকদের নাম এখানে অনুচ্চারিত থেকেছে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ বিদ্বৎজন ও লেখক-সম্পাদকদের নাম করেই তাঁদের কৃতিত্বের প্রতি হরিনাথ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু এখানে এই সব পত্রিকার কথা বলা হয়েছে তাদের সম্পাদকের নামোল্লেখ ছাড়াই।

হরিনাথ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মন্তব্য বা মতামত দিয়েছেন কিনা জানা জায় না। তবে গ্রামবার্তায় (মে, ১৮৮০) তিনি পরাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়....' কবিতা থেকে চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করে, রঙ্গলালের এই বক্তব্যকে 'বীরোপযোগী বাক্য' বলে অভিহিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন নামসূচক আলোচনা হরিনাথের রচনায় পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত হলে 'পথিক' নামে গ্রামবার্তার জনৈক পাঠক খুশি হয়ে গ্রামবার্তায় একটি পত্র-প্রতিবেদন পাঠান। চিঠিটি হরিনাথ গ্রামবার্তায় প্রকাশ করেন। তবে গ্রামবার্তায় প্রকাশিত চিঠিটির নিচে এক পাদটীকায় হরিনাথ লিখেছিলেন :

> দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামবার্ত্তা বঙ্গদর্শন পাঠ করিতে পায় না, অতএব পত্রপ্রেরকের মতামতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।[২৬]

পত্রকারের পত্র-প্রতিবেদনের নিচে পাদটীকায় প্রদত্ত এই সখেদ করুণ উচ্চারণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই পাদটীকা থেকে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর কোন সৌজন্য সংখ্যা গ্রামবার্তা সম্পাদক হরিনাথ মজুমদারকে পাঠাতেন না। হরিনাথ তাঁর স্বক্ষেত্রে স্বমহিমায় মহীয়ান হওয়া সত্ত্বেও

বঙ্কিমচন্দ্র হরিনাথকে বঙ্গদর্শন পাঠাতেন না—বোঝাই যায় এজন্য হরিনাথের মনে চাপা ক্ষোভ ছিল। এক্ষেত্রে তারই সংহত ও সংযত প্রকাশ ঘটেছে।

'পথিক' নাম্নী পত্রকারের পত্র-প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় আরও একটি পত্র-প্রতিবেদন গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হয়। এবারের পত্রকারের নাম ছিল 'শ্রীল'। এই চিঠি পূর্বের চিঠিটির পরিপ্রেক্ষিতেই পত্রকার পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিটিতে শ্রীল লিখেছিলেন :

> বঙ্গদর্শন প্রথম সাময়িক পত্রিকা, সে সময়ে অন্য কোন সাময়িক পত্রিকা না থাকা প্রযুক্ত সকলেরই আদরনীয় ছিল, কিন্তু সে অভাব শীঘ্রই জ্ঞানাঙ্কুর, বান্ধব প্রভৃতিতে দূর হইল, সুতরাং বঙ্গদর্শন পূর্ব্বের ন্যায় লেখা উত্তম থাকিলেও সমালোচনীর মধ্যে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, এই হেতু সাধারণের নিকট আর এত আদর রহিল না....।[২৭]

হরিনাথ এই পত্র-প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলেও, এ সম্পর্কে বা এর পাদটীকায় কোন মন্তব্য করেননি। বঙ্গদর্শন সম্পর্কে প্রশংসামুখর হলেও হরিনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি।* বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর যখন বৈষ্ণব সমাজে 'তুমুল আন্দোলন' সৃষ্টি হয়েছিল, সেইসময় হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের একটি সমালোচনা লিখে কাঙাল হরিনাথকে পড়তে দিয়ে মতামত জানতে চেয়েছিলেন। হরিনাথ সেই সমালোচনার ব্যাপারে শিবচন্দ্রকে উৎসাহ দেননি। তিনি বরং 'শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যের প্রকৃত রসাস্বাদ পরিবেশন' করে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের 'যোগ্য প্রত্যুত্তর' দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২৮] আর এই 'যোগ্য প্রত্যুত্তর'-এর প্রচেষ্টায় শিবচন্দ্র লিখেছিলেন তাঁর 'রাসলীলা' গ্রন্থটি।[২৯] হরিনাথ, দেখা যাচ্ছে, শিবচন্দ্রকে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা লেখায় পৃষ্ঠপোষকতা করেননি, তিনি শিবচন্দ্রকে এ ব্যাপারে নিবৃত্ত করে সৃজনমূলক সাহিত্যকর্ম দিয়েই বঙ্কিমী-দর্শনের প্রত্যুত্তর দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

---

* বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর লেখালেখি-চিঠিপত্রের কোথাও হরিনাথের নাম উল্লেখ করেননি। তাঁর বঙ্গদর্শন-ও যে তিনি সমসময়ের বিখ্যাত গ্রামবার্তার সম্পাদককে পাঠাতেন না, হরিনাথের খেদেই তার প্রমাণ। অথচ তাঁর বঙ্গেদেশের কৃষক-এর কথায় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২/৭৩-এ যেসব কথা বলছেন, প্রায় একই বিষয় নিয়ে সে সময় হরিনাথ তাঁর গ্রামবার্তায় লিখছেন। হরিনাথ সেসময় পাবনা-সিরাজগঞ্জের প্রজাবিদ্রোহের বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের ন্যায্যতা প্রমাণে তৎপর। জমিদার-প্রজার মধ্যেকার সমস্যা নিরসনে তিনি যে সূত্র হাজির করছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় একইরকম সমাধানসূত্রের কথা লিখছেন তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ। অথচ বঙ্কিম একবারও কোথাও হরিনাথ বা তাঁর গ্রামবার্তার নাম উল্লেখ করেননি। বুদ্ধিচর্চার জায়গা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কি হরিনাথের সরাসরি বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ঘটনায় আশঙ্কিত হয়েছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র প্রজার কল্যাণ চেয়েছিলেন কোনরকম বিদ্রোহ ব্যতিরেকে, আর হরিনাথ বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রজার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই কি দুজনের মধ্যে সম্পর্কগত দূরত্বের অনপনেয়তা তৈরি করেছিল?

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেও হরিনাথ বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অন্যতম নেতৃত্বকারী লেখক চন্দ্রনাথ বসুর প্রশংসা করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'ফুল ও ফল' গ্রন্থে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের বিপরীতে ভারতীয় অদৃষ্টবাদ-এর পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসুর এই মনোভঙ্গি হরিনাথের প্রশংসা অর্জন করেছে। চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,—'অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক(তায়?) মজিয়া তাহার অমূল্যনিধি অদৃষ্টকে ছাড়িয়া না দেয়।....ভারত যেন ইউরোপের ঠাট্টার ভয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না। অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে ভারতের দুরদৃষ্টি ঘটিবে....।' চন্দ্রনাথ বসুর এই বিজ্ঞান-বিরোধী অবস্থানকে হরিনাথ সমর্থন করে পাঠকদের 'ফুল ও ফল' গ্রন্থপাঠের পরামর্শ দিয়েছেন।[৩০]

বিদ্যাসাগরের ভাষানুশীলনের অনুসারিতায় 'বিজয়বসন্ত' লিখলেও, প্যারীচাঁদের আলালের আলালীভাষার প্রয়োগগত অনুশীলন প্রত্যক্ষ করার পরও বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি গ্রহণ করে 'বিজয়বসন্ত' রচনা করে সমসময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও হরিনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কোন কথা বলেননি বা লেখেননি। এটা বড়ো বিস্ময়ের কথা। তাঁর 'স্বরূপকথা'-র ভূমিকায় হরিনাথ দু'বার মাত্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করেছেন।[৩১] অথচ বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি পাঠ করেছেন বালক বয়সে। বিদ্যাসাগরের রচনার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেছেন। বিদ্যাসাগরের ভাষার অনুমোদক হিসেবে সেই ভাষার অনুশীলনে উপন্যাস লিখেছেন। এমনকি তাঁর 'স্বরূপকথা'-র গল্পকথাগুলিও বিদ্যাসাগরের অনুসরণ থেকে শুরু হয়েছিল প্রাথমিকভাবে।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি হরিনাথের সমর্থন ছিল—এ তথ্য পাওয়া যায় গ্রামবার্তায় এক পত্রকারের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক হরিনাথের একটি মন্তব্যে। গ্রামবার্তার 'প্রেরিত পত্র' কলমে জনৈক 'পল্লীগ্রামবাসী'-র একটি পত্র-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের পত্রকার লেখেন :

> ....বিধবাদিগের দুঃখ দেখিয়া যিনি দুঃখানুভব না করেন, তিনি যে পাষাণ হৃদয় ইহাতে সংশয় নাই। তাহারা যে অসহ্য দুঃখে দিনপাত করে, তাহা অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। যাঁহারা পুরদুঃখকাতর ও পরোপকারী, এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া তাঁহাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য।

এই পত্র-প্রতিবেদনটি হরিনাথ বিধবাবিবাহের প্রতি অনুমোদনের মানসিকতা থেকেই প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়। হরিনাথের শ্রদ্ধাভাজন কবি-সম্পাদক হরিশচন্দ্র মিত্র একটি পর্যায়ে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় লেখালেখি করেছিলেন। এই পত্র-প্রতিবেদনে পত্রকার সে বিষয়ের উল্লেখ করে লিখেছেন :

> হিন্দুরঞ্জিকে! তুমি আর ইহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিও না। কারণ ইহার বিরুদ্ধে লোকই অধিক, তাহাতে তুমি উৎসাহ দিলে আর উপায় নাই। ভাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি....তিনযুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিয়া কলিযুগে নিষিদ্ধ হইবার অর্থ কি?*

বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁর সপক্ষতা না থাকলে হরিনাথ তাঁর শ্রদ্ধাভাজন হরিশচন্দ্র মিত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রকারের এধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতেন না। তাছাড়া পত্রের শেষে তারকাচিহ্নিত (*) অংশের পাদটীকায় হরিনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ লিখেছিলেন :

> * ইহার অর্থ যাঁহারা বিধবাবিবাহের বিরোধী তাঁহারাই জানেন, নতুবা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না।[৩২]

হরিনাথের এই মন্তব্যটুকু তাঁর বিধবাবিবাহের সমর্থকতার দ্বিধাহীন নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হয়।

অথচ হরিনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কোন কথা লেখেননি বা বলেননি! বিপরীতদিক দিয়েও দেখা যায় বিদ্যাসাগরও হরিনাথ মজুমদার সম্পর্কে কখনও কোথাও কিছু লেখেননি বা বলেননি। হরিনাথের গ্রামবার্তা তার প্রকাশের প্রত্যূষকাল থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও সুহৃদ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রেসে ছাপা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র হরিনাথকে 'পুত্রবৎ স্নেহ' করতেন।[৩৩] গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্ক চিরদিন অক্ষুন্ন ছিল। স্বভাবতই হরিনাথ এবং বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ এবং সম্পর্করচনার ভিত্তি তো রয়েই গেছে। অথচ উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তবে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে হরিনাথ তাঁর গ্রামবার্তার মাসিক সংস্করণে 'বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ' শীর্ষক একটি তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। লেখাটির শুরু এইরকম :

**বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ**

**বিজ্ঞাপন**

> এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যতগুলি ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে একখানিও বিমূঢ়মতি বৃদ্ধদিগের পাঠোপযোগী না হওয়ায় আমি এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু নানাপ্রকার অসুবিধাবশতঃ এ পর্যন্ত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলাম না। এক্ষণে গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক মহাশয়ের মস্তিষ্করোগের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠে বৃদ্ধগণের যদি কিছুও উপকার হয়, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অনেকে ব্যাকরণের তাৎপর্য গ্রহণ না করিয়া কেবল মুখস্থ করেন। এই দোষ নিবারণের জন্য শেষে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর লিখিত হইল। শিক্ষক মহাশয় এই প্রকার আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ইতি।

—শর্ম্মা

......

১৮ই আগষ্ট ১৮৮১ বিদ্যাসাগর।[৩৪]

এখানে এই 'বিজ্ঞাপন' অংশের শেষে লেখক হিসেবে '—শৰ্ম্মা' এবং তার নিচে 'বিদ্যাসাগর'-এর অর্থ কি ঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মা অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষ? লেখার শেষে লেখক হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে 'B. Arowi'. এ নামের আড়ালে প্রকৃত ব্যক্তি কে জানা যায় না। এই 'B. Arowi'. ছদ্মনামে 'বঙ্গ বিহঙ্গ-সঙ্গম' শীর্ষক আর একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল গ্রামবার্তার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক (অক্টোবর ১৮৮১) সংখ্যায়। এই ছদ্মনামের আড়ালে প্রকৃত লেখক যিনিই হোন না কেন, এই লেখাটির পেছনে যে হরিনাথের অনুমোদন ছিল, তা বলাইবাহুল্য।

## তথ্যপঞ্জি

১। দ্র : অশোক চট্টোপাধ্যায় : উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ। উবুদশ। কলকাতা। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১৮-১৩৪

২। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। চতুর্থ ভাগ (আখ্যাপত্র ছেঁড়া থাকায় প্রকাশন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি)। ৩৩ পৃষ্ঠার নিচে প্রদত্ত পাদটীকা।

৩। অশোক চট্টোপাধ্যায় : উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬১-২৬২

৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। শ্রাবণ, তৃতীয় সপ্তাহ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (অগাস্ট ১৮৭২)

৫। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। পৌষ, তৃতীয় সপ্তাহ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (জানুয়ারি ১৮৭৩)। পৃ. ৩

৬। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। ২৪ ভাদ্র, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (সেপ্টেম্বর ১, ১৮৭৭)। পৃ. ১৬৯

৭। দ্র: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক (১৮৫০ সাল)-এর সংখ্যাগুলি (সংখ্যা ৮১, ৮৪ এবং ৮৮)

# বাউল গান : ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত

গ্রামবার্তা প্রকাশের শেষের দিকে হরিনাথ পত্রিকার জন্য সময় দিতে থাকেন অনেক কম। নিরলস পরিশ্রম, দেনাগ্রস্ততা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতা ও প্রাণঘাতী চক্রান্তের মুখে নির্ভীকতার সঙ্গে সত্যপ্রকাশের পথে অনড় থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় হরিনাথের শারীরিক অসুস্থতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমতাবস্থায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখের ওপর গ্রামবার্তা পরিচালনার ভার দিয়ে হরিনাথ একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলেন।

লালন ফকির সম্পর্কে হরিনাথের আগ্রহ অনেকদিন আগেই জন্মেছিল। তিনি তাঁর গ্রামবার্তায় লালনের গান প্রথম প্রকাশের কৃতিত্বের অধিকারী। গ্রামবার্তার প্রকাশ রহিত করার পরবর্তীতে হরিনাথ 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ' প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ থেকে। এই ব্রহ্মাণ্ডবেদ-এর পৃষ্ঠায় হরিনাথ সর্বপ্রথম লালনের একটি গান সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছিলেন।[১] গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

কে বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা। সে যে আপনি গুরু হয়,
আপনি চেলা।

১। সপ্ততালার উপরে সে, নিরূপে রয় অচিন দেশে,
প্রকাশ্যরূপ লীলাবাসে, (চেনা) যায় না লেগে বেদের ঘোলা।।

২। অঙ্গের অবয়বে সৃষ্টি, করিল যে পরমেষ্টি, তবে কেনে
আকার নাস্তি, না জেনে সে ভেদ নিরালা।।

৩। যদি কারু হয় চক্ষুদান, সেই দেশে সেই রূপ বর্ত্তমান,
লালন বলে তার ধ্যান জ্ঞান, দেখে, হবে সকল পুঁথির পালা।।

গানটি হরিনাথ প্রকাশ করেছিলেন 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'-এর প্রথম ভাগ, অষ্টম সংখ্যায়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে। স্বভাবতই এর আরো আগে গানটি ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গানটি প্রকাশের আগে গানটির একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন হরিনাথ। সেই ভূমিকাটি নিম্নরূপ :

> হৃদয় নির্মল হইলে ভগবানের ভাব প্রস্ফুটিত হয়, ইহারই নাম তাঁহার আকার, প্রকাশ, আবির্ভাব, দর্শন প্রভৃতি শব্দে সাধক ও ভক্তজন উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত এই প্রকার দর্শন আর কাহারাও ভাগ্যে ঘটে না। লালন ফকীরনামে জনৈক ভক্ত এই সম্বন্ধে যে গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

এই ভূমিকাংশে হরিনাথ লালনকে 'ভক্ত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'ভক্ত' লালনের এই যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে প্রকাশিত হয়েছে, হরিনাথের কলমে এ ঘটনা প্রথম হলেও, লালন সম্পর্কে এর অনেক আগে তিনি তাঁর গ্রামবার্তায় লালন-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছিলেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের গ্রামবার্তায় হরিনাথ লিখেছিলেন :

> ....লালন শা নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বলা বাহুল্য।[২]

১২৭৯ বঙ্গাব্দে এই লালন-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের পরবর্তীতে হরিনাথ গ্রামবার্তার মাসিক সংস্করণে লালন সম্পর্কে কোন 'বিশেষ বিবরণ' প্রকাশ করেছিলেন কিনা জানা যায়নি। করে থাকলে, তা লালন-চর্চার ক্ষেত্রে উপাদান সরবরাহ করবে নিঃসন্দেহে। তবে ব্রহ্মাণ্ডদেবের পূর্বোক্ত লালনের পরিচিতি ও গান প্রকাশ করার পরবর্তীকালে ব্রহ্মাণ্ডবেদের দ্বিতীয় ভাগে হরিনাথ পুনরায় লালন প্রসঙ্গ এনেছিলেন। এক আলোচনার পাদটীকার সূত্রে হরিনাথ লালন প্রসঙ্গের অবতারণা করে লিখেছিলেন :

> নূরনবী হজরত মহম্মদের পরে মোশল্মানকুলে আর কোন ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেহ পাছে এরূপ মনে করেন, সেই আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি যে, মহম্মদের পর অনেক ভক্ত মোশলম্মানকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ফকীরের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। ....নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্তী ঘোড়াই গ্রামে লালন সাঁই নামে যে ফকীর বাস করেন, তিনিও পরম ভক্ত যোগী। তাঁহার গুরু সিরাজ সাঁই সিদ্ধযোগী ছিলেন।[৩]

লালন ফকিরের সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রকাশের পর্যায়ে হরিনাথ লালন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই আগ্রহের পরিণতি ঘটে লালন-হরিনাথের বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায়। ঠাকুর জমিদারদের পাঠানো গুণ্ডাদের হাত থেকে হরিনাথের জীবনরক্ষা করেছিলেন লালন ফকির স্বয়ং।[৪] এমনকি এর পরবর্তীতে লালনের শিষ্যরা হরিনাথের জীবনরক্ষার প্রহরীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[৫] লালনের আখড়ায় হরিনাথের যাতায়াত এবং হরিনাথের বাড়িতে লালনের আসা-যাওয়া উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কগত সৌহার্দ্যের পরিচায়ক। শৈশবে মাতৃহারা হওয়া এবং মাতা-পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হরিনাথের মনে দুঃখের স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন :

> মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যা আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্য-খেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি।....এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে...পিতৃদেব স্বর্গারোহন করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই।[৬]

শৈশবে মাতা-পিতৃহারা হয়ে স্নেহবঞ্চিত হরিনাথের এই যে ক্রন্দন তা সারাজীবন তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রে জাগরূক ছিল। মায়ের জন্য তাঁর আকুতি কোনদিন অবসৃত হয়নি। জীবনের শেষ রচনা 'মাতৃমহিমা'য়ও তিনি লিখেছেন :

মাগো, নিজমুখে আমার নাম রেখে হরি,
শিশুকালে আমার গেলে পরিহরি;
মাগো, তার পরে পিতা, হরিলেন বিধাতা
দুঃখের কথা স্মরি, ভাসি নয়ন জলে।[৭]

এই দুঃখবোধ তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাবিন্যাসের পটভূমি রচনা করেছিল বলে মনে হয়। জীবন সংগ্রামের খরতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়ের স্নেহাশ্রয়ের অভাববোধ বারবার তাঁকে মাতৃসাধনার চিন্তাশ্রয়িতায় নিয়ে এসেছিল। গ্রামবার্তা থেকে অবসর নিয়ে তিনি সাধনভজনের দিকে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৮] 'আমি, বাবা মা বলিয়ে ভূতলে লোটায়ে, খেলা করি যুগল চরণকমলে'[৯]—এই ছিল হরিনাথের সাধনভজনের মূল দিক। এই মাতা ও পিতার চিন্তাবিন্যাস তাঁর সাধনভজনের স্তরে রাধা-কৃষ্ণ, শ্যাম-শ্যামা, ব্রহ্মময়ী-পরম পিতা প্রভৃতির রূপপরিগ্রহতায় অন্যরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। লালনের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে হরিনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও হরিনাথের নির্দিষ্টভাবে বাউলের দলগঠনের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না বলেই মনে হয়। বাউলের দলগঠনের কথাও তাঁর মনে উদয় হয়নি। বাউলের দল গঠন করার চিন্তাটি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মস্তিস্কপ্রসূত। কাঙাল হরিনাথের বাড়িতে লালনের আসা-যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্যরা পরিচিত ছিলেন। একদিন হরিনাথের বাড়িতে লালন এসে অনেক সময় অবস্থান করেছিলেন এবং কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল লালনের সুবিখ্যাত গান :

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর
তাতে এক পড়সী বসত করে।

এদিন এই গানের সময় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। লালনের এই গান ও তাঁর বাউলদলের বিষয়টি অক্ষয়কুমারের মনে রেখাপাত করে। হরিনাথের বাড়িতে গ্রামবার্তার কর্মক্ষেত্রে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন এবং প্রেসের কর্মচারিদের উপস্থিতিতে অক্ষয়কুমার একটি বাউল দল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি উপস্থিত সবাই সানন্দে সমর্থন করেন। বাউল দল গড়তে গেলে নতুন গান দরকার। অক্ষয়কুমার নিজেই তাৎক্ষণিক গান রচনার দায়িত্ব নিয়ে লেখেন :

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে
ছোঁবে না রে সোনা দানা। ইত্যাদি

এইভাবে পূর্ণাঙ্গ গান-রচনার পর, গানের শেষে বাউল গানের নিয়মানুসারে একটা ভণিতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে অক্ষয়কুমারই গানের ভণিতা হিসেবে 'ফিকিরচাঁদ' নামটি দিয়ে লেখেন :

ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই,
মিছামিছি পর ভাবনা
চল যাই সত্যপথে, কোন মতে
এ যাতনা আর রবে না।

কাঙাল-জীবনীকার জানিয়েছেন, 'আমাদের ত ধর্ম্মভাব ছিল না, কোনও 'ফিকিরে' সময় কাটানোই আমাদের উদ্দেশ্য। 'ফিকিরচাঁদ' নামের ইহাই ইতিহাস।'[১০] প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই গানে সুর সংযোজনা করেন। গানের রিহার্সালে সেই গান সবাই মিলে গেয়ে হরিনাথকে শোনান। হরিনাথ গান শুনে অভিভূত হন। তিনি বাউলদল গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে বলেন একটা গান নিয়ে তো আর দল হয় না, সুতরাং আরও গান দরকার। এই প্রায়োজনিক তাগিদ থেকে হরিনাথ স্বয়ং দ্বিতীয় গানটি তখনই রচনা করেন। গানটি নিম্নরূপ :

আমি করব এ রাখালী কতকাল!
পালের ছটা গরু ছুটে করছে আমায় হাল-বেহাল....

এই গানের শেষে হরিনাথ 'কাঙাল' ভণিতা ব্যবহার করেন :

কাঙাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে
তোমার রাখালী নেও আর পারিনা গরু চরাতে
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে,
তাই কর দীনদয়াল।।[১১]

এইভাবে কাঙাল ফিকিরচাঁদ নামের উৎপত্তি হয়। হরিনাথের এই কাঙাল শব্দটি ভিক্ষাবৃত্তির সমার্থক নয়, এই শব্দের অন্তর্নির্ঝরে নিবেদন-এর ধ্বনি অনুরণিত হয়। হরিনাথের আর এক সাহিত্য-শিষ্যের মতে, হরিনাথের এই 'কাঙাল অভিধা' সাধারণ্যে 'মহর্ষি' বা 'রাজর্ষি' খেতাবের চেয়ে কম-গৌরবের নয়। 'কাঙাল খেতাব আমাদের এই কাঙাল দেশে অগৌরবের' বিষয় বলে কখনই বিবেচিত হতে পারে না। 'কাঙাল আমাদের শ্মশানেশ্বর পশুপতি।'[১২]

এই কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলদল গঠিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের প্রথমার্ধেই। এই দলের তৃতীয় গানটি লেখেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : 'ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে

একবার, দেখ রে মন পামরা'। প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য গানে কোন ভণিতা দেননি; তাঁর বক্তব্য ছিল : যিনি এ গান তাঁর মুখ দিয়ে বের করেছেন, ইচ্ছা হলে তিনিই এর ভনিতা দেবেন।[১৩] তবে এ গানের পরে রচিত আর একটি গানে ('দেখ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে, যে দিনে সে তলব দিবে') 'ফিকিরচাঁদ ফকির'-এর ভণিতা দিয়েছিলেন।[১৪] এই বাউলদলের গায়কেরা গৈরিক রঙের আলখাল্লা পরে, মুখে কৃত্রিম দাড়ি ও মাথায় পরচুলা লাগিয়ে খঞ্জনি নিয়ে নগ্নপদে গান গাইতে বেরতেন। এই দলে প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়রা তিনভাই-ই (অনুজ বানবারীলাল ও খুড়তুতো ভাই নগেন্দ্রনাথ) থাকতেন।

স্বভাবতই বাউলদল গঠন যে হরিনাথের চিন্তাপ্রসূত নয়, তা বলাই বাহুল্য।* তবে এই দল গঠন হরিনাথের অনুমোদন পেয়েছিল। এই দলের সঙ্গে হরিনাথ প্রথম থেকেই থেকেছেন এবং এর প্রেরণা সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব হয়ে উঠেছিলেন। হরিনাথ এ সম্পর্কে তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরিতে যা লিখেছিলেন, তা জলধর সেন তাঁর কাঙাল জীবনীতে উদ্ধার করেছেন। সেখান থেকেই তার কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করছি :

> শ্রীমান অক্ষয় ও শ্রীমান প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম এই ভাবে সত্য, জ্ঞান ও প্রেম সাধনতত্ত্ব প্রচার করিলে পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে। অতএব কতিপয় গান রচনার দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেমসাধনের উপায়স্বরূপ পরমার্থ পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম।[১৫]

হরিনাথ যে এই দলের নেতৃত্বকারী সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন তা হরিনাথের স্ব-উক্তিতে সমর্থিত হয়। হরিনাথের নেতৃত্বকারী চিন্তাভাবনার ফলেই এই

---

* 'শ্রীমৎ নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা এবং বাউল সংগীতের আদি রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ...বীরভদ্র রচিত সংগীত কদাচিৎ বাউলগণের মুখে শোনা যায়। কিন্তু সিদ্ধ সাধক স্বর্গীয় কাঙাল হরিনাথই সমগ্র বাঙলাদেশে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।...' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, নৃত্যগোপাল সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, বেনোয়ারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির 'সহায়তায় একটা বাউলের দল সংগঠিত হয়। ...কিছুদিন পর ফিকিরচাঁদ নামক একজন ভ্রাম্যমাণ ফকির দৈবক্রমে তাঁহাদের দলে যোগদান করেন। ফিকিরচাঁদ ফকিরের নামানুসারেই এই দলের নাম রাখা হল 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল'। এই দল সংগঠনকালীন কাঙালের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত ছিল না। তিনি 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং সাধনকার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কিছুদিন পরে কাঙাল এই দলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সংগীতগুলি 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় অভিহিত করেন।'—দ্রষ্টব্য : সুশান্ত মজুমদার কাব্যনিধি : কাঙাল হরিনাথের বাউল সংগীত। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৮৬

বাউল গান ও দলের দিশা নির্দিষ্ট হয়। 'সত্য, জ্ঞান ও প্রেম সাধন তত্ত্ব' প্রচারের লক্ষ্যে হরিনাথ এই বাউলদলকে পরিচালিত করেছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রস্তাবিত 'ফিকিরচাঁদ' নামের আগে 'কাঙাল' বসিয়ে 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' নাম রাখেন এই বাউলগানের দলের। এই গীতাবলী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে[১৬]—বাঙলা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের মাঝামাঝি নাগাদ।

কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলদল সমসময়ে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান 'আনন্দকর' হয়ে উঠেছিল। হরিনাথ নিজেই এ সম্পর্কে লিখেছেন:

> মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকারে ডাকিয়া কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন।[১৭]

গ্রামবার্তায় জমিদারদের প্রজা-নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করে এবং সরকারের গোচরে সেই সব তথ্যভিত্তিক সংবাদ আনার পরিণতিতে প্রজাপক্ষে সুফল ফললেও, হরিনাথ প্রজাপীড়ক জমিদারদের বিষনজরে পড়ে নানারকম হুমকি ও চক্রান্তের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবু কোনরকম ভয় বা প্রলোভনে তিনি তাঁর 'সত্যধর্মপালন'জনিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন থেকে ভ্রষ্ট হননি। পত্রিকা প্রকাশের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি এই গানের দল নিয়ে মাঠে-ঘাটে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, সে সময়েও 'দেশের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া' তাঁর বিরুদ্ধতা করতে শুরু করেন এবং তাঁর হৃদয়ে নানাপ্রকার 'বেদনা প্রদান' করতে থাকেন। এই সময় হরিনাথ লেখেন :

> আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত, যিনি কেন যে কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেই করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা, পবিত্রতা রহিয়াছে; অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃত কার্য্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে কার্য্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য আমাকে এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।[১৮]

বিরুদ্ধতা করে যেমন গ্রামবার্তায় সত্যনিষ্ঠসংবাদ প্রকাশের কাজে হরিনাথকে প্রপীড়ক জমিদাররা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এই পর্যায়েও বিরুদ্ধতাকারী 'প্রধান ব্যক্তি'-বর্গ হরিনাথকে গান লিখে গানের দল নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে সেই সব গান প্রচারের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হননি। বিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধতা হরিনাথকে তাঁর কর্মসম্পাদনে আরও বেশি দৃঢ়মনস্ক করে তুলেছিল। ক্রমাগত দগ্ধ হওয়ার পরণতিতে তিনি নিজের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফিকিরচাঁদের দলে গীতরচনার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। নিত্যনতুন গান লেখা ও গাওয়া হচ্ছিল। দলের সদস্য না হলে তাঁর বাড়ি গান গাইতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না, হরিনাথের মুখে একথা শুনে মীর মশাররফ নিজেকে ফিকিরচাঁদের দলভুক্ত করে 'রবে না দিন চিরদিন, সুদিন, কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে' গানটি লিখে দিয়েছিলেন দলের জন্য। এভাবে রচিত অজস্র গানের ডালি নিয়ে হরিনাথ সদলবলে বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরে জনমানুষের কাছে গিয়েছেন, গান গেয়ে তাদের মুগ্ধ, বিমোহিত করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। হরিনাথের দলের গান শুনতে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হতেন। হরিনাথের দলের গানের মধ্যে কোন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না, কোন সাম্প্রদায়িক নির্যাস ছিল না, কোনরকম ভেদবুদ্ধির এতটুকু উপাদান ছিল না। হরিনাথের গান শুনতে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র জনসাধারণ সমবেত হতেন। এমনকি ব্রাহ্ম এবং হিন্দুদের মধ্যেকার বিবাদের মীমাংসাও হরিনাথ তাঁর দলের গান পরিবেশনের মাধ্যমে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হরিনাথকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়ে লালন-জীবনীকার লিখেছেন:

> ....ধনীর অট্টালিকা পার্শ্বে জন্মলাভ করিয়া রায়বাহাদুর, নাইট্ প্রভৃতি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিবার অভিলাস না রাখিয়া মহাপুরুষ হরিনাথ....স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'কাঙাল' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ফিকিরচাঁদের অপূর্ব্ব রাগিনীর নিরাবিল তরঙ্গে নগর পল্লী মুখরিত করিয়াছিলেন....।[১৯]

নিজে ব্রাহ্ম না হওয়া সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে হরিনাথ [illegible]লে ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে গিয়ে গান গেয়েছিলেন। মাঘোৎসবে গান গাইতে বহুবছর পর হরিনাথ বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধে কলকাতায় গিয়েছিলেন। লেখক-সাংবাদিক-গীতিকার-গায়ক-বুদ্ধিজীবী হরিনাথ মানবহিতব্রতে দীক্ষা নিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে স্বগ্রাম কুমারখালি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহকেই বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতা শহরের কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তথা নাগবিক সংস্কৃতির প্রতি তিনি মোহমুগ্ধ ছিলেন না। সেই সংস্কৃতির প্রতি তাঁর কোন বিরাগ বা বিতৃষ্ণা-না থাকলেও সংস্কৃতির চিরাচরিত গ্রামীণ ধারার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও বিশ্বস্ততাই ছিল অধিক। হরিনাথের বক্তব্যই ছিল :

> কলিকাতায় কাঙালের স্থান নাই, সে যে বড়মানুষের সহর। তাই আমি বহুকাল কলিকাতায় যাই নাই।[২০]

আর একারণেই বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে গান গাইতে যাবার ক্ষেত্রে হরিনাথের আপত্তি ছিল। কিন্তু সুহৃদ বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। আর, একথা বোধহয় তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা পেতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজে হরিনাথের গান জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বয়ং।

১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় গিয়ে ১০ এবং ১১ মাঘ হরিনাথ ও তাঁর বাউলদলের গায়করা অনেক গান গেয়েছিলেন। কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শুনতে

কলকাতা শহরেও ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল। ১১ মাঘের পরও হরিনাথ দু-তিন দিন কলকাতায় ছিলেন। একদিন ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতেও হরিনাথ গান গেয়েছিলেন এবং সেই গান শোনার জন্য অনেক লোক সমবেত হয়েছিলেন।[২১]

১২৯২ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষে বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে হরিনাথ সদলবলে ঢাকায় গিয়েছিলেন। 'ফিকিরচাঁদের কীর্ত্তনে সমাজ মন্দিরে যেন ঢাকার শহর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের ভিতর, বারান্দা, প্রাঙ্গনে অসংখ্য লোকের জনতায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। প্রবেশের পথ ছিল না, বসিবার স্থান তিলার্দ্ধও ছিল না; সর্ব্বত্র লোকে পরিপূর্ণ।'[২২] শুধু তাই নয়, হরিনাথের গান শুনে 'ঢাকা শহর এরূপ মত্ত' হয়ে উঠেছিল যে অনেকে হরিনাথকে সদলবলে বাড়ি বাড়ি ডেকে তাঁর গান শুনেছিলেন।[২৩]

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষেও বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে হরিনাথ সদলবলে ঢাকায় গিয়েছিলেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখেছেন :

> কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের (হরিনাথ মজুমদার ও প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়ের) গান আজকাল বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই উঁহাদের কথা। সকল সম্প্রদায়ের লোকই উঁহাদের গানে মত্ত। কয়েকদিন হইল তাঁহারাও, গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া উৎসব করিতে, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের আবাসেই অবস্থান করিতেছেন।[২৪]

১২৯৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে সম্ভবত হরিনাথ যাননি। তবে এই উৎসবে হরিনাথের গান গাওয়া হয়েছিল এবং সেই গান শুনে 'কান্নার রোল' পড়ে গিয়েছিল।[২৫] তবে এই মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরই 'সারস্বত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে। এই উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ ও হরিনাথ নিমন্ত্রিত হয়ে সদলবলে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিজয়কৃষ্ণের জীবনীকার শ্রীনাথ চন্দের 'নূতন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি' থেকে যে তথ্য উদ্ধার করেছেন তা হলো : হরিনাথ মজুমদার, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের গায়ক চন্দ্রনাথ রায় এবং নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বিজয়কৃষ্ণ সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে 'ফিকিরচাঁদের গান....নগরবাসীকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল।'[২৬]

এসব তথ্য হরিনাথের বাউল দলের গানের জনপ্রিয়তার পরিচয়বাহক। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজেই জানিয়েছেন যে হরিনাথের গান তিনি 'মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও' বহুবার শুনেছেন।[২৭]

[১] হরিনাথের বাউল গানের প্রসঙ্গ বাঙলা সাহিত্যে বাউল গানের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনার পরিসরে এনেছিলেন রমেশ বসু। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় রমেশ বসু লিখেছিলেন : উনিশ শতকের বাঙালি মিস্টিক-দের মধ্যে 'হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল ফিকিরচাঁদের স্থান খুব' বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তাঁর মতে বাউল সাহিত্য দুধরনের, তত্ত্ব ও রস-এর অর্থাৎ তত্ত্বপ্রধান ও রসপ্রধান। হরিনাথের রচনায় এই 'দুইটি ধরনই

বর্ত্তমান আছে।' হরিনাথের 'তত্ত্বমূলক বাউল সঙ্গীতগুলিতেও' তিনি একটা আলাদা ছাপ খুঁজে পেয়েছিলেন।[২৮]

হরিনাথের বাউল গানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

(১) আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি!
আমি ডিমে এলেম্, ডিমে রলেম, হোতে নারিলাম পাখী।।

* *

জ্ঞান ভক্তি বিবেক পেয়ে, কাঙাল মানুষ হয়ে,
মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হয়ে;
একবার খুলে দে মা, জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি।।[২৯]

(২) শূন্য ভরে একটি কলস আছে কি সুন্দর!
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর।।
কলমের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে সোনার মানিক, কিবা সে উজ্জ্বল;
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর।।[৩০]

(৩) দুনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে, আছে দুই পাখী;
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি। (ভালোবাসায়)
এক পাখী কত ফল বিলায়, সে ত খায় না সে ফল,
আর এক পাখী বসে বসে খায়,
যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে অন্যে হচ্ছে ভোগী।।[৩১]

(৪) ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল কি?
একে, ঘোর রাত্রি, মাঝে নদী, দু'পারে দুই পাখী।। (আছে)
একটী পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়নের জলে, (হায়রে)
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি।। (বল)[৩২]

(৫) দেখ আসমান জুড়ে আছে আজব পুরুষ একজনা।
লোকে, যাহা হেরে, যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা
(ওরে ও ভাই
আকাশ তাঁরে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ চিরকালই
লেংঠা হয়ে রয়;
সেত সকল স্থলে, আসমান জলে, নিজে কিন্তু চলে না।।[৩৩]

(৬) আমারে পাগল করে যেজন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমনে করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।।
আমি সযতনে, যে রতনে রাখিলাম পুরে হিয়ায়;
আমার ঘুমের ঘোরে, চুরী করে, সে রতন কে নিল রে হায়।।[৩৪]

(৭) দোকানি ভাই দোকান সার না, কত করবি আর বেচা কেনা।
লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মস্‌লা, চোর ছ'জন নিল; (দোকানি)
তোর ঘরের মাঝে, সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখনা।।[৩৫]

(৮) আজব দুনিয়ার একি, দেখি আজব কারখানা।
ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখেনা।।[৩৬]

(৯) সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
একি চমৎকার কেহ কার, ছোয়া পানী নাহি খায়।
এক খেয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, সকল জেতের পারে লয়ে যায়;
এক আকার, সবাকার, তবু জাত বিচার দেখায়।।[৩৭]

(১০) অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদালে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অমূল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদে আসি।[৩৮]

(১১) যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাকতে পারতে!
আমি, নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার পারিনা মা, কোন কথা বল্‌তে;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্‌তে।।[৩৯]

(১২) ওহে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে।
(ওহে দীনদয়াল)
১। আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে;
(ওহে আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।।[৪০]

(১৩) ভবে আসা যাওয়া আজব কারখানা।
তুমি, পড়ে শুনে, চোকে দেখে, তবু হয়ে রলে কাণা।।
গ্রহ তিথি মাস যত, ঘোরে ফেরে অবিরত দেখ্ না;
আবার বছর গেলে, বছর আসে, কেবল দিন গেলে ক্ষণ হয় না।[৪১]

(১৪) দেখ ভাই দলের বুদবুদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্সা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা।।[৪২]

(১৫) ভোলা মন কি করিতে কি করিলি
সুধা বলে গরলল খেলি।
সংসারে সোনার খনি পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি;
কি বলে অবহেলে, সোনা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।[৪৩]

এছাড়া বাউলাঙ্গে হরিনাথের আর এক ধরনের গান আছে, যার বিষয়বস্তু তত্ত্বাশ্রয়ী নয়। সমসাময়িক কিছু বিষয় এর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। রানি ভিক্টোরিয়া, লর্ড রিপন, মহারানি স্বর্ণময়ী, ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গল কামনা প্রভৃতি এই সব বাউলাঙ্গের গানগুলির বিষয়বস্তু। চিন্তা ও ভাবাদর্শের অগভীরতা ও তাৎক্ষণিকতা এর আবেদনময়তার সীমাক্ষেত্র রচনা করেছে। যেমন 'ভারতবন্ধু' ফসেট-এর মৃত্যুজনিত শোকসভায় কুমারখালিতে হরিনাথ দুটি গান লিখে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং তা পরবর্তীতে মিসেস ফসেটের কাছে পাঠানো হয়। গান দুটির কয়েক ছত্র উদ্ধার করছি:

(১) হায়রে, আজ একি শুনি শ্রবণে;
সেই যে দয়ার সিন্ধু, ভারতবন্ধু, ফসেট নাই আর ভুবনে।
আঠারশ চোরাশি, কি কুক্ষণেতে পশি, সাতই নবেম্বর
শুক্রবার দহে ফুসফুসি;
সেই নিমোনিয়া, এমনই আঃ! বধিল তাঁর পরাণে। হায়রে
কে আর ভারতের হিতে, পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে
কাঁপাইবে, কাঁদাইবে বাক্য অশ্রুতে;

(২) ধন্য হে ফসেট, তুমি মহাত্মন!
ওহে তোমার জনমে ধন্য ইংলণ্ড ভুবন।
কোথায় ইংলণ্ড ভূমি, কোথায় ভারত কোথায় তুমি;
(সুহৃদ হয়ে কাঁদিলে, ভারতের দুঃখে) স্মরিয়ে ভারতভূমি
করিলে ক্রন্দন।[৪৪]

উপরোক্ত গানদুটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রচিত ও গীত হয় বলে অনুমিত হয়। কারণ ফসেট প্রয়াত হন নভেম্বর ৭, ১৮৮৪ তারিখে। এ গানদুটি স্বভাবতই ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসেই (৭ নভেম্বরের পরে) রচিত হওয়ার শর্ত সৃষ্টি করে। এর কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের গোড়ায় লর্ড রিপন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তাঁর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হলে সমসময়ে অন্য অনেকের সঙ্গে হরিনাথও মানসিকভাবে আহত হন। রিপনের বিদায় উপলক্ষে হরিনাথ একটি দীর্ঘ গান লিখে পোড়াদহ স্টেশনে সদলবলে সেই গান গেয়ে রিপন প্রশস্তি করেছিলেন অত্যন্ত বিসদৃশভাবেই। গানটির কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ :

দেশে চলিলেন মহামতি রিপন।
রামরাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।
১। সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি)
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

* *

(৯) রাজরাজেশ্বরী হয়ে, থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া,
(প্রার্থনা করি এই, বিভুপদে)
এ অত্যাচার দয়া করে, করুন নিবারণ।
(১০) তিনি তোমায় করুণ রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
(যিনি আত্মার আত্মাতে, এই চরাচরের)
কাঙাল-ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।[৪৫]

এই বিস্ময়কর ও বিসদৃশ নজির অবশ্য সেসময় হরিনাথ একা রাখেননি। মনোমোহন বসুও এসময় আশিজন বাউল নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে 'লর্ড রিপনের গুণকীর্তন'[৪৬] করেছিলেন।[৪৬] এছাড়া রিপনের ভারতত্যাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, আনন্দমোহন এমনকি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত 'আত্মীয় বিয়োগব্যাথা' অনুভব করেছিলেন।

তবে তাৎক্ষণিকতার বাইরে এইসব গানের কোন স্থায়ী আবেদন ছিল না, বলাহবাহুল্য।

হরিনাথকে অনেকে 'শখের বাউল' বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন : উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশকিছু সংখ্যক 'শখের বাউল'-এর উদ্ভব হয়। এঁরা বাউল গানের ছন্দ ও সুরে সাধারণ 'ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা, প্রবৃত্তির হাত মুক্ত' হওয়ার নীতিকথা বাউলদের অনুসরণগত প্রক্রিয়ায় দেহতত্ত্বাদি অবলম্বনে গান রচনা করে সে সব গান 'বাউল গান' বলে চালিয়ে থাকেন। উপেন্দ্রনাথের মতে—

এই তথাকথিত বাউল-গানের সঙ্গে তাঁহাদের রচিত সামাজিক প্রসঙ্গ, ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য, ভিক্টোরিয়ার দয়া, ভারতবন্ধু ফসেটের কথা, দেশের সমসাময়িক অবস্থা, কৃষ্ণলীলা, শ্যামাসঙ্গীত, ইংরেজি সভ্যতায় দেশের লোকের মতিগতি প্রভৃতি বিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনা-সম্বন্ধীয় গানও আছে। এইরূপ বাউলগান রচয়িতার মধ্যে কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও পাবনার গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।....এই গানগুলে লোকে বাউলগান বলিতেছে।[৪৭]

একথা সত্য যে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাঙলা ভাষায় যে সব নাগরিক কাব্য-কবিতার প্রস্ফুটন ঘটেছিল, তারই অনুসঙ্গে বাউলের রহস্যগন্ধী একটি সৃজন সাহিত্যের ধারাও বিকাশমান পর্যায়ে থেকে গিয়েছিল, যদিও তা তেমন একটা জনাদরে গ্রাহ্য হয়নি। স্বভাবতঃই এর সলজ্জ প্রকাশ জনসাহিত্যের প্রাঙ্গনে গন্ধবাহিতায় বার্তাবহ হয়ে ওঠেনি। তবু 'বাউল-প্রভাবান্বিত' গীতি-সাহিত্যের এই ধারাটি বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙালি কবিদের মনোজগতে একটা অনতিস্পষ্ট রেখাপাতও ঘটিয়েছিল। আলোকপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে যাঁরা এই 'বাউল প্রভাবিত' গীতি-সাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁরা ইংরেজি-বাঙলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কোনোও-না-কোনোটিতে প্রয়োজনীয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁরা যে কেন বাউলাঙ্গের গীতি-কবিতা রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। এঁরা কেউ 'বৈরাগী' বা 'বিরাগী' ছিলেন না, সহজিয়া পথের পথিকও ছিলেন না। এঁদের বাউলেপনা ছিল নিতান্তই 'সখের' বিষয়। সংসার জীবন থেকে জীবনসংগ্রামের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় নানারকম ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থেকে বাউলদের দর্শন ও জীবনচর্যায় শরিক না হয়েও, এঁরা বাউলাঙ্গের গীতিকবিতা রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর, এদিক থেকে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত কর্ম্মরত বাঙালি জীবনের জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে বাউলের এই দূর হতে-ভেসে-আসা নিশীথ রাতের উপযুক্ত কাঁপানো সুরটি আজ আমাদের কাছে যেন খাপছাড়া ঠেকে।'[৪৮]

প্রথাগত শিক্ষায় অনধিকারী হরিনাথ স্বচেষ্টায় বাঙলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ-এর কাছে হরিনাথ সংস্কৃতশিক্ষা করেছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে। ইংরেজি হরিনাথ জানতেন না। স্বভাবতই বাউল-প্রভাবিত গীতিসাহিত্য রচনাপ্রয়াসী আলোকপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে হরিনাথকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে আত্মসুখপরায়ণতার একান্তই অপক্ষপাতী হরিনাথ জীবনকে অন্যভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের চোখে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া, তাঁদের সুরুচিসম্পন্ন করে তোলার সামাজিক দায়বদ্ধ অভিপ্রায়ে নাটক-পাঁচালি কবিগান-উপন্যাস রচনা করেছেন, অভিনয় করিয়েছেন, গ্রামবার্তার মাধ্যমে প্রপীড়িত মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করতে আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছেন এবং শেষ পর্যায়ে বাউল গান লিখে ও সদলবলে তা গেয়ে গ্রামে-

গ্রামান্তরে মানুষের মানস-দরবারে হাজির হওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতঃই হরিনাথের জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা নিয়ত সন্ধিৎসায় অভিযোজিত হয়েছে। এই ক্রম-সন্ধান বা এই ক্রমাগত অন্বেষণ তাঁকে যখন বাউলমনা করে সাধন ক্ষেত্রে নিয়ে আসে, তখন তাতে ফাঁকি থাকে না। আন্তরিক অর্থে বাউল জীবনদর্শনের সঙ্গে একাত্মতা না ঘটলেও হরিনাথের বাউলমনা এবং সাধনক্ষেত্রের সম্মিলনের ফলশ্রুতিতে যে গীতিকার ও গায়ক হরিনাথকে আমরা পাই, তাকে 'সখের বাউল' বলা কতখানি সঙ্গত তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

সমালোচক সুরেশচন্দ্র মৈত্র হরিনাথের গানকে 'কৃত্রিম বাউল' গান বলার প্রবণতাকে সমালোচনা করেছেন। কাঙাল হরিনাথের সাধনজীবনকে তিনি অকৃত্রিম বলেই গণ্য করেছেন, আর এর অনুষঙ্গেই বলেছেন যে 'কাঙালের অধ্যাত্ম জীবন যদি আন্তরিক ও অকপট হয়' তবে কখনই তাঁর বাউলগান 'কৃত্রিম' হতে পারে না। লালনের সব গানই 'তুল্যভাবে সাহিত্যিক নজরানায় সমৃদ্ধ নয়'—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে কাঙালের গানগুলি যদি লালনের 'গীতসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত' হতো তবে 'এদের পিতৃত্ব বিচার কষ্টকর হতো।' কাঙালের গান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> কাঙাল হরিনাথের গান ভবিষ্যতের কাব্যের এক বিশেষ ভাষা-সৃষ্টির উপকরণ সরবরাহ করল। গদ্যাত্মক শব্দ নয়, পদ্যেরই নিজস্ব একান্ত শব্দ এই বাউল সঙ্গীতের উপকরণ, সম্পদ। সেই গান ও শব্দসম্ভার তাঁকে কেন্দ্র করেই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশাধিকার পায়।[৪২]

উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনায় সমকালীন 'বাউল-ধর্ম সাধনার ও বাউল সঙ্গীতের' প্রসঙ্গ অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ হিসেবে রমাকান্ত চক্রবর্তী বাউলদের মধ্যে 'ধর্মীয় অনাচার' ও তাদের 'নিরক্ষরতা' নিয়ে প্রচলিত 'বিশ্বাস'-কেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে এই 'অনাচার' কথাটির অর্থ তো 'আপেক্ষিক', আর সব বাউলই নিরক্ষর ছিলেন, এ কথাও ঠিক নয়। লালন ফকির নিরক্ষর ছিলেন না। এছাড়া হরিনাথ সহ গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ দীন বাউল, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্ত পাঠক প্রভৃতি বাউলরচয়িতারাও তো অশিক্ষিত ছিলেন না। এই তথ্যের অনুষঙ্গে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন 'এঁদের মধ্যে সব দিক থেকেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন হরিনাথ মজুমদার'।[৪৩] হরিনাথের বাউলগানকে কৃত্রিম বলার কিম্বা তাঁকে 'সখের বাউল'-এর অভিধাক্রান্ত করার প্রবণতা এখানে পৃষ্ঠপোষণা পায় না।

অনাথকৃষ্ণ দেবও হরিনাথ তথা ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল গানকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কোনওরকম ভড়ংবাজি ব্যতিরেকে স্পষ্ট ও আন্তরিক উচ্চারণে হরিনাথ যখন গান :

মনে না বিবেক হলে ভেক হইলে কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকাকড়ি কোঠা বাড়ী কিসে হবে সেই ভাবনা।।

বাহিরে তিলক ঝোলা জপের মালা দেখে ত ভাই সে ভুলবে না।
বাহিরে মোড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা মনের মধ্যে কুবাসনা।।
তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা করে বেড়াও আসন ঠিক থাকে না।
কাঙাল কয় কুবাসনা মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা।।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা, তবে ছাই কর ভাই কুবাসনা।।

তখন তাতে কৃত্রিমতার অবকাশ কোথায়? হরিনাথের জীবনদর্শনের অকপটতা ও সাধন-জীবনের একাগ্রতা এই গানের কথামালার নিহিতার্থে প্রতিফলিত। নিছক কোন সখের বাউলেপনার স্থান এখানে নেই। কাঙালের 'যদি ডাকার মতন পারিতাম ডাকতে' গানটিতে 'প্রাণের কাঁদুনী' খুঁজে পেয়ে অনাথকৃষ্ণ দেব বিমোহিত হয়েছিলেন। উনিশ* শতকের শেষলগ্নে 'টপ্পা-খেউড় ফূর্তি-প্লাবিত' বাংলাদেশে হরিনাথের গান দীর্ঘশ্বাসের সীমারেখা ছাড়িয়ে 'একটু আরাম—একটু শান্তি'র সন্ধান দিত বলে তিনি মনে করতেন।[৫১]

কষ্ট-দুঃখ, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার অভিঘাতে হরিনাথ জীবনকে দেখেছিলেন গভীর অন্তর্নিবেশে। জীবন-যন্ত্রণার বিষ তিনি হাসিমুখে পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এই যন্ত্রণা তাঁকে সাধন পর্যায়ে এক অনন্যসুন্দর বোধের আলোকক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল। সাধারণ এবং প্রচলিত 'ভক্ত'-এর অনুষঙ্গে কর্মবিমুখতা ও ভাববিলাসিতা হরিনাথের জীবনচর্যায় ছিল একান্তই দুর্নিরীক্ষ্য। হরিনাথকে একজন প্রথিতযশা সমালোচক 'কর্মযোগী ভক্ত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ভক্তি-প্রকাশক গান ধর্মমন্দিরে, ভিক্ষুকের মুখে, নানা উৎসবাদিতে, ধনী-দরিদ্র-কৃষক-মাঝির কণ্ঠে আন্তরিক উচ্চারণে গীত হয়। এ গান কি হিন্দু কি মুসলমান—সবার মুখেই শোনা যায়। আরও স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন :

> আমাদের ধর্মসঙ্গীতে সাধন-ভজন একাকার। এখানে তত্ত্ব ভাবে প্রথিত, ভাব তত্ত্বে প্রথিত। দর্শনের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব দেখি সুরে উঠিয়া সরল ও উজ্জ্বল হইয়া আছে। জ্ঞানীর দর্শন সাধারণ ভক্তের ভাবে পরিণত হইয়া থাকে।...কাঙাল হরিনাথের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিলাম।....[৫২]

---

* 'কাঙাল হরিনাথের ধর্মোন্মাদ ভাব এবং বাউল সংগীতের মধ্যে দিয়া সাহিত্যচর্চা তাঁহাকে বাঙালীর নিকট চিরপূজ্য করিয়া রাখিয়াছে। পুরাতন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র, পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, মহাকবি চন্ডীদাস, বাঙলা ভাষায় মহাভারতকার কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ বাঙলা সাহিত্যকে ফলপুষ্পে ও শাখা-প্রশাখায় যে প্রকারে সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন, কাঙালও তেমনি বাউল সংগীতের মধ্যে দিয়া বাঙলা সাহিত্যকে স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালায় উদ্‌বেলিত করিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত করিয়া গিয়োছেন।'—সুশান্ত মজুমদার কাব্যনিধি : কাঙাল হরিনাথের বাউল সংগীত। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৮৬

হরিনাথের বাউল গানের মতো গান লেখার চেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের কয়েকজনের দু'একটি গানের নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

**১। বিহারীলাল চক্রবর্তী—**

ভবের খেলা চমৎকার।
এর, কোথাও ফাঁস, কোথাও হাসি,
কোথাও ওঠে হাহাকার।
লক্ষ্মীদেবী হিরন্ময়ী কিরণে কিরণ
পেঁচা, বিচিত্র বাহন,
খেলে পদ্মবনেন আপন মনে, পরিয়ে পদ্মের হার—
সরস্বতী পরিয়ে পদ্মের হার।[৫৩]

**কিম্বা**

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা!
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত খেলবি রে—
ও পাগল মন খেলবি রে রসের খেলা![৫৪]

**২। মীর মশাররফ হোসেন—**

কেন আর মিছে ফের, ভেবে মর
পরের বোঝা মাথায় করে।
তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি, সব গিয়েছে,
পড়ে চিড়ের বাইশ ফেরে।
কেবা কার, তুমি বা কার, কেবা তোমার
চিনলে না মন মনের ফেরে।[৫৫]

**কিম্বা**

এ ভবের ভাব দেখি ভাই চমৎকার।
তারি লীলে বুঝে উঠা ভার।।
(আর) পাহাড় জঙ্গল যত নদনদী,
ওরে কৃষ্ণসাগর, মহাসাগর, লালসাগর আদি,
কত সহর নগর, কত সহর নগর
এই ধরার পর, শূন্যে ঘুরাচ্ছে আবার।[৫৬]

৩। রজনীকান্ত সেন—

দেখে শুনে আনলি রে কড়ি, সব কড়িগুলো হল রে কানা;
ভাল বলে কিনলি রে দুধ, উননে তুলতে হল রে ছানা।।
বুনেছিলে ভাল ভাল ফুল
বেলী, যুথি, গোলাপ, .বকুল,
মরে গেল জল না পেয়ে, আগাছা ঘিরলে বাগানখানা।[৫৭]

কিম্বা

কে দেখবি ছুটে আয়,
আজ গিরি-ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়!
ঐ 'মা এল, মা এল' বলে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে
উঠি-পড়ি করে সবাই আগে দেখতে চায়।[৫৮]

কিন্তু বিহারীলাল, রজনীকান্ত, প্রভৃতিদের এই সব গানে নাগরিক কবির যে অভিহ শিক্ষিত মননের সাহচর্যে সখের বাউলেপনার অঙ্গনে এসেছে, তা মননের গাম্ভীর্যে তত্ত্বের গভীরতায় এবং অনাগরিক শব্দ-প্রয়োগে হরিনাথের গানের অনন্যতার প্রতিতুলনায় নিতান্তই নিষ্প্রভ। গ্রামীণ বৈদগ্ধ্য অনাগরিক ভাষানুষঙ্গে যে দর্শনগত ঋদ্ধতা হরিনাথের বাউল গানে পাওয়া যায়, তা বিহারীলাল-রজনীকান্ত-মশাররফ প্রমুখের গানে বাস্তবিক দুর্নিরীক্ষ্য। অন্যদিকে শব্দচর্চা ও ভাষানুশীলনে যে নাগরিক বৈদগ্ধ্য বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বাউলগানের গানে পাওয়া যায় তা হরিনাথের বাউলগানে দুর্লভ। এর মাঝে মশাররফের বাউলাঙ্গের গানগুলি হরিনাথের প্রভাবের সীমারেখা অতিক্রম করতে না পারায়, না-পেরেছে নাগরিক বৈদগ্ধ্যে ভাস্বর হতে, না-পেরেছে বাউলাঙ্গের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক দিগ্‌দর্শনে সমৃদ্ধ হতো।

গ্রামবার্তা প্রকাশের পর্যায়ে হরিনাথের যে সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে, উত্তরকালে সেই হরিনাথের আধ্যাত্মিক ভাবধারায় জীবনদর্শনের 'নিকষিত হেম' এক বিপরীত সম্পর্কের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে। সম্পাদক ও নিরলস সত্যসন্ধ সংগ্রামী হরিনাথ এক শান্ত-সৌম্য-সাধক ঋষিকল্প হরিনাথের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। তবে একটা বিষয় সব পর্যায়েই প্রাধান্যে থেকেছে, তা হলো নির্জনতায় নয়, হরিনাথের স্বস্তি-সন্ধান সবসময়ই জানতার সান্নিধ্যেই অবয়বিত হয়েছে। প্রাক-গ্রামবার্তা পর্যায়ে তিনি গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের চোখে শিক্ষার আলোকরেখা অঙ্কনের প্রয়াসী হয়েছিলেন, গ্রামবার্তা-পর্যায়ে সরাসরি জনস্বার্থে, আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, একাকী লড়াই করেছেন জমিদার, পুলিশ, প্রশাসন ও নীলকরদের সঙ্গে, আবার উত্তর-গ্রামবার্তা পর্যায়ে সাধনভজন করতে গিয়ে গ্রাম-দেশ-ছাড়া হয়ে নির্জন অরণ্যবাসী

হননি বরং বাউলগানের ডালি নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষের দরবারেই গিয়েছেন। হরিনাথের এই দর্শনগত অবস্থান নিঃসন্দেহে তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

উত্তর-গ্রামবার্তা পর্যায়ে সাধনভজন ও বাউলগান রচনা ও গানের দল নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের পর্যায়েও হরিনাথ সবসময় আধ্যাত্মিক দর্শনমগ্নতায় নিবিষ্ট হয়ে থাকতে পারেননি। তাঁর বাউল গানের মধ্যে একসময় এসেছে এমন কিছু গান যা একদিকে যেমন অগভীর, ভাব-তারল্যে নিষ্প্রভ, তেমনি অন্যদিকে গুণমানেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। যেমন—

(ক) ব্রিটিশের নিশান তুলি সবে মিলি, কর জয় মঙ্গলধ্বনি।
বলরে অনাথ মাতা পতিব্রতা, ভিক্টোরিয়া মহারানী;
ওরে যাঁর রাজ্যের মাঝে উদয় আছে, অস্তে যায় না দিনমণি।[৫৯]

(খ) আরে গাওরে ওভাই সবে মিলে গাও, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয়;
সবে, মহানন্দে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজাও।[৬০]

(গ) বসে চাতক পাখী ডাকে রে ডালে!
মেঘের জল বিনে পিপাসা যায় না, তাই ফটিক জল দে বলে।
ভাগ্যফলেতে আকাশে যদি মেঘে বারি বর্ষে, হায় রে!
তবে ত তার পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে।[৬১]

তবে হরিনাথের ফিকিরচাঁদের দলের গান যে সমসময়ে প্রভূত জনাদরলাভে সমর্থ হয়েছিল যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-পরিবারে জনৈক 'বষ্ণম' কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শোনাতেন, এমন তথ্যও পাওয়া যায়।[৬২] সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক বঙ্কিমচন্দ্র সেনও তাঁর বাড়িতে তাঁর পিতার সাক্ষাৎপ্রার্থী এক 'গৌরবর্ণ গৈরিকধারী সন্ন্যাসী'র মুখেও 'কে তোরে ঢালিয়া দিল এমন শীতল জল রে' এবং 'এই কি সেই আর্য্যভূমি' গানদুটি শুনেছিলেন।[৬৩] গঙ্গোত্রীর পথে জলধর সেনের কাছে এক স্বামীজী 'হরিনাথ মুজমদারের হিমালয়ের গান' শুনতে চেয়েছিলেন। জলধরও 'হৃদয় খুলিয়া' হরিনাথের এই গানটি গেয়েছিলেন :

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে,—
কেবা রে আদর কোরে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি
বাঁধিয়াছে;
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমার হীরার টোপর
পরায়েছে।

এই গান গাইবার সময় সেই স্বামীজীর জলধরের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন।[৬৪]— এসব তথ্য হরিনাথের গানের জনপ্রিয়তাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।* হরিনাথ প্রয়াত হওয়ার

নয় বছরের মাথায় 'বাঙালীর গান' সম্পাদনাকালে দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছিলেন : 'হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকীর'-এর 'কাঙাল ভণিতাযুক্ত' বহুগান পূর্ববাঙলার 'নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গীত' হয়ে থাকে। হরিনাথ 'পূর্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীতকার বলিয়া প্রসিদ্ধ' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৬৫] হরিনাথের ৩৬টি গান এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হরিনাথের ফিকিরচাঁদের অনুকরণে সমসময়ে দয়ালচাঁদ, গরিবচাঁদ, আজবচাঁদ প্রভৃতি গানের দলের উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন সময় হরিনাথের দলের গান লালন এবং পাগলা কানাইয়ের গানের জনপ্রিয়তাকেও ছাপিয়ে উঠতো। মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী'-র ৮৯ সংখ্যক গানে এর পরিচয় মেলে। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে রজনীকান্ত সেনের গানে যে 'কান্ত' ভণিতা, তা তিনি হরিনাথের 'রচনাসূত্রে' পেয়েছিলেন।[৬৬] শুধু তাই নয়, তিনি এ কথাও বলেছেন :

> হরিনাথ মজুমদার 'কাঙাল' ও 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় বহু পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়া একদা বাউল গানে দেশকে মাতাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আগে বাউলগানে—যাহাকে ইংরেজিতে বলে Vogue তাহা হরিনাথই করিয়াছিলেন।[৬৭]

হরিনাথের গানের প্রকৃত সংখ্যা আজও নির্ণীত হয়নি। তাঁর প্রকাশিত গীতাবলী এবং হরিনাথ গ্রন্থাবলীতে সংকলিত গান ছাড়াও এখনও হরিনাথের বসতবাড়ি কুমারখালি কাঙাল কুটিরে চার শতাধিক অপ্রকাশিত গানের পাণ্ডুলিপি আছে বলে কাঙাল প্রপৌত্র অশোক মজুমদার লিখিতভাবে জানিয়েছেন। প্রকাশিত গীতাবলী ছাড়াও 'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'-এও বহুগান সংকলিত হয়েছে। অবশ্য এই সংকলিত গানসমূহের সবই হরিনাথের নয়। ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম ভাগের বারোটি সংখ্যায় ১৬৮টি গান, দ্বিতীয়ভাগে ১১১টি গান এবং চতুর্থভাগে ৪৩টি গান সংকলিত হয়েছে। এই সংকলিত গানগুলির মধ্যে হরিনাথ ছাড়া অন্য যাঁদের গান আছে, তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, লালন ফকির, নীলকণ্ঠ মজুমদার, ডাক্তার শ্যামাচরণ মজুমদার, রামলাল চৌধুরী, ত্রৈলোক্য, পুণ্ডরীক ও 'নাম অজ্ঞাত'-এর গানসমূহ। নিজের বাদে অন্যের সংকলিত গানের নিচে হরিনাথ গীতিকারের নাম স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত করে প্রশ্নাতীত সততার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যের কোন গান তিনি কখনও নিজের বলে দাবি করেননি। বরং অন্যের গানের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। তাঁর বক্তব্যেই জানা যায়, সমসময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে মানুষ 'পাগল হইয়া যায়।'[৬৮]

---

* রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন : '...হরিনাথের গান আজকাল বড় শুনি না। বস্তুত শহরে এ ধরনের গানের প্রচার কম। ...এই বাউলটি (হরিনাথ) সংবাদপত্রসেবী, সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের এমন যোগ আজকাল আমাদের দেশে বিরল বলিয়াই মনে হয়।'—দ্রষ্টব্য : দেশ, এপ্রিল ৪, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পৃ. ৬৫৬

## তথ্যপঞ্জি

১। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডদেব। প্রথম ভাগ, অষ্টম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রাবণ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২৫০-৫১

২। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। ভাদ্র, প্রথম সপ্তাহ। ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (অগাস্ট ১৮৭২)। পৃ. ৩

৩। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ, দশম সংখ্যা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাদটীকা। পৃ. ৩৬০-৬১। কাঙাল-পৌত্র বৈদ্যনাথ মজুমদারের কাছে দেখেছি। আখ্যাপত্র ছেঁড়া থাকায় প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি

৪। হেমাঙ্গ বিশ্বাস : লোকসঙ্গীত সমীক্ষা/বাংলা ও আসাম। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: পি:। কলকাতা। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যা। পৃ. ৬৭-৬৮

৫। বিশ্বনাথ মজুমদার : পল্লীপ্রাণ...। প্রাগুক্ত। প্রথম পৃষ্ঠা

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫

৭। হরিনাথ মজুমদার : মাতৃমহিমা। কুমারখালি, বাঙলাদেশ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৪৫

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০

৯। হরিনাথ মজুমদার : মাতৃমহিমা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৫

১০। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ২২-২৬

১১। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭-২৮

১২। দীনেন্দ্রকুমার রায় : কাঙালের স্মৃতিচর্চা। সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৯৪

১৩। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯-৩০

১৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২

১৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪-৩৫

১৬। দীনেন্দ্রকুমার রায় : কাঙাল হরিনাথ। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১১৪

১৭। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫

১৮। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫

১৯। বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির। শান্তিপুর, নদীয়া। ১৩৬২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১০৩

২০। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৭

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬-১০২

২২। বঙ্কবিহারী কর : মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত। ঢাকা। আশ্বিন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২৪৩

২৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪৪

২৪। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ। প্রথম খণ্ড (১২৯৩-৯৬ সালের ডায়েরি)। কলকাতা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ২৬

২৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫

২৬। বঙ্কবিহারী কর : মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮১
২৭। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৯
২৮। রমেশ বসু : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাউল প্রভাব। বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয়ার্ধ, ৪র্থ সংখ্যা। পৃ. ৪৩৬-৩৭
২৯। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৪
৩০। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৩
৩১। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৬
৩২। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭৬
৩৩। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৬
৩৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২০
৩৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫৭-৫৮
৩৬। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬১
৩৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮৪-৮৫
৩৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২১
৩৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২৩
৪০। কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীত। গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১০-১১
৪১। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫৫
৪২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৮
৪৩। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪৬
৪৪। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২৯-৩০
৪৫। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৯-৬০
৪৬। সুনীল দাস (সম্পাদিত) : মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি। সাহিত্যলোক। কলকাতা। ১৯৮১ সংস্করণ। পৃ. ২০৮
৪৭। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান। অখণ্ড সংস্করণ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। কলকাতা। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১০৩-৪
৪৮। রমেশ বসু। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৩৩-৩৫
৪৯। সুরেশচন্দ্র মৈত্র : বাংলা কবিতার নবজন্ম। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩১৯-২১
৫০। রমাকান্ত চক্রবর্তী : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান : একটি পরীক্ষা। ইতিহাস, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২০৩-৪
৫১। অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩৬২-৬৩
৫২। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : কাঙাল হরিনাথ। হরিনাথের ৭৫ তম স্মৃতি উৎসব স্মরণ পুস্তিকা।

অক্ষয় তৃতীয়া। ২৪ বৈশাখ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ। কলকাতা। পৃ. ২-৩

৫৩। বিহারীলাল চক্রবর্তী : বাউলবিংশতি। বিহারীলালেল কাব্যসংগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। ১৯৬৬ সংস্করণ, পৃ. ১৭৭-৭৮

৫৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮১

৫৫। পারিজাত মজুমদার : মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান। জাগরী। কলকাতা। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৬৩

৫৬। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৫

৫৭। কান্তকবি রচনাসম্ভার : (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৩২০

৫৮। কান্তকবি রচনাসম্ভার : প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮২-৮৩

৫৯। কাঙাল-ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২১

৬০। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২২

৬১। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫৭

৬২। প্রশান্তকুমার পাল : রবিজীবনী। তৃতীয় খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১২৯

৬৩। ব্রজমোহন দাশ (সম্পাদিত) : জলধর কথা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ১৯৪১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৭৬-৭৮

৬৪। জলধর সেন : গঙ্গোত্রীর পথে। সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৪৪-৪৫

৬৫। দুর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পাদিত) : বাঙ্গালীর গান। কলকাতা। ১৩২২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫০৮

৬৬। সুকুমার সেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। চতুর্থ খণ্ড। বর্দ্ধমান। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৬২

৬৭। সুকুমার সেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। উনবিংশ শতাব্দী। ইস্টার্ন পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৭০ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১৬৩

৬৮। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪২

# হরিনাথের ধর্মবোধ

হিন্দুধর্মের চিন্তাশ্রয়িতায় হরিনাথের ধর্মবোধ লালিত ও বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনরকম ধর্মবিদ্বেষকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। মানব-কল্যাণব্রতই ছিল তাঁর চিন্তাচর্চার বিষয়। এজন্যই দেখা যায় লালন ফকিরের সঙ্গে যেমন তাঁর নিবিড় সৌহার্দ্য চিরদিন বজায় থেকেছে, তেমনই হিন্দুধর্মের প্রচারক ও তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সঙ্গেও তাঁর মতের অমিল ঘটেনি, আবার ব্রাহ্মসভায় গান গাইতে যেতেও তিনি নীতিগত আপত্তির প্রশ্ন তোলেননি। তাঁর গানে যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মূল্যবান দলিল খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি কৃষ্ণ ও কালীকীর্তন, বৈষ্ণব পদ, আগমনী গান এমনকি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কোন চিন্তা বা ভাবগত দ্বন্দ্বে বিব্রত হননি। মানবিক মূল্যবোধেই তিনি শাসিত হয়েছেন। আর এই মানবহিতব্রতচর্চার জায়গা থেকেই তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের মানবতা-বিরোধী আচার-আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, অশিক্ষার বিপরীতে সুশিক্ষার এবং জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যথার্থভাবেই।

মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা হরিনাথকে পীড়িত করতো, তাদের যন্ত্রণা তাঁকে তাদের যন্ত্রণামুক্তির ভাবনায় ভাবিত করতো। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই হরিনাথের ধর্মবোধের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। নিজে প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী হওয়ার দুঃখের দরুন অন্যকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে হরিনাথ যেমন স্বস্তি খুঁজেছেন, তেমনই নিজের অ-সুখের যন্ত্রণাবোধ অন্যকে অ-সুখের যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরহিতব্রত হরিনাথকে যে মানবিকতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিল, সেই মানবিক মূল্যবোধের চিন্তামনস্কতা থেকেই তিনি হিন্দু-ব্রাহ্মের বিবাদ-মীমাংসায় উদ্যোগী হয়েছেন,[১] 'শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন প্রচেষ্টায়' প্রয়াসী হয়েছেন।[২] আবার এই একই তাগিদ থেকেই তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে হিন্দু এবং মুসলিম মৌলবাদের নিন্দা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ তাঁকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত করেছিল। তিনি লিখেছিলেন :

জাতির নামে ধুয়া তুলে
(দিচ্ছ) খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে
এ জাত যে জাত মারবার কল
নদীর জল করছি পান

একই জমির খাচ্ছি ধান

একই ভাষায় গাইছি গান

ভাইয়ের বুকে ছুরি মারে

(তারা) শয়তানের দল।[৩]

হরিনাথের আবেগ এখানে হৃদয়স্পর্শী। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিম্বা দাঙ্গা যে কিছু 'শয়তানের দল'-এর অপকর্ম, তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এখানে বলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-ব্রাহ্ম কোন ভেদ ছিল না। ব্রাহ্ম-বিরোধী তিনি ছিলেন না, আবার ব্রাহ্মাদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিতও করেনি। দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। কথা ও কাজের মধ্যে সমতারক্ষাকে তিনি মান্যতা দিতেন। ব্রাহ্মদের প্রগতিশীল সমাজিক আদর্শ তাঁকে যতখানি উৎসাহিত করতো, ততোধিক হতাশ করতো তাদের অনুশীলনগত বৈপরীত্য। ব্রাহ্মবিবাহ আইন সম্পর্কে হরিনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর পরিণতিতে ব্রাহ্মদের মধ্যে ঐক্যবোধের বিপ্রতীপে বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ পেতে পারে। হরিনাথের মতে, তাঁর আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। গ্রামের ব্রাহ্মরা 'বিবাহ রেজেস্টরি' করতে অত্যন্ত অপমান বোধ করে অনেকে 'পৌত্তলিক হিন্দুধর্মে' প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, অনেকে 'হিন্দু ব্রাহ্মমতে' চলতে মনস্থ করেছিলেন।[৪] তবে ব্রাহ্মবিবাহ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ অনুসৃত পদ্ধতি হরিনাথের অনুমোদন পেয়েছিল।[৫] নবহিন্দুবাদের অন্যতম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধতায় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবকে প্রশ্রয় দিলেও হরিনাথ শিবচন্দ্রকে সংযত আচরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক চিন্তাবিন্যাসের সূত্রে তিনি লিখেছেন :

সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
একি চমৎকার কেহ কার ছোয়া পানী নাহি খায়।
এক খেয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, সকল জেতের পারে লয়ে যায়;
এক আকার, সবাকার, তবু জাত বিচার দেখায়।
এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, খ্রীস্টান আদি করিছে জলপান।
যেই জল তুলে কেউ ছুলে অম্‌নি ফেলে দেয়।
এক বাতাসে সব করছে বাস, সেই বাতাস আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস;
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।
এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়, আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব, প্রেমভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙাল বলিছে সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন কাজে না দেখান;
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদজ্ঞান কভু না যায়।[৬]

হরিনাথের এ বক্তব্য তাঁর মানসিক ঔদার্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

মুখে কথা বলে কাজে না-দেখানোর কাজকে তিনি অবিহিত বলেই মনে করতেন। মির মশারফকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, ফিকিরচাঁদের দলের সদস্য করে নিয়ে তাঁকে গান লিখতে উৎসাহিত করেছেন। লালন ফকিরকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি করেননি তিনি, অথচ তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধার আসনে বসাতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ বাউলগান হরিনাথই সর্বপ্রথম মুদ্রিতাকারে কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে প্রকাশ করেন। লালনের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি হরিনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের 'কৃতবিদ্য' ছাত্রদের ভূমিকার নিন্দা করে হরিনাথ লিখেছিলেন :

> দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র বা (সাধকগণ) ....নিম্নশ্রেণীর ব্রহ্মবিদ্যালয়গুলির উন্নতি করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, বরং সেগুলি যাহাতে উঠিয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাহার ছাত্র বা সাধকদিগকে সহোরের (সহোদরের) ন্যায় ভালবাসিবেন দূরে থাকুক, পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিতেও দেখা যায়।[৭]

মুসলমানদের হিন্দুমন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> জ্যোতিস্তত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত কাশীতে যে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া যদি কেহ উক্ত মন্দির নষ্ট করে, তাহা হইলে যাঁহারা উক্ত মন্দিরের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদিগের যেরূপ মর্ম্মবেদনার কারণ হয়; মোশল্মানদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারে তদ্রূপ হিন্দুগণও মর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, কত শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইল, কিন্তু এখনও এই বিরোধ বিদূরিত হইল না।[৮]

একথাগুলি লেখার পরবর্তীতে হরিনাথ আবার লিখেছেন যে, এই বিরোধের মর্মান্তিক পরিণতির 'আলোচনা ও চিন্তা' করলে 'অভেদজ্ঞানী' হিন্দু-মুসলমানমাত্রই 'নেত্রনীরে বক্ষঃস্থল সিক্ত' করে থাকেন। এই তথ্যের নির্যাসে এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা পায় যে বিচারবিযুক্ত একজন মৌলবাদীর অশুভ চিন্তাভাবনার সঙ্গে তিনি ব্যাপকসংখ্যক সাধারণ মুসলমানদের এক করে দেখেননি। বরং 'অভেদজ্ঞানী' মুসলমানরা যে এই মৌলবাদীদের বিরোধিতা করে থাকেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন তথ্য ও সত্যনিষ্ঠার স্বার্থেই। অন্যদিকে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ....এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় পৃথক হইলেও, ইহার যে কত উপসম্প্রদায় আছে তাহার সংখ্যা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ নহে। এই সকল সাম্প্রদায়িক লোকেরা আপন আপন মত সমর্থন করিতে পরস্পরের প্রতি পরস্পর যে প্রকার দোষ

অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্তা (আস্থা) ক্রমে অল্প হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।[৯]

'ধর্ম্মদলাদলিতে' যে পৃথিবীতে বহু অনিষ্ট সাধিত হয়েছে—একথাও নির্মোহদৃষ্টিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। খুব নির্দিষ্টভাবে তিনি বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানধর্মের মধ্যে প্রকটভাবে 'মতভেদ' ও 'বিবাদ বিসম্বাদ'-এর বিষয়াবলী থেকে গেছে। হিন্দুধর্মের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি মুসলমানধর্মের 'সাম্প্রদায়িকতা ও মতান্তর'-এর বিষয়গুলিও যে 'সামান্য' নয়—একথাও তিনি বলেছেন অকপটভাবেই। তাঁর মতে—

সিয়া ও সুন্নির কথা স্মরণ করিলেই, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। খৃস্টান ধর্ম্মের রোমান ক্যেথলিক ও প্রোটেস্টান্ট মতের বিষয় স্মরণ করুন। এই প্রকার মতান্তরে নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমে কিরূপ বলবতী হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন।[১০]

প্রকৃত ধর্মাচরণের বিপরীতে ধর্মাবরণে ধর্মবিরুদ্ধ কাজকে হরিনাথ কখনও অনুমোদন দেননি। তাঁর মতে 'ধর্ম্মপরিচ্ছদ, ধর্ম্মভূষণ ও ধর্ম্মচিহ্ন' ধারণ করে মুখে 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করে ধার্ম্মিকের ভাণ করেন, এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। 'ধার্ম্মিক' নামে খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে 'ধর্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেকেই' যা ইচ্ছে তাই সম্পাদন করার পরিণতিতে দেশ 'ধর্ম্মশূন্য' হয়ে দিন দিন 'অধঃপাতে' যাচ্ছে বলে তাঁর মনোকষ্টের অন্ত ছিল না। তিনি দেখিয়েছেন :

শুরু প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মরক্ষী সম্প্রদায় আবার বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের মত ধর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, ধর্ম্মের আরও দুর্দশার কারণ হইয়াছেন। ক্রেতা বিক্রেতার মত গুরু শিষ্যের আচরণ হইয়া উঠিয়াছে।....ধর্ম্মযাজক, ধার্ম্মিক এবং বণিকবেশে লোকে, পৃথিবীর এক এক প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক, পরিশেষে দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।[১১]

উনিশ শতকের অন্তিমলগ্নে সমসময়ের ধর্ম ও ধার্ম্মিক প্রসঙ্গে হরিনাথের এধরনের স্পষ্ট এবং নির্মোহ উক্তি বিস্ময়কর ঠেকে। তারুণ্যদীপ্ত সাহসী স্পষ্টবাক সাংবাদিক হরিনাথ যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও সমান সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ থেকেছেন—তার প্রমাণ এখানেই। মুখে ধর্মের কথা বললেও, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নন, ধর্ম যাঁদের কাছে অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় মাত্র বলে বিবেচিত হয়, এমন ধর্মবিহীন ধার্মিকদের সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ। :

এরূপ ধার্ম্মিক লোকেরা যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা লোকের মনে তাঁহাদিগের ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই সুযোগে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণই অন্তরের বিষয়, ধর্ম্ম কেবল বাহিরের আবরণমাত্র।[১২]

হরিনাথের শিক্ষাদর্শের মূলকথাই ছিল 'কপটতা পরিহর, ভাল হও ভাল কর'। এই ভালো হয়ে অপরের মঙ্গল-সাধনের প্রক্রিয়াতেই তিনি অমৃত্যু ব্রতী থেকেছিলেন। স্বভাবতই নিজের

সরল ও অকপট জীবনাচরণ, দর্শনবৈভবের অবস্থান থেকে কপটাচারকে তিনি কখনও অনুমোদন দিতে পারেননি। এ কারণেই 'ধর্মব্যবসায়ী'দের তিনি ঘৃণা করতেন।

'ব্যাভিচারের' উৎস হিসেবে অজ্ঞানতা 'ভ্রাতৃবিরোধ'-এর জন্ম দেয় এবং এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর 'শান্তিহরণপূর্ব্বক পরমানন্দের পরিবর্তে, তাহাতে নিরানন্দ ও শোকসন্তাপ' বিস্তার করে থাকে।[১৩] যারা 'ভেদজ্ঞানী অজ্ঞ' তারাই বেদ ও কোরানকে ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী প্রচার করে 'ভ্রাতৃবিরোধ'-এর কারণ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে 'সাধক সিদ্ধ পুরুষেরা' বেদ ও কোরানকে অভিন্নদৃষ্টিতে দেখে ভ্রাতৃমিলনের উজ্জ্বল ক্ষেত্রের ভিত্তি নির্মাণ করে থাকেন। নির্দিষ্ট কোন ধর্মসঞ্জাত ধর্মপ্রচারকের ব্রতচর্যার বিপরীতে এ ধরনের সহিষ্ণুতা, সমদৃষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধের উৎসকেন্দ্র থেকে হরিনাথের ধর্মবোধ উৎসারিত হয়েছিল। এই একই ভাবের ভাবুক ও সমদর্শী হিসেবেই তিনি লালন ফকিরকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়গত চিন্তাভাবনার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে আপামর মানুষের কল্যাণব্রতিতাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং পালনীয় ব্রত হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আর এই সূত্রে দেখা গিয়াছে লালন ছাড়াও আরও বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান ভক্ত সাধকের প্রশংসা তিনি করেছেন আন্তরিকভাবেই। এদের প্রতিও যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। সাধক সোনাবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে হরিনাথ লিখেছেন :

> নাম শুনিয়া অনেকেই ইঁহাকে মুসলমান কুলোদ্ভব মনে করিবেন, বাস্তবিক ইনি হিন্দুবংশোদ্ভব।....হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই তাঁহার নিকটে সমান ছিল।[১৪]

এছাড়া ফকির করিম সা, মহম্মদ সা, নবু ফকির প্রভৃতি সাধকের কথাও তিনি সশ্রদ্ধায় উল্লেখ করেছেন। নবু ফকির সম্পর্কে হরিনাথ লিখেছেন :

> ....নবু জাতিতে জোলা....। নবু সা স্বহস্তে দরগা ও দুর্গাবাড়ী পরিস্কার করিতেন। যাহাতে উক্ত স্থান পবিত্র থাকে, সে বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। দরগা ও হরির আসনে তাঁহার যে অভিন্ন জ্ঞান ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, দরগার উপরে তিনি যেমন একখানি ঘর তুলিয়াছিলেন; তদ্রূপ হরির আসনও একখানি ঘরের দ্বারা আবৃত করেন।....নবু ফকীর অন্যান্য সাধকের ন্যায় এ বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে কি দুর্গাবাড়ী কি গাজির দরগা, ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার হিংসা করা অবিধি।[১৫]

সামাজিক ন্যায়, সমদৃষ্টি, অহিংসা ভ্রাতৃভাব, অসাম্প্রদায়িকতা, অবিরোধ এবং শান্তি ছিল হরিনাথের কাছে একান্তই প্রার্থীত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। সমস্তরকম সংকীর্ণতা ও সম্প্রদায়গত চিন্তাভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি দৃষ্টি-ঔদার্যে মানবিকতার সঙ্গীত রচনা করতে চেয়েছিলেন। কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় গণ্ডি তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তিনি মুসলমান ফকিরের সঙ্গে কখনও নেচে নেচে গেয়েছেন :

ওরে মন পাগলা রে, হরদমে আল্লাজির নাম নিও।
ওরে দমে দমে নিও নাম, কামাই নাহি দিও।।[১৬]

আবার কখনও অন্যত্র গেয়েছেন :

যিনি সেই মসজিদ গীর্জায়, ব্রাহ্মসভার শ্মশানে কি গাছের তলে
তিনি মোহন্ত আখড়ায়, তুলসীতলায় সর্ব্বস্থানে, ভূমণ্ডলে।।[১৭]

'ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়'[১৮] বলে হরিনাথ মনে করতেন। ভেদজ্ঞান রহিত হলে ভক্ত হওয়া সম্ভব। আর স্বভাবতই ভেদজ্ঞানশূন্য এহেন ভক্তের মধ্যে সম্প্রদায়গত বা বৈষম্যমূলক কোন ভাব আর থাকে না। এই ভক্তের ভক্তিমার্গিতার মূলে ক্রিয়াশীল থাকে এক 'প্রেমরতন'। এই প্রেমের উন্মাদনায় লালাবাবু ফকির হয়েছিলেন, রাজা রামকৃষ্ণের রাজত্ব সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটেছিল। এই 'প্রেম মহিমায়' তুলসীদাস, নানক প্রকাশ করেছিলে। তাঁদের দর্শনবৈভব। 'এ প্রেম যার আছে' তার কাছে সোনা আর সীসা সমান হয়ে যায়, 'বিষয় অহঙ্কার' তার আর থাকে না।[১৯]

রামকৃষ্ণের মতো মন-মুখ এক-করার কথাও হরিনাথ বলেছেন। 'বাহিরে ধার্ম্মিকতা ও মনে নাস্তিকতা'-কেই[২০] তিনি কপটাচারিতার লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। অন্যদিকে অপরের 'ধর্ম্মশাস্ত্রনিন্দা ও তাহার সেবায়িতদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন'[২১] করাকে তিনি অত্যন্ত বিগর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। এছাড়া, হিন্দুদের 'একজন ঈশ্বর', মুসলমানদের এবং খ্রিস্টানদের আলাদা আলাদা ঈশ্বর আছে, এই হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা মৃত্যুর পর আলাদা আলাদা পরলোকে গমন করে থাকেন, এই আলাদা আলাদা ধর্মীয়দের এই আলাদা আলাদা ঈশ্বর তাদের 'সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা'—ইত্যাকার ধারণাকে তিনি 'নির্ব্বোধ ও মূর্খ লোকের হৃদয়ের প্রতীতি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। 'পৃথিবীর সম্রাট্ ও রাজাগণ যেমন ছোটবড় ও পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানদিগের সৃষ্টিকর্তার মধ্যেও সেইরূপ ছোটবড় ও বিবাদ বিসম্বাদ' করে থাকেন, এ জাতীয় ধ্যানধারণাকে হরিনাথ রীতিমতো বিদ্রূপ করেছেন।[২২]

কাঙাল জীবনীকার জলধর সেনের 'ঈশ্বর আকার না নিরাকার' শীর্ষক প্রশ্নের উত্তরে হরিনাথ বলেছিলেন :

> আগে বানানটা ভাল করে শেখ। প্রথমে বানান করতে হবে দন্ত্য নয়ে দীর্ঘ ই কার 'নী'....নীরাকার, অর্থাৎ জলের আকার। জল যেমন পাত্রে রাখবি, সেই আকারে হবে, তিনিও তাই। এই দীর্ঘ ই কার...নাড়াচাড়া করতে করতে দেখতে পাবি সে দীর্ঘ আর নেই, কেমন করে হ্রস্ব হয়ে গিয়েছে, 'নিরাকার' হয়েছে। তারপর আরও নাড়াচাড়া করবি....দেখবি যে হ্রস্বও আর নাই, একেবারে 'নরাকার'।[২৩]

হরিনাথ এই 'নরাকার' ঈশ্বরসাধনাতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর ধর্মবোধের মানবিক দিকটি এখানেই নিহিত।

তবে মনে প্রাণে আস্তিক্যবাদী হরিনাথ নাস্তিকতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। যা কিছু 'সৎ' তাকে তিনি নাস্তিক্যের সঙ্গে এবং যা কিছু 'অসৎ' তাকে নাস্তিকতার সঙ্গে একাসনে বসিয়েছিলেন। সৎ → সত্য → ঈশ্বর, এই ছিল তাঁর সরল সমীকরণ। এর বিরোধী অর্থাৎ অসৎ → অসত্য → নিরীশ্বর এই ছিল তাঁর উপপাদ্য। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

> ....যাহাতে সত্য নাই, তাহাই অসৎ। সত্যই ঈশ্বর সুতরাং যাহাতে সত্য নাই, তাহাই অসৎ। সত্যই ঈশ্বর, সুতরাং যাহাতে ঈশ্বর নাই তাহাই অসৎ। নাস্তিকেরা যে 'নাই' বলেন, তাহাও ঈশ্বর নাই, অতএব তাহাও অসৎ।[২৪]

হরিনাথ এহেন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নাস্তিকতা ও অসততাকে সরল সমীকরণে এনে একাকার করে দেখেছেন এবং বস্তুবাদী দর্শনের বিরোধিতা করেছেন।

আস্তিক্যের সঙ্গে সততার বিষয়টি মান্যতা পেলেও নাস্তিক্য ও অসততার সরল সমীকরণ হরিনাথের দৃষ্টি-বিভ্রমের পরিচায়ক। এই দৃষ্টিবিভ্রমতা যুক্তি-দৈন্য এবং সংকীর্ণতার প্রকাশ-পরিচয়ে হরিনাথের ধর্মবোধের অস্তিবাচক দিকটিকে খণ্ডিত করে। হরিনাথ এক জায়গায় লিখেছেন :

> উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, বেদ পূর্ব্বকালীয় কৃষকদিগের রচিত গীত এবং একদা একটী মহিষ আখের ভুঁই নষ্ট করিত। হিমালয় প্রদেশের কোন রাজকন্যা সেই সময়ে একটি সিংহ পুষিয়াছিলেন। কৃষকদিগের প্রার্থনায় তিনি সিংহিতে চড়িয়া মহিষ বধ করেন, ইহাই মহিষাসুরবধের বৃত্তান্ত। শিব ধাঙ্গড়জাতীয় জনৈক বীরপুরুষ ছিলেন। গিরিরাজ তাঁহাকে আপনার বশে রাখিতে কন্যা পার্ব্বতীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি রচনা....শাস্ত্রতত্ত্ব ও তাহার মর্ম্মার্থ অজ্ঞাতরূপ অজ্ঞানতার ফল.... ।[২৫]

মহিষাসুর ও শিব-পর্ব্বতী সম্পর্কে এধরনের একটি লোকগাথার অন্তর্বস্তু যেহেতু প্রচলিত শাস্ত্রাখ্যানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে না, হরিনাথ এই লোকগাথার রচয়িতাদের শাস্ত্রতত্ত্ব ও তার মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম বলে অভিহিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই হরিনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে সংকীর্ণতার বেড়াজাল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির শাসন এখানে খণ্ডিত, তাঁর যুক্তির সহজপাচ্যতা এখানে বিরোধাভাষে প্রকটিত হওয়ার নিয়তিকে এড়াতে পারেনি। যে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে, সুস্থ ধর্মবোধের জায়গা থেকে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন, সেই প্রতিবাদী এবং বিবেকী কণ্ঠস্বর এখানে তার সুস্থ ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই স্ব-পক্ষপাতিতা যে হরিনাথকে স্বস্তি দেয়নি, তা বলাইবাহুল্য। আস্তিক-নাস্তিক বিবাদে তিনি নাস্তিকের বিরুদ্ধবাদী অবস্থান নিলেও, পরে যখন উপলব্ধি করেছেন যে আস্তিকের সঙ্গে নাস্তিকের দ্বন্দ্ব নয়, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের দ্বন্দ্বই প্রধান সমস্যা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে,[২৬] তিনি বিবিধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেকার

মতান্তরজনিত সঙ্কটকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে অমোঘ উচ্চারণে ঘোষণা করেছেন :

> এখানকার ব্যবসায়ী গুরুগণের মন্ত্রদান, জমীদারের জমীদারী রক্ষা, মহাজনের ব্যবসায় এবং শিষ্যের মন্ত্রগ্রহণ সামাজিক নিয়মরক্ষা হইয়া উঠিয়াছে।[২৭]

এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। এরপর লিখেছেন :

> সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়ী গুরুগণ যে ভেদজ্ঞানের মূল স্থাপন করিয়াছেন, এবং এখন পর্যন্ত যাহার মূলে জলসেচন করিতেছেন, তাহা লোকের প্রতি এরূপ গরলস্বরূপ হইয়াছে যে, লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও মহাজনের পথবর্ত্তী হইয়া সাধন, ভজন ও শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন করিয়াও কেবল ভেদজ্ঞানের নিমিত্ত অকৃকার্য্য হইতেছে।[২৮]

হরিনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আবার অন্যমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধের শাসনে শাসিত হরিনাথ এখানে যেন আবার স্বমহিমায় প্রকাশিত হন। মানবিক বোধের আন্তরিক উচ্চারণে তিনি বলেন :

> মরমের মরমী না হইলে, আত্মার আত্মীয় না হইলে কে এমন আছে যে, আত্মার বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারে?[২৯]

বাস্তবিক, মরমের মরমী ও আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠার অনুধ্যানে হরিনাথ তাঁর মানবহিতের ব্রতচর্যার বিষয়টিকে অনুশীলনে নিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রভূমি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে বাউল গান ও সাধকজীবনের অভিনিবেশে তন্নিষ্ঠ হলেও হরিনাথ মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য ব্যতিরেকে স্বস্তির সন্ধান পাননি। বাউল গান ও গানের দল নিয়ে তিনি গ্রামজীবনের অন্তঃস্থলে নেমে গিয়েছিলেন। অত্যাচারী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণমনা, ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের কবল থেকে প্রপীড়িত মানুষজনকে উদ্ধার করার চেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমৃত্যু তাঁর চিন্তাভাবনা সক্রিয় থেকেছে সমাজের গরিষ্টসংখ্যক মানুষজনের স্বার্থরক্ষার্থেই। তাঁর ধর্মসাধন বা ধর্মবোধ আবর্তিত হয়েছিল এই জনমানুষের কল্যাণব্রতে। সমসময়ের ধর্মপ্রচারক ও ধার্মিকদের জীবনচর্যা ও আচার আচরণের পাশাপাশি হরিনাথের ধর্মদর্শন ও জীবনাচরণ তাঁকে অনেক বেশি মানবিক মহিমায় ভূষিত করেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিশেষতঃ বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশে মানবমুক্তির সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পথের সন্ধান হরিনাথ পাননি, একথা যেমন সত্য, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাক্ষেত্র সত্ত্বেও সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষজনের জন্য তাঁর চিন্তাচর্চার মূল্যও অপরিসীম।

## তথ্যপঞ্জি

১। জলধর সেন। প্রাগুক্ত। প. ৪৭-৫০

২। বিশ্বনাথ মজুমদার : পল্লীপ্রাণ মহাত্মা কাঙাল হরিনাথের ৭৪তম সাম্বৎসরিক স্মৃতি মহোৎসবের স্মারকপত্র। প্রাগুক্ত। পৃ. ২

৩। বিশ্বনাথ মজুমদার : প্রাগুক্ত

৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। আষাঢ়, দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (জুন ১৮৭২)। পৃ. ১

৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ২

৬। হরিনাথ গ্রন্থাবলী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮৪-৮৫

৭। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ, অষ্টম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কুমারখালি। শ্রাবণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২৬১

৮। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৬১

৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯২ (পাদটীকা)।

১০। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯২

১১। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা। কুমারখালি। মাঘ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৬৫

১২। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা। কুমারখালি। বৈশাখ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১২৬

১৩। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৬২

১৪। কাঙাল হরিনাথ : মাতৃমহিমা। কুমারখালি। বাঙলাদেশ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ১১

১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯

১৬। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৬

১৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৭

১৮। জলধর সেন। কাঙাল হরিনাথ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা। ১৩২১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫৬

১৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৬-৫৭

২০। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। চতুর্থভাগ। প্রথম সংখ্যা (প্রথম পৃষ্ঠা ও আখ্যাপত্র না থাকায় প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি)। পৃ. ১৬

২১। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯২

২২। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮৭

২৩। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০৭

২৪। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা। কুমারখালি। বৈশাখ। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১১৪

২৫। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। চতুর্থ ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৩ (পাদটীকা)

২৬। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯২

২৭। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ। সপ্তম সংখ্যা। কুমারখালি। বৈশাখ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২০০

২৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০০

২৯। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা। কুমারখালি। আষাঢ় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৪৪

# বাঙলা সাহিত্যে হরিনাথের দান : প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

হরিনাথ তাঁর সাহিত্যরচনার আদর্শ হিসেবে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছেই সবচাইতে বেশি ঋণী একথা বলাইবাহুল্য। তাঁর কবিতায় গুপ্ত কবির প্রকট প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি যে তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করতেন তার দুটো নির্দিষ্ট নজির হাজির করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকরের পাতায় 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' শীর্ষক যে মূল্যবান তথ্যভিত্তিক রচনাগুলি লিখছিলেন, তা নিঃসন্দেহে হরিনাথকে প্রাণিত ও উৎসাহিত করেছিল। তিনিও পরবর্তীতে তাঁর গ্রামবার্তায় ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিজীবনী রচনা করে (রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রমুখ) বাঙলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছিলেন। হরিনাথ গুরুর প্রদর্শিত পথানুসরণে বিভিন্ন সাধকদের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'মাতৃমহিমা' শীর্ষক গ্রন্থে। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিতোপদেশ বা কথামালা-র অনুসরণে হরিনাথ 'স্বরূপকথা' রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই 'স্বরূপকথা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

> পাঠকগণ! আপনারা ছেলেবেলায় দিদিমার ক্রোড়ে শুইয়া বাঘ, ভালুক, শেয়াল কুকুর ও রাজাগজার কত রূপকথা শুনিয়াছেন,....। ....আমাদিগের স্বরূপকথা একবার পাঠ করুন, ইহাতে আমোদ হউক বা না হউক, দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছু কিছু জানিতে পারিবেন।[১]

এখানে একটা বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা পায়, তা হলো ছোটবেলায় যাঁরা দিদিমা প্রভৃতির কোলে শুয়ে রূপকথা বা বাঘ ভালুকের গল্প শুনেছিলেন, তাঁরা এখন প্রাপ্তবয়স্ক। হরিনাথ সেই শৈশবে-শোনা রূপকথা ইত্যাদির শ্রোতাদের এখন 'স্বরূপকথা' শোনাতে চান। অর্থাৎ হরিনাথ 'স্বরূপকথা' শোনাতে চাইছেন শৈশব-কৈশোর-উত্তীর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের। বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করলেও হরিনাথ শিশুদের জন্য 'স্বরূপকথা' লেখেননি। এই 'স্বরূপকথা'য় হরিনাথ কি বলতে চেয়েছেন তাও পরিস্কারভাবে বিবৃত করেছেন :

> চিকিৎসক যেমন রোগনির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তদ্রূপ রাজাও রাজ্যের প্রকৃতাবস্থা জানিতে না পারিলে এবং সমাজপতি সমাজের যথার্থ দোষ দেখিতে না পাইলে, দেশের ও সমাজের কোন উপকারই করিতে পারেন না। আমরা নানা আশঙ্কায়

> পশুপক্ষী ও বনবাসী চাষাদি মানুষের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া 'স্বরূপকথা' প্রকাশ করিতেছি। যদি এ দেশের ও দেশীয় সমাজের কেহ ব্যথায় ব্যথিত থাকেন, তাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক আমাদিগের 'স্বরূপকথা' পাঠ করুন, দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন।[২]

সত্য কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে গেলে সেসময় প্রপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তবু সত্য কথা প্রকাশ করা প্রয়োজন 'দেশ-রক্ষা'র স্বার্থে। এ হেন পরিস্থিতিতে হরিনাথ 'নানা আশঙ্কা'র কারণে সরাসরি না লিখে 'পশুপক্ষী ও বনবাসী চাষাদি মানুষের স্কন্ধে দোষ' চাপিয়ে 'স্বরূপকথা' প্রকাশ করেছিলেন। এই 'স্বরূপকথা'য় 'বকা ও বকী', 'শালবৃক্ষ ও কুঠার' এবং 'ক্ষুদিরাম শর্ম্মা'-র কাহিনিগুলি সমসময়ের সামাজিক ক্ষতসমূহের তথ্যঋদ্ধ প্রতিফলন।

তবে বাঙলা সাহিত্যে হরিনাথ একটি নতুন অবদান রেখে গিয়েছেন, তা হলো সাহিত্যরচনার যৌথপ্রয়াসের বিষয়টি। একটি গান গীত হয়ে শ্রোতার দরবারে পৌঁছানোর আগে তা অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াসের সম্পর্কস্রোতে প্রবাহিত হয়ে একটি অখণ্ড উপস্থাপনা নিয়ে হাজির হয়। একজন গীতিকার, একজন সুরকার, একজন গায়ক এবং অন্যান্য বাদকদের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি গান গীত হয়ে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছায়। এ ক্ষেত্রে প্রয়াসের যৌথতা লক্ষ্য করা যায়। সংবাদ-সাময়িকপত্রও যৌথপ্রয়াসের ফল। কিন্তু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যৌথপ্রয়াস একটি নতুন বিষয়, অন্ততঃ উনিশ শতকের শেষপাদে তো বটেই। গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-সংগঠক হরিনাথ যৌথ প্রয়াসেই তাঁর কর্ম্মসূচনা করেছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিচালন, ছাত্র ও বন্ধুবর্গের সহযোগিতায় পত্রিকা পরিচালন, যৌথপ্রয়াসে বাউলদল নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যাওয়া প্রভৃতির বাস্তব অনুশীলন হরিনাথকে যৌথ-সাহিত্যরচনার চিন্তায় উদ্বোধিত করেছিল। বিষয়টির যে তিনি একটি সুচিন্তিত তত্ত্বায়ন করতে পেরেছিলেন, তা নয়। এ সম্পর্কে যে তাঁর স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল, এমনটিও মনে হয় না। তবে ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টিই অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামবার্তার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় হরিনাথ 'হীন' ছদ্মনামে একটি নাটক প্রকাশ করেন। নাটকটির নাম 'পতনহৃদ অথবা নাটকান্তর নাটক'। এই নাটকের এধরনের অদ্ভুত নামকরণ সম্পর্কে হরিনাথ সচেতন ছিলেন। তিনি পাঠকের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন: তাঁরা যেন এই নাম শুনে 'ঘৃণা' বোধে নাটকটি 'অপাঠ্য' মনে না-করেন। 'মনোনিবেশ পূর্ব্বক' একবার পড়লে এর মধ্যে কিছু পেতে পারেন।[৩] পত্রিকার এই সংখ্যাতে নাটকটির ২টি সূত্র (প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র মুদ্রিত হয়। নাটকটি অসম্পূর্ণ। নাটকের মুদ্রণাংশের শেষে হরিনাথ লিখেছিলেন :

> আমি মস্তিষ্কের পীড়ায় যেরূপ কাতর হইয়াছি তাহাতে উপক্রমণিকার অনুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইব বোধ হয় না, যদি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারি,

> সাধারণত দুই একটি দৃশ্য প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব। অতএব পাঠকগণের সমীপে আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, যদি কেহ কোন দৃশ্য লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন, তবে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা গ্রহণ এবং তাঁহার নাম সম্বলিত এই প্রবন্ধের যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও প্রকাশ করিব।[8]

এখানে হরিনাথের বক্তব্য থেকে যা প্রতিভাত হয় তা হলো—(১) নাটকটির উপক্রমণিকার 'অনুরূপ' কাজ তিনি করে উঠতে পারবেন, এ সম্ভাবনা কম, (২) 'মস্তিষ্কের পীড়া' থেকে কিছুটা 'সুস্থ' হতে পারলে তিনি বড়জোর ২/১টি 'দৃশ্য' রচনা করতে চেষ্টা করবেন, (৩) স্বভাবতই নাটকটি সম্পূর্ণ লিখে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং (৪) এজন্যই তিনি আবেদন জানাচ্ছেন, যদি কেউ নাটকটির 'কোন দৃশ্য' লিখে পাঠান, তবে তিনি 'কৃতজ্ঞতা সহকারে' তা গ্রহণ করবেন এবং নাটকটির 'যথাস্থানে' লেখকের নাম সহ তা 'সন্নিবেশিত' করে 'প্রকাশ' করবেন।

একটি নাটক রচনার ক্ষেত্রে হরিনাথ অন্যকেও অংশীদার করতে চাইছেন প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে, উনিশ শতকের আশির দশকের প্রথম পর্যায়ে এ ঘটনার অভিনবত্ব সম্ভবত প্রশ্নাতীত। নিজের রচনার সঙ্গে অন্যের রচনার সম্মিলন ঘটিয়ে যৌথ সাহিত্যসৃজনের এই আকাঙ্ক্ষা বাঙলা সাহিত্যে নতুন।

হরিনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই নাটকের 'কোন দৃশ্য রচনা করতে কেউ না-আসলেও, হরিনাথের আহ্বান ও তাঁর যৌথ সাহিত্য রচনার মানসিকতার মূল্য কমে না। তবে অন্যত্র এই যৌথরচনার সাক্ষ্য হরিনাথের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ'-এর চতুর্থ ভাগ এর 'বিবিধতত্ত্বসারযোগ' শীর্ষক অধ্যায় প্রসঙ্গে হরিনাথ যা লিখে গিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন :

> আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এতদ্ ব্রহ্মাণ্ডবেদে লিখিত 'যোগতত্ত্ব' প্রবন্ধের যে যে স্থান অসম্পন্ন ও অপরিস্ফুট হইয়াছিল, কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের অন্যতম ফকীর এবং ব্রহ্মাণ্ডবেদের সহকারী শ্রীযুক্ত দানবারিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আদিষ্ট হইয়া সেই সকলস্থান সম্পন্ন ও পরিস্ফুট করিয়া 'বিবিধতত্ত্বসারযোগ' এই প্রবন্ধটির প্রথম 'যোগ কাহাকে বলে' হইতে অষ্টম অধ্যায় হঠযোগ পর্য্যন্ত লিখিয়া উপকৃত করিয়াছেন।
>
> কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রচারক—কুলকুণ্ডলিনী
> গুরুসার মুটে
> কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকীর।[৫]

হরিনাথের এই স্বীকৃতি থেকে এই তথ্যই প্রতিষ্ঠা পায় যে, ব্রহ্মাণ্ডবেদের চতুর্থ ভাগের 'বিবিধতত্ত্বসারযোগ'-এর প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত 'হঠযোগ' অবধি মুদ্রিত ৪৪ পৃষ্ঠার (৩০৭ পৃষ্ঠা থেকে ৩৫০ পর্যন্ত) রচনাকার দানবারিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। হরিনাথ দানবারিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার এই বিস্তৃত অংশ 'কৃতজ্ঞতা

সহকারে' স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন এবং যৌথরচনার অনুশীলনগত তথ্য রেখে গিয়েছেন।

অন্যের রচনা আত্মসাৎ করে নিজের বলে চালানোর মানসিকতা হরিনাথের ছিল না। যৌথ প্রয়াসে সবার স্বীকৃতি তিনি সমানভাবে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডবেদের বিভিন্ন খণ্ডে তিনি অন্যের রচিত বহু গান সঙ্কলিত করেছেন এবং যথাস্থানে তার রচয়িতার নামও যথাযথভাবেই উল্লেখ করেছেন আন্তরিক সততার সঙ্গেই। তাঁর গানের দলের কোন গানের পিতৃত্ব নিয়ে কখনও কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। অনেকে অনেক সময় হরিনাথের বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের রচয়িতা হরিনাথ নন বলে 'শোনা যায়', 'কেহ কেহ বলেন' জাতীয় মন্তব্য করেছেন, এমনকি হরিনাথের কিছু কিছু গানের রচয়িতা হিসাবে প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও করেছেন।[৬] এমনকি হরিনাথের সুবিখ্যাত 'ওহে দিন ত গেল সন্ধ্যা হল' গানটির রচয়িতা প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন।[৭]—'বাঙালীর গান'-এ এধরনের প্রচারণা রেখেছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ী। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে। হরিনাথের মৃত্যুর নয় বছর পর। এর আগে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (১৯০১ সাল) প্রকাশিত 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগ-এ 'দিন ত গেল' গানটি সঙ্কলিত হয়েছিল। এরপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত'-এ ১৭৭ সংখ্যক গান হিসেবে 'দিন ত গেল' গানটি প্রকাশ করে[৮] উক্ত প্রচারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশ জলধর সেন লিখেছেন : 'কাঙালের অসংখ্য গীতের মধ্যে অল্প কয়েকটিই এই খণ্ডে দিতে পারিলাম।' এই গ্রন্থে প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গানও সঙ্কলিত হয়েছে। সেটি সঙ্কলনের ১৮৬ নম্বর গান। নিচে পাদটীকাও দেওয়া হয়েছিল।[৯]

হরিনাথ তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য কোন সরকারি পুরস্কার বা শিরোপা পাননি। স্বগৃহীত 'কাঙাল' অভিধা নিয়ে কাঙালের মতোই তিনি জীবন যাপন করেছেন। মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে কাঙালিপনা করেছেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে 'কাঙাল' শব্দের অবমূল্যায়ণ করেননি। বরং 'শ্মশানেশ্বর পশুপতি'র জীবনাচরণে 'কাঙাল' শব্দের দ্যোতনা সন্ধান করেছেন। হরিনাথের সাহিত্যশিষ্যদের মধ্যে জলধর সেন 'রায়বাহাদুর'[১০] এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যথাক্রমে 'সি. আই. ই.' এবং 'কাইজার-ই-হিন্দ'[১১] শিরোপায় ভূষিত হয়েছিলেন।

হরিনাথ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পারিতোষিক পেয়েছেন, এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্বীকারও করেছেন। এরকম কয়েকটি নিদর্শন:

(১) কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া মৎ প্রণীত বিজয়বসন্ত পুস্তক পাঠ করিয়া দশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

(২) কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পুঁটিয়ারীশ্বরী শ্রীযুক্ত রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহোদয়া মৎ প্রণীত, কবিতা কৌমুদী, পদ্যপুণ্ডরীক, বিজয়া ইত্যাদি পাঠ করিয়া তাহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ের নিমিত্ত ১০ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রী হরিনাথ মজুমদার।[১৩]

(৩) কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার প্রণীত ও কুমারখালী গীতাভিনয় সভা দ্বারা প্রকাশিত অক্রূরসংবাদ (গীতাভিনয় বা যাত্রা) গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাশীমবাজার নিবাসিননী দীনপালিনী শ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ১০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।[১৪]

(৪) কুমারখালী নিবাসী হরিনাথ মজুমদার কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছেন পুঁটিয়া নিবাসিনী অনাথমাতা শ্রীযুক্ত রাণী শরৎসুন্দরী দেবী, অক্রূরসংবাদ গীতাভিনয় পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ৫ পাঁচ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।[১৫]

(৫) স্থানীয় সংবাদ

কুমারখালী নিবাসী হরিনাথ মজুমদার কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছেন, তাঁহার রচিত 'চিত্তচপলা' নামে একখণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়া পুঁটিয়া নিবাসনী শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যার্থে ৫ পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছেন।[১৬]

হরিনাথের সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার বলতে যা, তা এইটুকুই। তিনি কখনও কোন সরকারি খেতাব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করতেন না। আত্মপ্রচারবিমুখতাও তাঁকে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা-না-দেওয়ার পক্ষে একটি শর্ত সৃষ্টি করেছিল। নিজের প্রচার বা প্রচারণার কথা উঠলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতেন। তাঁর স্বগৃহীত 'কাঙাল' অভিধা তাঁর সুচিন্তিত অভিব্যক্তির ফল। নিজে কাঙাল হয়েই প্রপীড়িত মানুষের কল্যাণব্রতে অভিনিবিষ্ট থাকতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। স্বভাবতই সরকারি পুরস্কার, খেতাব বা শিরোপা সম্পর্কে কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁর ছিল না। তাঁর বিভিন্ন পুস্তকপাঠে যাঁরা তাঁকে যেটুকু অর্থসাহায্য করেছেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। কাঙাল-শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:

> সংসারে থাকিয়াও যদি ঋষিত্বলাভ সম্ভব হয়, তবে তিনি ঋষি আখ্যালাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। তিনি ধনবান ছিলেন না; সেই জন্যই সম্ভবত তিনি 'ঋষি' খেতাব লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গৌরবপূর্ণ 'কাঙাল' খেতাবে

কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

হরিনাথের এই কাঙাল অভিধা সাধারণের নিকট 'মহর্ষি' বা 'রাজর্ষি' খেতাবের অপেক্ষা অল্প গৌরবের, অল্প আদরের পরিচয় নহে। কাঙাল খেতাব আমাদের এই কাঙাল দেশে অগৌরবের খেতাব নহে। কাঙাল আমাদের শ্মশানেশ্বর পশুপতি![১৭]

এই দীনেন্দ্রকুমার রায় অন্যত্র আবার বলেছেন : পৃথিবীতে যাঁরা মানবসমাজের কল্যাণব্রতে 'জীবন উৎসর্গ' করেছেন, তাঁরা কোনদিন 'অর্থচিন্তায় আত্মনিয়োগ' করতে পারেননি; নিদারুণ দারিদ্র্য এবং 'দাম্ভিক ধনাঢ্যের নিদারুণ অবজ্ঞা' সামাজিক নেতৃবৃন্দের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ তাঁরা নীরবে সহ্য করে আত্মকর্মে অবিচল থাকেন। এঁদের এই 'লাঞ্ছনা-বিড়ম্বিত মস্তকে' যে যশের মুকুট 'বিধাতা' সংস্থাপিত করেন তা 'স্বর্ণমুকুট নহে, কণ্টকমুকুট'। হরিনাথ এই কাঁটার মুকুট লাভ করেছিলেন।[১৮]

অথচ সৎ সাংবাদিকতার এ হেন পথিকৃৎ, সাহিত্যকর্মকে লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে সুস্থ রুচির বিকাশের প্রয়াসী, বাউলগানে দেশমাতানো হরিনাথ সমসময়ে বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমাদর লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এক চরম ও মর্মান্তিক উপেক্ষা হরিনাথকে অনবরত অনুসরণ করেছিল। তাঁর 'বিজয়বসন্ত' সমসময়ে অসম্ভব সমাদরলাভে সমর্থ হলেও, বিজয়বসন্ত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকমহলে আলোচনার বিষয় হতে পারেনি।

'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথ ঘোষের 'বিজয়বল্লভ'-এর দীর্ঘ আলোচনা[১৯] হলেও হরিনাথের বিজয়বসন্ত আলোচনার অধিক্ষেত্রে স্থান পায়নি। বিদ্যাসাগরের রচনা-চিঠিপত্রাদির কোথাও হরিনাথ প্রসঙ্গ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র-কালীপ্রসন্ন ঘোষ-নবীনচন্দ্র সেন-ভূদেব মুখোপাধ্যায়-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কারোরই লেখাপত্রে কোথাও হরিনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখিত হয়নি। অথচ ভূদেব মুখোপাধ্যায় হরিনাথকে জানতেন তিনি হরিনাথের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন বিদ্যালয় সম্পর্কে।[২০] জলধর সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় হরিনাথের বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন, সেসময় 'হরিনাথকে অন্তর্বর্তী করে ভূদেববাবু' জলধরদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেছিলেন, হরিনাথের আবেদন অনুমোদন করে ভূদেব কবিতা আবৃত্তি শুনতে রাজি হয়েছিলেন, এবং হরিনাথের নির্দেশে জলধর সেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মিত্রবিলাপ' কাব্য থেকে একটি আবৃত্তি করে ভূদেবের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[২১] কিন্তু তিনিও হরিনাথ বা তাঁর সাহিত্যকৃতী নিয়ে কোন মতামত কখনও প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না।

উনিশ শতকের সবচেয়ে বৃহদাকার আত্মজীবনী-রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেনও হরিনাথ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। রাজনারায়ণ বসুর-লেখাতেও হরিনাথ উপেক্ষিত। তিনি

গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ'-কে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের সম্মান দিলেও, হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর আলোচনা করেননি। তিনি লিখেছেন :

> শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের স্বসম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস বিনিসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয়বল্লভ', কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা আমাদিগের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস বিভাগে অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।....তাঁহার ন্যায় উপন্যাস রচয়িতা বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।[২২]

প্যারীচাঁদ থেকে গোপীমোহন-ভূদেব হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত রাজনারায়ণের আলোচনা উপন্যাস প্রসঙ্গে বিস্তারলাভ করেছে, অথচ হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত'-এর নাম সেখানে অনুচ্চারিত।

রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে (১৭৯৫ শকাব্দ)। বিদ্যাসাগরের 'অনুরোধক্রমে' লিখিত মূল্যবান ও বিপুল পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থেও হরিনাথ বা তাঁর সাহিত্যকর্মের কোন উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে হরিনাথের অনুল্লেখ বিস্ময়কর। এই গ্রন্থের চতুর্থ বা শেষ পরিচ্ছেদে 'ইদানীন্তনকালে প্রাদুর্ভূত' লেখকদের মধ্যে থেকে 'কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহাশয়ের বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা' লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন করেছেন। এইসব লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির নাম থাকলেও হরিনাথের নাম নেই।[২৩] এই গ্রন্থের শেষে 'জীবিত ও মৃত কতিপয় গ্রন্থকারের নাম ও গ্রন্থপরিচয়' দেওয়া হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, সেখানেও হরিনাথ অনুল্লেখিত।[২৪] ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের সংযোজিত অংশের একস্থানে অবশ্য 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' ও তার সম্পাদক হিসেবে হরিনাথের নাম উল্লেখিত হয়েছে।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদে লিখেছেন :

> কোথায় গেল এই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেইসব বালকভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজব দুন্নতধ্বনিঃ'।....[২৬]

'বঙ্গদর্শন'-এর আগে 'বিজয়বসন্ত'-এর জনপ্রিয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে স্বীকার করেছেন, যদিও একে 'বালক ভুলানো কথা' বই আর তিনি কিছু বলেননি। অন্যত্র তাঁর 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' শীর্ষক আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যখন পদ্যপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছে, আমি কবি বলিতেছি না ও কবিতাচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবুকে আমি কবি বলিতেছি, তুমি বলিতেছ না, তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, রামবাবু কী এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?....[২৭]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যাংশে উল্লিখিত 'পদ্যপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবু' কি হরিনাথ? কারণ, 'পদ্যপুণ্ডরীক' হরিনাথের রচিত কাব্যপুস্তিকা। ৪২ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে (১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথ এই 'পদ্যপুণ্ডরীক'-এর কবির নালোল্লেখ না করে 'রামবাবু' কেন বললেন বোঝা গেল না। তবে রবীন্দ্রনাথ যে 'পদ্যপুণ্ডরীক'-এর কবিকে কবি বলে স্বীকার করেননি, তা এখানে স্পষ্ট। হরিনাথের 'পদ্যপুণ্ডরীক' প্রকাশের দীর্ঘ ১৮ বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়)। 'পদ্যপুণ্ডরীক' প্রকাশের অব্যবহিত পরে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ২৯ পৌষ, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[২৮] তবে হরিনাথের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ হরিনাথের সাতটি(৭) গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে 'বিজয়বসন্ত'-ও ছিল।[২৯]

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে দু'বার মাত্র হরিনাথ ও তাঁর বিজয়বসন্তের কথা উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি বলেছেন 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়বসন্ত'-ই হলো 'বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।'[৩০] অন্যত্র আবার বিজয়বসন্তকে 'সেকেলে' আখ্যা দিয়েছেন। তবে 'বিজয়বসন্ত' যে তিনি ও অন্যেরা আগ্রহ ভরে পাঠ করতেন, সে কথা স্বীকার করেছেন।[৩১] এছাড়া শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় হরিনাথ আর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবেশাধিকার পাননি। অথচ বাঙলার শিক্ষক হিসাবে হরিনাথ যে সেকালে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন, সেকথা শিবনাথ জানতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক শিবনাথ বাঙলায় প্রথম হতে-না-পারায় জলধরকে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন যে সে বাঙলায় প্রথম না হতে পেরে শিক্ষক হরিনাথের নাম ডুবিয়েছে।[৩২]

'ইংরাজ শাসনে বঙ্গ সাহিত্য' শীর্ষক একটি সাহিত্য সমালোচনাত্মক দীর্ঘ প্রবন্ধ 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৪-৯৫ বঙ্গাব্দে। প্রবন্ধটি ৮টি কিস্তিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয় 'নব্যভাবত'-এর মাঘ ফাল্গুন (১২৯৫ বঙ্গাব্দে) সংখ্যায়। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন শ্রী হেমনাথ মিত্র। এই দীর্ঘ

আলোচনায় হেমনাথ মিত্র সমকালে খ্যাত অখ্যাত অনেক লেখকদের নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু হরিনাথ মজুমদার সেখানে আলোচিত হননি। কেবলমাত্র অগ্রহায়ণ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় এইটুকুই লেখা হয়েছিল : 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা উঠিয়া গিয়াছে'।[৩৩] এর বেশি আর কিছু নেই। পৌষ সংখ্যায় হেমনাথ লিখেছিলেন :

> মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য যাঁহারা উপন্যাস বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছেন এস্থলে তাঁহাদের কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়ন করেন।....

এখানেও দেখা যাচ্ছে বাঙলা ভাষায় 'উপন্যাস বিভাগে' যাঁরা পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'প্রধান প্রধান ব্যক্তি'-দের মধ্যে হরিনাথ আলোচনায় স্থান পাননি। প্যারীচাঁদ বা ভূদেবকে উপন্যাস রচয়িতা বলে উল্লেখ করলেও, হরিনাথ বা 'বিজয়বসন্ত' আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক থেকেছেন।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এর এক জায়গায় হরিনাথ মজুমদারকে 'প্রসিদ্ধ ভক্ত গায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন। এরই অনুষঙ্গে তিনি লিখেছেন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে তিনি কুমারখালি অনেকবারই গিয়েছেন, কিন্তু হরিনাথের সঙ্গে তাঁর কোনবারই দেখা হয়নি।[৩৪] এইটুকুই।

সমকালে অ-ব্রাহ্ম হিন্দু ধর্মানুগত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যেমন হরিনাথ সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন, তেমনই ব্রাহ্মনেতৃবর্গ বা প্রচারকরাও হরিনাথ সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখাননি। ব্যতিক্রম ছিলেন, ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। হরিনাথের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করার পরবর্তীতেও এই সৌহার্দ্য অটুট ছিল। হরিনাথ সম্পর্কে বাঙলাদেশের সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে এই অনাগ্রহ অত্যন্ত বিস্ময়কর ও পরিতাপের, সন্দেহ নেই। অথচ, বিশেষত 'বিজয়বসন্ত', গ্রামবার্তা এবং ফিকিরচাঁদের বাউল গানের দৌলতে হরিনাথের প্রচার সমকালে যথেষ্ট ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

গান ও কবিতায় সমসময়ের অনেকের প্রভাব যেমন হরিনাথে দুর্নিরীক্ষ্য নয়, তেমনই সমসময়ের অনেকের লেখায় হরিনাথের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছায়াপাতও সহজলভ্য। লালনের সঙ্গে হরিনাথের সৌহার্দ্য উভয়েরই চিন্তাক্ষেত্রে সাযুজ্য রচনা করেছিল। **লালন ফকির** গেয়েছিলেন :

চটকে ভুলে রে মন
হারালি তুই অমূল্য রতন,
হারলে বাজী কাঁদলে তখন
আর সারবে না।

আর **হরিনাথ** গেয়েছেন :

ভোলামন কি করিতে কি করিলি
সুধা বলে গরল খেলি।
সংসারে সোনার খণি পরশমণি
রতনমণি না চিনিলি।

অন্যত্র **লালন** গেয়েছেন :

আজ বাতাস বুঝে ভাসারে তরী
তেহাটা ত্রিপীনে বড় তোড় তুফান ভারী।

আর যেন এরই অনুষঙ্গে হরিনাথ গেয়েছেন :

সংসারের মোহপাকে
মাঝি ঘুরাইছে পাকে পাকে
আমি না পারি তাকে
ডুবলাম আমি ধর তুমি।

রামমোহন রায়ের 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' গানটির সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্যে **হরিনাথ** লিখেছেন :

গেল রে দিন
ভুল হইল চিরদিন (মন রে)!
বিষয় রসে
দিন হারালি
শেষের, সে দিন নিকট দিনে দিনে।

অন্যত্র **হরিনাথ** লিখেছেন :

ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ
যার নামেতে পাষাণ গলে।
যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন
শূন্য পবন স্থলে জলে।[৩৫]

কাঙাল-শিষ্য **মশাররফ হোসেন** এর স্পষ্ট ছায়াপাতে লিখেছেন :

ভাব মন তাঁরই চরণ কর স্মরণ
যার নামেতে আগুন জ্বলে।
যিনি এই আকাশ পাতাল, হস্তী দাঁতাল,
কুড়ের চাল আর ঝাড় জঙ্গলে।[৩৬]

এরকম, **হরিনাথ** লিখেছেন :

চিরদিন এ ভাবে যাবে না রে যাবে না;
তুমি কি ছিলে, কি হলে, ভেবে দেখ না।[৩৭]

**মশাররফ** লিখছেন :

ওরে মন ভাবছ কেন অকারণ।
চিরদিন কি সমান যায় কখন।।[৩৮]

কাজী **নজরুল ইসলাম** লিখছেন :

চিরদিন কাহারো সমান নাই যায়।[৩৯]

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের কবিতা-গানেও হরিনাথের প্রভাব দুনিরীক্ষ্য নয়। কাঙাল-শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং জলধর সেনের সঙ্গে রজনীকান্তের যথেষ্ট সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হরিনাথের রচনা, বিশেষ করে তাঁর বাউল গানের সঙ্গে রজনীকান্ত সুপরিচিত ছিলেন। হরিনাথের যে ভক্তিভাব, যে আত্মনিবেদন তাঁর গানে প্রকাশ পেয়ে মূর্ত হয়েছে, রজনীকান্তের গানেও তা লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন :

> ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পন। আত্মসমর্পিত প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত সেখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি সংগীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ....রজনীকান্তের কান্ত পদাবলীও এই ভক্তি সংগীতধারার অন্তর্গত।[৪০]

রজনীকান্তের এই ভক্তমনের ওপর হরিনাথের প্রভাব বর্তমান ছিল। সত্যের প্রতি হরিনাথের যে আকুলতা, তা রজনীকান্তেও সুলভ হয়ে উঠেছে। হরিনাথ লিখেছেন, 'সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন',[৪১] আর রজনীকান্ত লিখছেন 'সত্যের সমান বল নাহি ত্রিভুবনে'।[৪২] হরিনাথ বাষ্পাকুল কণ্ঠে গেয়েছেন :

ওমা, জনমিয়ে মায়ের স্নেহ পাই নাই
মা বলিয়ে আমি সদা কাঁদি তাই[৪৩]

**কিম্বা**

মার কোলে বসে থাকি    তার পরে বাবা দেখি
মাতৃকোল আগে পাই    পিতৃ কোল মেলে তাই

*    *    *    *

মা-বাপে প্রণাম করি, গাইব বদন ভরি
মায়ের মহিমা, মার পদে মন রাখি।।[৪৪]

আর রজনীকান্ত প্রাণের ব্যাকুলতায় গেয়েছেন :

সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি করে মাকে চাব,
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায়রে সেদিন কোথা আছে!

হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, 'মা মা' বলে হব অধীর,
দুনয়েন বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙালের সাজে।[৪৫]

ভক্তকবি রজনীকান্ত এখানে সরাসরি 'কাঙালের' সাজ-গ্রহণের মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন অকপটভাবে। হরিনাথের 'দিন ত গেল সন্ধ্যা হল', কিম্বা 'দিন ত ফুরায়ে গেল' অথবা 'ওরে দিন ফুরাল সন্ধ্যা হল'[৪৬]-এর ছায়াপাত রজনীকান্তের গীতিরচনায় এসেছে এভাবে :

বেলা যে ফুরায়ে যায়
খেলা কি ভাঙে না হায়....[৪৭]

এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানেও হরিনাথের ভাবগত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুরেশচন্দ্র মৈত্র হরিনাথের একটি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর দুটি গানের 'ভাষা ও বক্তব্য'-এর একদেশীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪৮] গান দুটি সহ আরও কিছু সাদৃশ্যের নমুনা নিচে দেওয়া গেল :

**হরিনাথের গান**

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আর দিবানিশি

**রবীন্দ্রনাথের গান**

(১) অরূপ-বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে।।[৪৯]

(২) রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।।[৫০]

**হরিনাথের গান**

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি
সুধা বলে গরল খেলি।
সংসারে সোনার খণি পরশমণি রতনমণি না চিনিলি।[৫১]

**রবীন্দ্রনাথের গান**

আমার প্রাণের সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।[৫২]

**হরিনাথের গান**

ঐ দেখ ডুবল বেলা, ভাঙল খেলা
(এবার) খেলা রেখে বাড়ী চল।[৫৩]

**রবীন্দ্রনাথের গান**

যখন ভাঙল মিলন-মেলা।[৫৪]

**হরিনাথের গান**

আমারে পাগল করে যে জন পালায়
কোথা গেলে পাব তায়[৫৫]

**রবীন্দ্রনাথের গান**

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে[৫৬]

**হরিনাথের গান**

এখন আমার মনের মানুষ কোথা পাই
যার তরে মনোখেদে প্রাণ কাঁদে সর্ব্বদাই[৫৭]

**গগন হরকরার গান**

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে

**রবীন্দ্রনাথের গান**

আমার মনের মাঝে যে জন আছে
তাই হেরি তাই সকল কাজে[৫৮]

'ভোরের পাখি' কথিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন হরিনাথ মজুমদারের প্রায় সমবয়সী (বিহারীলালের জন্ম ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ, আর হরিনাথের জন্ম ১২৪০ বঙ্গাব্দের ৫ শ্রাবণ)। হরিনাথ বয়সে দুবছরের বড়ো ছিলেন। বিহারীলাল 'সে যুগের প্রকাশিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তকই' মনোযোগের সঙ্গে 'পাঠ করিয়াছিলেন'। পাঁচালি ও কবিগানের প্রতিও বিহারীলালের 'আশৈশব প্রীতি' ছিল।[৫৯] হরিনাথের কবিতা-গানের সঙ্গে বিহারীলালের যে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল তা বিহারীলালের কবিতা ও গানের নিবিষ্ট-পাঠে ধরা পড়ে। হরিনাথের কাব্যগীতির সঙ্গে বিহারীলালের রচনার ভাবগত সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—

**হরিনাথের লিখছেন :**

এই ত মানব জীবন ভাই!
এই আছে আর,—এই নাই।
যেমন পদ্মপাতে, জল টলে সদাই;—
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই[৬০]

**বিহারীলাল লিখছেন :**

ক-দিন কে আছে বল,
মিছে কেন বলাবল,
এই হয়, এই যায়
এই আছি, এই নাই;[৬১]

অন্যত্র আবার দেখা যায়, **হরিনাথ লিখছেন :**

কতকাল আর ঘুমাবে বল,
ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল।
ওরে দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হল অন্ধকারে ঢাকিল[৬২]

**আর বিহারীলাল লিখছেন :**

বেলা নাই বেলা নাইরে
হয়েছে যাবার বেলা
ভাঙা হাঠে জীবন ঠাটে
আরো কত খেলবি রে[৬৩]

হরিনাথের নিকট যেমন জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মীর মশাররফ হোসেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চন্দ্রশেখর কর এবং লালন ফকিরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল, তেমনই বিহারীলালের নিকট যাঁদের সমসময়ে নিয়মিত যাতায়াত ছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায়, অধরলাল সেন, প্রিয়নাথ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ বসু, রসময় লাহা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর যৌবনকালে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিহারীলালের নিকট প্রায় নিয়মিত যেতেন।[৬৪]

হরিনাথের 'এত ভালবাস থেকে আনালে'[৬৫] গানটির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায় বিহারীলালের গানে 'কোথা লুকালে, তোজিয়ে আমারে'।[৬৬]

একথা সত্য যে 'তত্ত্বের গুরুভারকে' গীতিকবিতার 'লঘুতা, সৌকুমার্য ও চারুতা দান' যথার্থ প্রতিভাবান কবির পক্ষেই সম্ভব। 'বাঙলা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী' হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখলেও, নিছক কৌতূহলজাত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা তাঁর 'অনুভূতি-জাত কাব্যসত্য' হয়ে ওঠেনি। অন্তরের 'ব্যাকুল বেদনা' থেকে 'ভগবৎ-জিজ্ঞাসা'র সমুত্থান না ঘটলে কাব্য উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিতুলনায় 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অতুল প্রসাদ সেনের ভগবৎসাধনার কবিতা সার্থক গীতি কবিতা; কেননা, সেখানে তত্ত্ব কাব্যপ্রেরণার অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া কাব্যরূপ' লাভ করেছে। এইসব কবিদের এই ধরনের কবিতা তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্ব এখানে কাব্য প্রেরণার সঙ্গে যথার্থ সেতু বন্ধনের মাধ্যমে কবি-হৃদয়ের আন্তরিক আবেগকে প্রকাশ করেছে।[৬৭] কান্তকবি রজনীকান্তের জীবনীকার আঠারো-উনিশ শতকের বাঙলা কবিদের দুটো শ্রেণীবিভাগ করেছেন : (১) দেশের জনসাধারণের কবি এবং (২) শিক্ষিত সাধারণের কবি। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি কবিদের তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন অর্থাৎ 'শিক্ষিত সাধারণের কবি' বলেছেন। অন্যদিকে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি,

নীলকণ্ঠ এবং কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে তিনি প্রথম শ্রেণীভুক্ত করেছেন অর্থাৎ 'দেশের জনসাধারণের কবি' বলেছেন।[৬৮] হরিনাথের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন এবং তাঁর কাব্য-গীতিতে এই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর শব্দের গ্রামীণ সৌকর্য, তাঁর দর্শনবৈভবের উপস্থাপনা তাঁকে এবং তাঁর কাব্য-গীতিকে দেশের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায় হরিনাথকে 'কুমারখালীর অলঙ্কার' এবং 'বঙ্গভারতীর বরপুত্রগণের মধ্যে অন্যতম' বলে অভিহিত করে বলেছেন :

> তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে, এবং তাহা ভক্তি-পিপাসু নর-নারীবর্গের হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরসে আপ্লুত করিতেছে।[৬৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-প্রচারণা, নবহিন্দুদের উত্থান ও বিকাশ, ব্রাহ্মসমাজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ত্রিধাবিভক্তি, রক্ষণশীল হিন্দুদের সম্প্রচার, আর্যসমাজ এবং মুসলমান-বিরোধী মনমনস্কতা—এসব কোন কিছুই হরিনাথকে প্রভাবিত করে কোনরকম সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার ধারাস্রোতে ভাসাতে পারেনি। এইসব বহুমাত্রিক প্রবণতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হরিনাথ যে ধর্মচর্চা, যে দর্শনচর্চা করেছেন, তা একান্তই মানবধর্ম ও মানবিক দর্শন। মানবকল্যাণব্রতই তাঁর চিন্তা-চেতনার অন্তঃস্থলে সদাজাগ্রত ও ক্রিয়াশীল থেকেছে। ফলে অস্পৃশ্যতা, জাতবিচার সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি চিন্তাভাবনাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হরিনাথের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যেমন সত্যসন্ধিৎসায় ব্রতী হয়েছিলেন, তেমনি হরিনাথের গুণমুগ্ধতায় প্রণত হয়েছিলেন চন্দ্রশেখর করের মতো সরকারি আমলাও। মীর মশাররফ যেমন সমাজদৃষ্টির শিক্ষালাভ করেছিলেন হরিনাথের কাছে, তেমনি হরিনাথের ব্যক্তিত্বের লোভনীয় আকর্ষণে দীনেন্দ্রকুমার রায় বারবার ছুটে গেছেন কুমারখালিতে। হরিনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি অচল আনুগত্যে জলধর সারাজীবনই বলতে গেলে হরিনাথের স্মৃতিচর্চা করেছেন কাঙাল-পূজার আন্তরিক আকুতিতে, তেমনি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবও নতমস্তকে হরিনাথের পদপ্রান্তে আনত হয়েছিলেন; ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও—সমস্ত রকমের সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে—শিবচন্দ্র হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ কাঁধে করে বহন করেছেন।[৭০] কাঙালের শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবদেহ যেন দাহ না করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শিবচন্দ্র হরিনাথের শবদেহ কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করার আগেই উপস্থিত সবাইকে কাঙালের এই শেষ ইচ্ছার কথা জানান। এ নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত 'দুকূল' রক্ষার্থে একটি সিদ্ধান্ত নেওয় হয়। দাহের আগে কাঙালের হাতের একটু আঙুল কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, তারপর শবদাহ হবে। সেই মতো কাজ হয়েছিল।[৭১]

হরিনাথ তাঁর এই সামাজিক ধর্মদৃষ্টি এবং দর্শনগত অবস্থান থেকে সমাজে প্রচলিত অনাচার ও অসুস্থ প্রবণতার বিরুদ্ধে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য থেকেই সমালোচনামুখর

হয়েছিলেন। রমাকান্ত চক্রবর্তী সঠিকভাবেই বলেছেন :

> ফিকিরচাঁদের গানে, স্বাভাবিকভাবেই ধনীদের বিলাস ও আড়ম্বর, বাবুগিরি, লাম্পট্য, অসামাজিকতা কঠোর ভাষায় সমালোচিত হয়েছে; কিন্তু তাতে কোথাও হিন্দুত্ব নিয়ে বাগাড়ম্বর দেখা যায় না। এই পরিবেশের প্রভাব অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'যবন যবন যবন' করে একদল হিন্দু লেখককের চিৎকারে যখন কান পাতা দায় হয়েছিল, তখন অক্ষয়কুমারই সিরাজ-উদ্-দৌলার ঐতিহাসিক পুনর্বাসনের জন্য কলম ধরেছিলেন।

হরিনাথের মৃত্যুর পর প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুতিথিতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ায় কুমারখালিতে কাঙালের স্মৃতি-উৎসব হতো। সেই অনুষ্ঠানে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ সাহিত্যিক-সাংবাদিক-কবিরা বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকে কাঙালের স্মৃতির উদ্দেশে প্রণতি জানিয়েছেন। এইসব অনুষ্ঠানে কাঙাল হরিনাথের 'গুণমুগ্ধ গ্রামবাসীরা দলে দলে উপস্থিত' হতেন।[৭৩] কাঙালের মৃত্যুর ৩৫ বছর পরে জলধর সেন লিখেছেন :

> কুমারখালীতে প্রতিপত্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু কুমারখালী কাঙাল হরিনাথের নামে এখনও গৌরবান্বিত। ....কুমারখালীর জনসাধারণ ও কাঙালের ভক্তবৃন্দ তাঁহার পুণ্যস্মৃতিচর্চায় একটি দিন অতিবাহিত করিবার জন্য অক্ষয় তৃতীয়ায় একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।[৭৪]

অব্রাহ্মণ এবং তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও হরিনাথ ব্রহ্মাণ্ডবেদের মতো 'তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ' রচনা এবং প্রচার করার সমসময়ের অনেক 'ধর্ম্মধ্বজী' নাসিকা কুঞ্চিত করতে 'কুণ্ঠিত হন নাই'। ব্রাহ্মণেতর যে কুলেই হরিনাথ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁর অপরিমেয় পৌরুষের জন্য তিনি অনেক 'ব্রাহ্মণেরও নমস্য' ছিলেন—১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় কুমারখালির কাঙাল-স্মৃতিবাসরে একথা স্বকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।[৭৫] ১৩২১ বঙ্গাব্দের কাঙাল স্মৃতি-বাসরে দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেছিলেন : বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁর 'রচিত বাউলসঙ্গীত'। এই সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙলাসাহিত্যে 'অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন' করে গিয়েছেন। এ বিষয়ে 'সাধকশ্রেষ্ঠ' রামপ্রসাদ ও দাশরথির চেয়ে হরিনাথের 'প্রতিষ্ঠা অল্প নহে'। হরিনাথের গানে একসময় উত্তরবাঙলা ও পূর্ববাঙলার বহু স্থানে 'অপূর্ব উন্মাদনার' সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর 'সেই সরল মধুর আকুলতাপূর্ণ সঙ্গীতে কত পাষাণ হৃদয় দ্রব হইয়াছে, কত নাস্তিকের মনে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইয়াছে, কত মূঢ়ের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে।' দীনেন্দ্রকুমারের বক্তব্য : হরিনাথ যদি বাঙলা সাহিত্যেকে অন্য কোন

'স্থায়ী সম্পত্তি দান' না-ও করতেন, তাহলেও তাঁর রচিত গানগুলির জন্যই তিনি 'চিরস্মরণীয়' হয়ে থাকতেন।[৭৬]

হরিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রসঙ্গে লিখেছেন : অন্য অনেকের গানে যেমন শুধুমাত্র সুখদুঃখের কথা ধ্বনিত হয়, হরিনাথের বাউল গান সেখানে হৃদয় ক্ষেত্রে 'সংসারের অনিত্যতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসভাব' জাগিয়ে তোলে এক অসাধারণ আবেদনময়তায়। তাঁর কথায় :

> রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, কামনার আসক্তি হইতে ক্ষুদ্র নরহৃদয়কে রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোকই হরিনাথের জ্ঞানভক্তিময় সাধনতত্ত্ব-রসমধুর দেবোভাবোদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবণে হরিনাথকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।[৭৭]

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ হরিনাথের মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : হরিনাথের মৃত্যুতে নদীয়া জেলা একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারালো। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা হরিনাথকে একজন পল্লীহিতৈষী দরিদ্রের বন্ধু এবং 'সত্যপরায়ণ সাহসী সাহিত্যসাধক'[৭৮] বলে অভিহিত করেছিল। হরিনাথের মৃত্যুর পর 'দ্য ন্যাশানাল ম্যাগাজিন'-এ 'দ্য হিস্টরি অব প্রেস ইন বেঙ্গল' শীর্ষক দীর্ঘ রচনার দ্বিতীয়াংশে 'দ্য হিস্টরি অব দ্য নেটিভ অ্যান্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জার্নালস্ অব বেঙ্গল' উপশিরোনামাঙ্কিত আলোচনায় 'অ্যান ওল্ড জার্নালিস্ট' নামাবরণে জনৈক আলোচক হরিনাথকে একজন 'দেশপ্রেমিক ভদ্রজন' বলে অভিহিত করে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর গ্রামবার্তার মাধ্যমে পাবনা ও নদীয়ার নীলচাষিদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের খবরাখবর ও সংবাদাদি জনসমক্ষে ও রাজসরকারের গোচরে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন।[৭৯] 'সাহিত্যের লাভালাভ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় ভাষ্যে শিলং থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সেবক' পত্রিকার সম্পাদক ১৩০৩ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় লিখেছিলেন :

> আলোচ্য বর্ষে....প্রথমেই হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের তিরোভাব মানসপটে সমুদিত হয়। আজ আমরা এই সুদূর প্রদেশে থাকিয়াও সাহিত্যচর্চা করিতেছি, কিন্তু একদিন ছিলো—যখন কলিকাতা ব্যতীত অন্য কুত্রাপি বঙ্গবাসী বাঙলাভাষার অনুশীলনকল্পে কোন উদ্যম প্রকাশ করেন নাই। সেই দুর্দ্দিনে এই মহাত্মা স্বীয় জন্মভূমি কুমারখালি হইতে 'গ্রামবার্তা' প্রকাশিত করেন এবং একাদিক্রমে বিংশতি বৎসরকাল দক্ষতা সহকারে ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার বহন করেন। ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইলেও, এই পত্রিকা দ্বারা অনেক অত্যাচারীর অত্যাচার প্রদপিত হইয়াছিল এবং রাজপুরুষেরাও ভয় ভক্তিতে ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন।

যখন নাটক-নবেল বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করে নাই তখন ইঁহার প্রণীত 'বিজয়বসন্ত' প্রকাশিত হইয়া ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিয়াছে।....বোধহয় আধুনিক বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের মধ্যে হরিনাথের ন্যায় এ বিষয়ে সৌভাগ্যশালী গ্রন্থকার পাওয়া দুর্ঘট।....ফিকিরচাঁদ ফকিরের পারমার্থিক বাউলসঙ্গীত কে না শুনিয়াছেন? সাধক রামপ্রসাদের গীতাবলীর ন্যায় এই গানগুলিও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আবাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়েও হরিনাথ আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান।[৮০]

হরিনাথের মৃত্যুতে সমাজের সাধারণ হতদরিদ্র মানুষজনের মনে বিষাদ ও দুঃখের কারণ ঘটলেও সমকালীন শিক্ষিত বিদ্বৎসমাজের মধ্যে এর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয়টি যুগপৎ পরিতাপ এবং বিস্ময়ের। হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্যরাই একে একে তাঁদের স্মরণ-আলেখ্যে হরিনাথ ও তাঁর কীর্তিস্তম্ভকে প্রচারের আলোকক্ষেত্রে এনে গুরুর প্রতি দায়বোধের পরিচয় রেখেছিলেন আন্তরিকতার সঙ্গেই। হরিনাথের মৃত্যুর পরই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায়, দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব 'শ্মশানে কাঙাল' পুস্তিকায় এবং জলধর সেন ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের (জুলাই ১৮৯৬) 'দাসী' পত্রিকায় গুরুতর্পণ করেন। এর পরবর্তীকালে দীনেন্দ্রকুমার 'সাহিত্য' ও 'মানসী' পত্রিকায়, চন্দ্রশেখর কর 'মানসী' পত্রিকায় এবং জলধর সেন 'মানসী' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় হরিনাথ সম্পর্কে অন্তরের তাগিদ থেকে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। জলধর সেন দুখণ্ডে কাঙাল জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (১৩২০ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দে) কাঙাল-কথাকে ব্যাপকসংখ্যক পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

হরিনাথের মৃত্যুত্তরকালে সাধক শরৎচন্দ্র চৌধুরী হরিনাথ সম্পর্কে চোদ্দ পংক্তির একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটিতে হরিনাথের একটি সার্বিক পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় :

যখন বঙ্গের গ্রামে দীন প্রজাগণ
উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহিত;
না জানিত রাজদ্বারে করিতে রোদন,
নিজের অভাব নিজে বুঝিতে নারিত;
সে সময়ে হরিনাথ বীরের মতন,
অনন্যসহায় ঘোর যুদ্ধে দাঁড়াইলা,
লেখনী সম্বলমাত্র, নির্ভীক হৃদয়ে,
জীবনের দীর্ঘকাল একাকী যুঝিলা।

বারেক কর্ত্তব্যবোধ, পরপ্রীতি আর,
মানব হৃদয়ে মূল করিলা বিস্তার
এক দরিদ্র কেহ কি করিতে পারে,
হরিনাথ গ্রামবার্তা নিদর্শন তার!
শিক্ষক, রক্ষক, যোগী, ত্রিকালে ত্রিবেশ,
যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, প্রৌঢ়ে দীপ্ত উপদেশ।[৮১]

এই কবিতাটি জলধর সেন ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর কাঙাল-জীবনীর প্রথম খণ্ডে সম্পূর্ণ উদ্ধার করেছিলেন। স্বভাবতঃই কবিতাটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের আগে লেখা। এর মাত্র দুবছর পর নবকৃষ্ণ ঘোষ 'হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল)' শীর্ষক একটি সনেট লিখে প্রকাশ করেন। সনেটটিও সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি

একদিকে হেরি তুমি পল্লীবাসী বীর,
অরি তব, দেশমান্য ভূস্বামী, প্রবল—
তুমি অতি নিঃসহায়, সাহস-সম্বল,
কিন্তু সে অসম রণে না হয়ে অধীর,
'যেথা ধর্ম্ম সেথা জয়' জানি মনে স্থির,
শত্রু মাঝে একা রথী—নির্ভীক অটল,
দেখালে বিচিত্র বীর্য্য, সামর্থ্য, কৌশল,
রক্ষিতে প্রজার স্বত্ত্ব—কৃষাণ কুটীর।
অন্যদিকে হেরি—তুমি বাউল—কাঙ্গাল,
মগ্ন হয়ে আছ কভু পরমার্থ গানে,
কভু ছিঁড়িবারে মায়া—সংসারের জাল,
খুঁজিছ মুক্তির পথ—মজি তত্ত্বজ্ঞানে।
এক করে করবাল, অন্যে একতারা,
স্মরিলে তোমার মূর্ত্তি হই আত্মাহারা![৮২]

১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় তিথিতে কুমারখালির হরিনাথ-স্মরণানুষ্ঠানে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'কাঙাল' শীর্ষক ৫৬ পংক্তির একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :

কে শুনেছে কবে বল' জ্ঞানী ছেড়ে জ্ঞান, মানী মান,
কাঙালের দ্বারে এসে খুঁজিতেছে আত্মার সম্মান?

গ্রাম্য-বিদ্যা সাধ্য শুধু—সম্বল সে 'গ্রামবার্তা' যাঁর,
সাহিত্যের মহারথী যত সব দ্বারস্থ তাঁহার।

কে দেখেছে কবে বল সম্ভোগের সিংহাসন ছাড়ি',
লক্ষ্মীর দুলালল যত ছুটে আসে কাঙালের বাড়ি!

* * *

এ 'কাঙাল' নহে বন্ধু, সাধারণ বিত্তের কাঙাল,
যশের ভিক্ষুক নহে, মান তাঁর প্রাণের জঞ্জাল

* * *

ধন্য এ কুমারখালি—দেবতার আশীর্বাদমাখা
বিশ্বের নূতন তীর্থ—কাঙালের পদচিহ্ন আঁকা।[৮৩]

এই কবিতাটি মানসী পত্রিকার আষাঢ় (১৩২১ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরনের কয়েকজন কবির প্রাণের আকুতি এবং কাঙাল-শিষ্যদের গুরু-তর্পণ-এর বাইরে কাঙাল সম্পর্কে বাঙলার বিদ্বৎসমাজের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যথার্থ সাহিত্য-শিষ্য হিসাবে শহরের বর্ণাঢ্য আলোকক্ষেত্রের বাইরে দূর মফস্বলে হরিনাথের মতো একজন 'জাগ্রত বিবেক'-এর, সাহিত্য-সংগঠকের, সাহসী সম্পাদকের, সঙ্গীত রচয়িতার ও সাহিত্যস্রষ্টার ঐতিহাসিক ভূমিকা সমসময়ে নীরব ঔদাসীন্যে উপেক্ষিত থেকেছে। হরিনাথ সম্পর্কে এই তুষ্ণীম্ভাব গৌরবের সাক্ষ্যবাহী নয়।

হরিনাথের মৃত্যুত্তরকালে হরিনাথের বাসভূমি কুমারখালিতে প্রতিবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় যেমন কাঙাল স্মরণোৎসব পালিত হয়, তেমনি এই বাঙলায়ও হরিনাথ স্মরণসভা বহুবারই বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং এখনও কলকাতার কসবায় হরিনাথের প্রপৌত্রী গৌরী কুণ্ডুর বাসভবনে প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় কাঙাল-উৎসব পালিত হয়। কুমারখালিতে কাঙাল-স্মরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে কাঙাল শিষ্যরা এবং কাঙাল-ভক্তমণ্ডলী ছাড়াও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (কবি) প্রমুখ যেমন গিয়েছেন, তেমনি গিয়েছেন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ-সম্বাদক), কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিহর শেঠ প্রমুখ। কলকাতার স্টুডেন্টস হল-এ ১৩৬২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কাঙাল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

হরিনাথের ৭৪তম সাম্বৎসরিক স্মৃতি মহোৎসবের স্মরণ পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার বলেছিলেন যে হরিনাথের নাম 'নব্য বাংলার ইতিহাসে অমর' হয়ে থাকবে। দেশ পত্রিকার একদা-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেন হরিনাথের আদর্শই তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রেরণা বলে স্বীকার করেছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জন তো হরিনাথকে 'কবির কবিতা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও সশ্রদ্ধায় হরিনাথের কথা স্মরণ করেছিলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী কাঙাল হরিনাথের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সম্পদ বলে মনে করতেন।[৮৪]

## তথ্যপঞ্জি

১। কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের নির্বচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৬

২। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৭

৩। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, ফাল্গুন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)। পৃ. ৩৩২

৪। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪২

৫। কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। চতুর্থ ভাগ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৭ (পাদটীকা)।

৬। দুর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পাদিত) : বাঙালীর গান। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৫৮

৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৫৯-৬০

৮। কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১০-১১

৯। প্রাগুক্ত। পৃ. ১১৮

১০। বারিদবরণ ঘোষ : জলধর সেন ও ভারতবর্ষ। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৭৬

১১। ফজলুল হক : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৮৮৯ সংস্করণ। পৃ. ৭৬

১২। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, শ্রাবণ, চতুর্থ সপ্তাহ। ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (অগাষ্ট ১৮৭২)। পৃ. ৩

১৩। প্রাগুক্ত। অগ্রহায়ণ, তৃতীয় সপ্তাহ। ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, (ডিসেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৪

১৪। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, শ্রাবণ, দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৮৭৩)। পৃ. ১

১৫। প্রাগুক্ত। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৮০ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ২৯, ১৮৭৩)। পৃ. ৪

১৬। প্রাগুক্ত। ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (ডিসেম্বর ৮, ১৮৭৭) পৃ. ২৬১

১৭। দীনেন্দ্রকুমার রায় : কাঙালের স্মৃতিচর্চা। সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৯৪

১৮। দীনেন্দ্রকুমার রায় : বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথ। মানসী, আষাঢ় ১৩২১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৬৬০-৬১

১৯। রহস্যসন্দর্ভ। ফাল্গুন ১৯৩৯ সংবৎ (অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) পৃ. ২৩-২৬

২০। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। ফাল্গুন, দ্বিতীয় পক্ষ ১২৭৬ বঙ্গাব্দ (মার্চ ১৮৭০)। পৃ. ২৬০

২১। জলধর সেন : আত্মজীবনী ও স্মৃতি-তর্পণ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৬-২৭

২২। রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

২৩। রমগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) চুঁচুড়া। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। পৃ. পাঁচ

২৪। প্রাগুক্ত। 'পরিশিষ্ট (ক)' দ্রষ্টব্য

২৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৮৪

২৬। রবীন্দ্ররচনাবলী। পঞ্চম খণ্ড। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৫৩১

২৭। রবীন্দ্ররচনাবলী। পঞ্চদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ. ৭১

২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : হরিনাথ মজুমদার। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭

# উপসংহার

হরিনাথ তাঁর সাহিত্যকৃতিতে যেসব সৃজনশীল রচনার ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন যেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) পদ্য বা কবিতা (২) পাঁচালি (৩) নাটক (৪) উপন্যাস (৫) বিবিধার্থক সঙ্গীত (৬) বাউল গান (৭) বিবিধ প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনা (৮) ক্ষুদ্র আখ্যান (৯) সাধক পরিচিতি এবং (১০) ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব।

হরিনাথের সাহিত্যচিন্তা ছিল পুরোপুরি তাঁর নীতি ও দর্শনাশ্রয়ী।

উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে মধুসূদন-দীনবন্ধু-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রমুখ বাঙলা কাব্য কবিতায় যে নতুন ভাবের স্রোত বহিয়ে দিয়ে পুরানো সাহিত্য-চিন্তার ধারার সঙ্গে স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতার রেখা নির্মাণে সক্রিয় স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বাঙলা কাব্য-নাটকে যে নতুন বিষয় আমদানি করেছিলেন—হরিনাথ সে সব কাব্য-কবিতা-নাটক সম্পর্কে অপরিচিত ও অনবহিত ছিলেন না ঠিকই, তবে তিনি বাঙলা সাহিত্যের এই আধুনিক চিন্তাভাবনাকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। মেঘনাদবধ-বীরবাহু-পলাশির যুদ্ধ বা একেই কি বলে সভ্যতা-নীলদর্পণ প্রভৃতি কাব্য বা নাটক তাঁকে আধুনিক চিন্তাভাবনায় প্রাণিত করতে পারেনি। বরং প্রাগাধুনিক ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য থেকেছেন। ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝির পরবর্তীতে বাঙলা সাহিত্যে যে ভাববিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল, হরিনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে প্রচলিত প্রাগাধুনিক সাবেকি ধারার অনুসরণে পাঁচালি-কবিগান-গীতাভিনয় রচনায় অধিক আগ্রহী ও ব্রতী হয়েছেন। গ্রামদেশের প্রচলিত সাবেকি ধারার অনুসরণে পাঁচালি-কবিগান-গীতাভিনয় রচনায় অধিক আগ্রহী ও ব্রতী হয়েছেন। গ্রামদেশের প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারানুবর্তিতায় তিনি সুস্থ সংস্কৃতির নির্মাণ-প্রয়াসী হয়েছেন। অশ্লীলতা ও অশ্লীলভাব বর্জনে প্রাগাধুনিক সাংস্কৃতিক ভাবানুষঙ্গেই হরিনাথ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা সন্ধান করেছেন।

হরিনাথের কবিতা বা পদ্য রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি নীতি শিক্ষার প্রচারকার্য হিসেবেই এগুলি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যে লিখেছেন :

সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম, ধম্মত নয় সে ধর্ম্ম মর্ম্ম—
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে, মনে জেনো নিশ্চয়।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর গমন,
ষড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ।।[১]

এর ভাবনির্যাসে হরিনাথের নীতি শিক্ষাদানের মূল প্রবণতাটি ধরা পড়ে। তাঁর পদ্য বা কবিতাবলীতে এই কথাই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন এবং প্রচার করেছেন।

হরিনাথ সারাজীবন সত্যধর্মরক্ষার নীতিমূলক প্রচার তাঁর লিখিত স্বাক্ষ্যে রেখেছেন চিন্তাচর্চা ও জীবনাচরণের আন্তরিক জায়গা থেকে। এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোন অবকাশ নেই। হরিনাথ প্রপীড়িত মানুষের মুক্তিসন্ধানী হয়েছেন অধ্যাত্মবাদের শাসনকে যথোচিত মান্যতা দিয়েই। গ্রামবার্তা পর্যায়ে তিনি যে বাস্তব সংগ্রামক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রপীড়িত প্রজাদের দুর্দশামোচনের চেষ্টা করেছেন, তা প্রচলিত ব্যবস্থার কোনরকম মৌল পরিবর্তন ব্যতিরেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুবিচার প্রার্থনার মাধ্যমেই। জমিদারি প্রথার অবসান হরিনাথ চাননি। তিনি চেয়েছেন জমিদারের অত্যাচার নিবারণ। তাঁর কাছে ভালো এবং প্রজাকল্যাণব্রতী জমিদার প্রার্থীত থেকেছে। ব্রিটিশ সরকার প্রজাদরদি হয়ে প্রজার মঙ্গলাচরণে সুশাসক হিসাবে পরিকীর্তিত হোন, এটাই ছিল হরিনাথের আন্তরিক চাহিদা। নীলকরদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হলেও, তিনি চেয়েছেন ব্রিটিশ সরকার প্রজাপীড়ক নীলকরদের শাস্তি দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করুক। হরিনাথ সমকালের বুদ্ধিজীবী-লেখকদের মতো মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) প্রমুখ সরকার-বিব্রতকারী সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহগুলির বিরুদ্ধতা করে সেই সব বিদ্রোহকালে ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বাহুচিত্তে সমর্থনদান করেননি। হরিনাথ এসব ক্ষেত্রে অনেক স্থিতধী, সংযমী। এইসব বিদ্রোহগুলির বিরোধিতা তিনি তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে করতে অভ্যস্ত হননি। বরং এইসব কৃষক বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে হরিনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি সরাসরি এই সব বিদ্রোহ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেননি ঠিকই, তবে তিনি এই সব বিদ্রোহের জন্য পরোক্ষে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকেই দায়ী করেছেন। দেশীয় লোকের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আস্থাহীনতাই ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কারণ[২] হিসেবে তিনি নির্দেশ করেছেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পাবনা সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহে হরিনাথ প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহের অবস্থান নিয়েছিলেন।

এসব সত্ত্বেও হরিনাথ এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাননি। এদেশে ব্রিটিশ পলিসির সমালোচনা তিনি করেছেন। এদেশের শিল্পের স্বাধীন বিকাশ-না-ঘটার বিষয়টিও তিনি যথাযথভাবে গ্রামবার্তায় উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। পরাধীনতা সম্পর্কে গ্রামবার্তায় তিনি লিখেছেন : 'যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই সামান্য প্রকারের কৃষিকার্য্য ব্যতীত কোন বিষয়েও আমাদিগের স্বাধীনতা নাই। অধিক কি একটি সূচের নিমিত্তও আমরা পরাধীন হইয়া আছি।....আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন' (জুলাই, ১৮৬৯)। গ্রামবার্তায় অন্যত্র (মে ১৮৮০) তিনি আবার লিখেছেন : 'পরাধীনতায় কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা তাহা পরাধীনেরাই বিশেষ অবগত আছে। হতভাগ্য বঙ্গসন্তান চিরকাল পরাধীন।' তবে 'পরাধীনতা' সম্পর্কিত হরিনাথের এই চিন্তা কোন রাজনৈতিক ভাবনালোকে সমৃদ্ধ নয়। তিনি লিখেছেন, 'আমাদিগের পরাধীনতার কারণ' অনেক।[৩]

এরপর তিনিই আবার লিখেছেন :

> স্বাধীনতা বলিলেই অনেক স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি আপনার অথবা স্বজাতীয় কোন রাজার অধীনতা বুঝিয়া থাকেন। আমাদিগের স্বাধীনতার সহিত রাজত্বের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।....স্বাধীনতা ও উন্নতি যদি কখন ভারতে হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা ইংরেজ রাজত্বেই হইবে, অন্যথা কখন হইবে না।[৪]

হরিনাথের স্বাধীনতা বা পরাধীনতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার মূল দিকটি এখানে প্রকাশিত। ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদে কোন স্বাধীনতা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। বরং বিপ্রতীপে ব্রিটিশ শাসনাধীনেই 'স্বাধীনতা ও উন্নতি' সম্ভব বলে তিনি মনে করেছেন। হরিনাথের নির্দিষ্ট উক্তি :

> বস্তুতঃ ইংলণ্ডেশ্বরীর সিংহাসনের প্রতি কেহ ভক্তিশূন্য হয়, সংবাদপত্রে (অর্থাৎ গ্রামবার্তাপ্রকাশিকায়) এরূপ ভাব কি বাক্য কখন প্রকাশিত হয় নাই, বরং সেই সিংহাসনের প্রতি যাহাতে ভারতীয়দিগের ভক্তি বদ্ধমূল হয়, দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টাই করিয়া থাকেন।[৫]

স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয়াবলীকে হরিনাথ রাজনৈতিক অর্থে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবনালোকেই দেখতে চেয়েছেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা দেশের জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি, সারা ভারতের কুড়ি কোটি। হরিনাথের প্রশ্ন : এই ৫ বা ২০ কোটি লোকের মধ্যে বাঙলাদেশে বা সারাভারতে ৫ জন বা ২০ জন কি আত্মস্বার্থ ও আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে 'ভারতোদ্ধারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন'? হননি। সুতরাং তাঁর মতে 'ভারতোদ্ধার'-এর জন্য 'হৃদয় ও আত্মা প্রস্তুত' করার প্রয়োজন।[৬]

এদেশে ব্রিটিশ শাসনবিরুদ্ধ চিন্তাচর্চাকে অনুমোদন না দিয়ে হরিনাথ উনিশ শতকী বাঙলার বুদ্ধিজীবী-লেখকদের রাজ-দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসারী হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ কেউই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাননি। হরিনাথও এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমাত পোষণ করে স্বাধীনতা-পরাধীনতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্যেরাও সবাই এই বিষয়ে হরিনাথের মতানুসারী হয়েছিলেন।

হরিনাথের কবিতাবলীর বহুস্থলেই হরিনাথের বাস্তব চিত্রাঙ্কনের সাক্ষ্য মেলে। গ্রামবার্তার সম্পাদক হিসেবে এবং নিপীড়িত প্রজাস্বার্থরক্ষার ব্রতচর্যায় দীক্ষিত হওয়ার দরুন সমসময়ের দেশের মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। কাব্য-নাটকাদি তথ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির সময়ে হরিনাথ মূলগতভাবে চিন্তাভাবনার সাবেকিআনার পরিপোষক হওয়া সত্ত্বেও, ছোট ছোট কবিতায় অনেক সময়ই নির্মম বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। এক্ষেত্রে মনে হয় কবি হরিনাথের উপর দায়বদ্ধ নির্ভীক কৃষকদরদি সাংবাদিক হরিনাথের আধিপত্য কায়েম হয়েছে। যেমন—

(১) গোরু মরে ঘাস বিনে, ধান মরে তাতে।
ভাত নাই কারো পেটে, দুঃখে যায় বুক ফেটে....[৭]

(২) সহিতে পারি না দুঃখ বুক ফেটে যায়।
দেশান্তরে যেতে যাই, পথ না দেখিতে পাই,
অনিবার চক্ষুঃ জলে হয়ে অন্ধ প্রায়।।[৮]

(৩) ঘটি, বাটি, মাটি গেছে দুর্ভিক্ষের দায়।
উপবাস তিনদিন, কেমনে শুধিব ঋণ,
দস্তকের দড়ি হাতে. মরি প্রাণ যায়।।[৯]

(৪) সোনার বাঙ্গাল, ভাতের কাঙ্গাল
চক্ষে দেখা নাহি যায়।
করে হাহাকার, কত পরিবার
তৃণ শাকে না কুলায়।।[১০]

এইসব চিত্রাঙ্কনে কান্নার শব্দের আধিক্য প্রতিবাদের ভাষাকে বিড়ম্বিত করেছে। হরিনাথ দেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের করুণ, অসহায় অবস্থায় ব্যথিত হয়েছেন, তাদের কান্নার শব্দে নিজে গলা মিলিয়েছেন, কিন্তু প্রতিবাদে বিদ্রোহে তাদের উদ্দীপিত করে এদেশের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী কাজ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না সমকালের অন্যান্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মতই।

গুরু ঈশ্বরগুপ্তের 'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গোরু'-র মতো বিদ্রূপাত্মক পংক্তি হরিনাথ অনেক সময় লিখেছেন। তবে বিদ্রূপ আর বিদ্রোহের মধ্যে সূক্ষ্ম-পার্থক্য বজায় রাখতে তিনি সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছেন। যেমন—

(১) দশাশালা বন্দোবস্ত, করিয়া যখন।
দিলে জমীদার-হাতে কোন কথা নাই তাতে,
নত শিরে তব আজ্ঞা করেছি পালন।।[১১]

(২) জমীদার মাহাশয় বৃদ্ধি করে কর।
ডুবে যায় পুড়ে যায়, তবু করি করাদায়,
যা পাই তা, দেই তাঁরে যুড়ি দুটি কর।।[১২]

(৩) এত সয়ে থাকি তবু মন্দ চিরকাল।
সাদাবর্ণ দাদাগুলি, রাগিয়া মারেন গুলি,
মিথ্যাবাদী জুয়োচোর, বলে দেন গালি।[১৩]

হরিনাথ লিখেছেন, 'দুখিনী ভারতমাতা, কটি দেশে ছিন্ন কাঁথা' দ্বারে দ্বারে 'সন্তানের দুখে' কাঁদছেন।[১৪] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় পংক্তি হরিনাথের কাছে আদরনীয় হলেও বোঝা যায় তিনি এর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে

ভাবিত হননি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রঙ্গলালের এই 'স্বাধীনতা হীনতার' ছান্দিক প্রভাবে লিখেছিলেন :

দুর্ভিক্ষ পীড়িত চাষা অই দেখ যা রে!
ক্ষুধানলে দিশাহারা পাগলের প্রায় রে!
* * *
পেটে পিঠে একাকার, অস্থিচর্ম্মমাত্র সার,
চাষার দুর্গতি দেখে বুক ফেটে যায় রে।[১৫]

'চাষার দুর্গতি' দেখে তাঁর বুক ফেটে গেলেও হরিনাথ চাষির অপার দুঃখ দুর্দশার চিত্রাঙ্কন করলেও, প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী হননি। তিনি 'দেশের কথা'-র মধ্যে দিয়ে 'দশের কথা' বলতে চেয়েছিলেন, যা পরিণতিতে 'দেশের যিনি কর্ত্তা', তাঁর প্রতি লোকের রুচি ফিরবে।[১৬] এভাবে দেশ, দশ এবং দেশের কর্তার অনুষঙ্গে হরিনাথ আধ্যাত্মিক দর্শনর প্রবক্তা হয়েছেন। আর এই আধ্যাত্মিকতার যাথার্থ্য মেনে নিয়েই জলধর সেন লিখেছেন, এই প্রক্রিয়াতেই অর্থাৎ 'লোকের কথার' মধ্যে দিয়েই 'সকলে' 'লোকনাথের' প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।[১৭]

দশের এবং দেশের নিপীড়িত মানুষের দুঃখহরণের জন্য হরিনাথ কখনও শরণ নিয়েছেন 'বিক্টরিয়া মা'-র কাছে, কখনও 'দয়াময়' ঈশ্বরের কাছে। তিনি লিখেছেন :

তুমি পিতা মাতা তুমি জ্ঞান দাতা
তুমি রাজরাজেশ্বর।
ক্ষুধায় আকুল, তব প্রজাকুল
ডাকে হইয়া কাতর।।
* * *
তব দয়া-বিন্দু বিনে দুঃখ-সিন্ধু,
কে বা পার হতে পারে।
পাপ তাপ হর, প্রজা রক্ষা কর,
তোমা বিনে বলি কারে।[১৮]

গান হরিনাথের সাহিত্যকৃতির প্রায় সার্বিক অঙ্গাবরণ হয়ে উঠেছে। উপন্যাস-প্রবন্ধ-আখ্যান বাদ দিলেও তাঁর অবশিষ্ট রচনাবলীতে গানের একাধিপত্য লক্ষিত হয়। আর তাঁর গানের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে তাঁর ভক্তমনের আকুতি।

এছাড়া তাঁর বিপুল সংখ্যক বাউল গানের ভাণ্ডার রয়েছে। এই গানে হরিনাথের জীবনদৃষ্টি, আস্তিক্যবাদ, ভেদবুদ্ধিরহিত অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বাউলগানে দেহতত্ত্ব ও তত্ত্বাশ্রয়িতার নিদর্শনও খুব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত।

উপন্যাস প্রচেষ্টায় হরিনাথ কাহিনি নির্মাণ, ঘটনা-সংস্থাপন, বৈচিত্র্যময়তার মাধ্যমেত যত্নশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বরং এই শাখাতে হরিনাথ অনেক আধুনিক চিন্তাভাবনার

পোষক। হরিনাথের বিদগ্ধতার পরিচয় মেলে তাঁর গ্রামবার্তায় প্রকাশিত ক্ষুরধার প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনাসমূহে। এমনকি যেকয়টি ক্ষুদ্র আখ্যান তিনি 'স্বরূপকথা'য় লিখেছেন তার মধ্যেও তাঁর আধুনিক মনের রসবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

বাস্তবিক, প্রাগাধুনিক চিন্তার পরিপোষক পাঁচালি-কবিগান-গীতাভিনয় প্রভৃতির রচয়িতা হরিনাথ, আর উপন্যাস-প্রবন্ধ-ব্যাঙ্গরচনায় আধুনিক মন-মনস্কতার অধিকারী হরিনাথ এক বিপরীতের দ্বন্দ্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান। এখানে স্পষ্টতই অনুভূত হয়, হরিনাথ নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বে জর্জরিত। তিনি না পারছেন পুরানো ভাব-ভাবনাকে পরিত্যাগ করে নতুনের ভাবধারায় পুরোপুরি সামিল হতে, না পারছেন আধুনিক ভাবধারার সজীবতাকে পরিহার রকরে প্রাগাধুনিক ভাবদর্শনের ভাবতরঙ্গে ভেসে যেতে। এই ভাবদ্বন্দ্বে লালনের সাহচর্য এবং বাউলগানের দল করে বাউল গান রচনা ও গাওয়ার প্রক্রিয়ার অনুবর্তিতা সম্ভবতঃ তাঁর সামনে সমস্যামুক্তির দিশা হাজির করেছিল। বাউলগান সেই সময় শিক্ষিত কবিদের চিন্তা-চেতনার অন্তঃস্থলে আবেদন সঞ্চারে অল্পবিস্তর সমর্থ হয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র-বিহারীলাল চক্রবর্তী-রজনীকান্ত সেন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাউলগান রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। পেট্রিঅট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাম বসুর গান গাইতে ও বিদ্যাসাগর বাউল গান শুনতে উৎসাহী ছিলেন, এমন তথ্যও মেলে। পেট্রিঅট যে তারিখে প্রকাশিত হতো, তার আগের রাতে প্রেসে প্রিন্ট-অর্ডার দিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাম বসুর এই গানটি গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতেন :

বুঝি শ্যাম এল গোকুলে সখি,
সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে।
এতদিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হল,
পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।....[১২]

বিদ্যাসাগরও অখিলদ্দিন ফকিরকে পয়সা দিয়ে তাঁর বাউল গান শুনতেন। অখিলদ্দিনের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় বিদ্যাসাগর তার গান তার মুখে অনেকবারই শুনেছেন এবং তাকে পয়সা দিয়েছেন। অখিলদ্দিনের গলায় যে বাউল গানটি বিদ্যাসাগর শুনেছেন বহুবার, সেই গানটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি :

কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় কর্বে রে কে,
তুমি কোন্‌খানে খাও কোথায় থাকরে, মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ—
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।....[১৩]

এসব সংবাদ সাংবাদিক হরিনাথের জানা থাকই স্বাভাবিক। পুরাতন ও নূতনের ভাবদ্বন্দ্বে জর্জরিত হরিনাথ বাউল গানের মধ্যে এই সমস্যার সুরাহার সন্ধান করেছিলেন বলে

অনুমিত হয়। গ্রামবার্তার প্রকাশ এবং পরিচালনার সুদীর্ঘ সময়ে হরিনাথ আধুনিক চিন্তার মনোনিবেশে প্রবন্ধ-ব্যাঙ্গরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রপীড়িত প্রজাস্বার্থে সুদৃঢ় ও আপসহীন অবস্থান নিয়ে অত্যাচারী জমিদার, নীলকর, মহাজন, পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে একক ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালানোর পর্যায়ে সংবাদ ও প্রবন্ধাদি লেখার সময় হরিনাথকে প্রাগাধুনিক চিন্তাচর্চার বাস্তব অনুশীলনের অবস্থান থেকে সরে এসে আধুনিক ও বাস্তবমুখীন দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হয়েছিল। আবার এরই মাঝে তিনি সাবেকি চিন্তাচর্চায় পাঁচালি-কীর্তন রচনাও করেছেন। ফলে নির্দিষ্টভাবে কোন একটিকে সার্বিকভাবে গ্রহণ করতে না পারার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধতায় হরিনাথ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। গদ্য ভাষাচর্চায় আলালী ভাষার অনুমোদক না হয়েও চলিত ভাষার প্রয়োগের যাথার্থ্য বিচারে নিজেও 'অক্রূর সংবাদ'-এ চলিত ভাষায় প্রয়োগ করেছেন। আবার পাশাপাশি গদ্যরচনার আদর্শ ভাষা হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের রচনানীতিতে গ্রহণ করেছেন।

একদিকে ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রামনিধি গুপ্ত-রামপ্রসাদ সেন প্রমুখের কমবেশি প্রভাবানুসারিতা, অন্যদিকে মধুসূদন-দীনবন্ধু-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখের আধুনিক মননের আহ্বান—এই দুই বিপরীতধর্মী চিন্তাচর্চার প্রেক্ষাপটে হরিনাথ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। কোনও একটি ধারার সম্পূর্ণ গ্রহণ বা বর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভভব হয়নি। বলা যায়, ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের চিন্তা ও ভাবক্ষেত্রে হরিনাথের পাদমূলে প্রোথিত হছিল, আর মধুসূদন-দীনবন্ধু-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রমুখের চিন্তা ও ভাবক্ষেত্রে প্রবিষ্ট ছিল হরিনাথের অবশিষ্ট দেহাবয়ব। তিনি না পেরেছেন পাদমূল উৎপাটন করে পূর্ণায়বয়বে মস্তকানুসারী হতে, না পেরেছেন অবশিষ্ট অবয়বকে সোজা করে পাদমূলের সরলেখায় দাঁড়াতে। ফলে এই দুই বিপরীত ভাব-প্রবণতার মধ্যে তিনি সেতুবন্ধনের ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বাউল গান তাঁর সামনে প্রসারিত দিগঙ্গনকে উন্মুক্ত করেছিল। সমসময়ের সামাজিক সমস্যার বিষয়াবলীও তিনি বাউল ও বাউলাঙ্গের গানে নিয়ে এসেছিলেন।

বাস্তবক্ষেত্রে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চিন্তার অনুশীলন এবং সাধনক্ষেত্রে জগত ও জীবন সম্পর্কে তত্ত্বমূলক চিন্তাচর্চার মধ্যে হরিনাথ কোন দ্বন্দ্ব খুঁজে পাননি। মানবহিতব্রতই ছিল তাঁর চিন্তাভাবনার মূল দিক। এই মানবহিতের ব্রতচর্চায় তিনি গ্রামবার্তা নিয়ে লড়াই করেছেন, আবার উত্তরকালে এই মানবমুক্তির জন্যই সাধন ও ধর্মচর্চা করেছেন। অন্তর্বর্তীকালে বাউলগানে মানবকল্যানের বিষয়বলী নিয়েই গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষের হাটের মধ্যে তিনি নেমে গিয়েছিলেন। জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে তিনি সাধকদের পরিচিতি লিখেছেন 'মাতৃমহিমায়'। বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের অবসান তিনি কখনও চাননি। বরং ব্রিটিশ শাসনাধীনেই তিনি মানবকল্যাণের প্রত্যাশী ছিলেন।

বাঙলাসাহিত্যে হরিনাথের দান হিসেবে তাঁর পদ্য-কবিতা-পাঁচালি-গীতাভিনয় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে তাঁর উপন্যাস রচনার প্রয়াস,

প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গরচনা এবং বিপুল সংখ্যক বাউলগান বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ব্রহ্মাণ্ডবেদে 'ধর্মব্যবসায়ীদের' স্বরূপ উম্মোচনের প্রয়াস এবং সমস্ত রকম সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে উদার দৃষ্টির প্রসারিত ক্ষেত্রে হরিনাথের মানব-ধর্মের সুস্পষ্ট উচ্চারণ বাঙলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল সংযোজন সন্দেহ নেই।

১। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৩
২। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। অগ্রহায়ণ, তৃতীয় সপ্তাহ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (ডিসেম্বর ১৮৭২) পৃ. ২
৩। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩১৯
৪। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২৭
৫। গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা। এপ্রিল ২৯, ১৮৭৬। পৃ. ১৯
৬। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২৯
৭। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৪
৮। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৫
৯। প্রাগুক্ত।
১০। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৮
১১। প্রাগুক্ত। ২৯৩
১২। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৪
১৩। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৪
১৪। প্রাগুক্ত। ২১৮
১৫। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৭
১৬। জলধর সেন : কাঙাল হরিনাথ। প্রথম খণ্ড। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৭
১৭। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৮
১৮। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০০
১৯। প্রীতিগীতি (অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত)। কলকাতা। ১৩০১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। অবতরণিকা। পৃ. ছত্রিশ

# গ্রন্থপরিচয়

হরিনাথের প্রকাশিত গ্রন্থরাজির সঠিক সংখ্যানির্ণয় সম্ভব নয়। পুস্তিকাকারে অনেক রচনা যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি বহু রচনা গ্রামবার্তার পাতায় রয়ে গেছে, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। অনেক গান রয়ে গেছে যা আদৌ প্রকাশিত হয়নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল আহসান চৌধুরী এবং কাঙাল হরিনাথের প্রপৌত্র অশোক মজুমদারের প্রদত্ত তালিকা থেকে হরিনাথের একটি প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। হরিনাথের প্রকাশিত গ্রন্থগুলিকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—(ক) পাঁচালি-গীতাভিনয়-নাটক, (খ) পদ্য বা কবিতা, (গ) সঙ্গীত-নামকীর্তন ইত্যাদি (ঘ) প্রবন্ধ (ঙ) বাউলসঙ্গীত (চ) ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব (ছ) সাধনতত্ত্বের ইতিহাস (জ) শিশু ও বালকপাঠ্য এবং (ঝ) উপন্যাস

**পাঁচালি-গীতাভিনয়-নাটক**

১। বিজয়া (পাঁচালি)। ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। পৃ. ৩০

২। কবিকল্প (দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক কাহিনি) ১৮৭০। পৃ. ৫৮

৩। অক্রূরসংবাদ (গীতাভিনয়)। এপ্রিল ১৬, ১৮৭৩ (বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ৪৭
এটি হরিনাথের 'কবিকল্প' পুস্তক অবলম্বনে লেখা 'নাটকাকারে যাত্রা বা গীতাভিনয়'। এর প্রকাশক ছিলেন কুমারখালির 'বাজারস্থ গীতাভিনয় সভার অধ্যক্ষ' প্রসন্নকুমার পাল। 'অক্রূরসংবাদ'-এর ভূমিকাংশে তিনি লিখেছিলেন :

> শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাদিগের অনুরোধে যে কয়েকখানি গীতাভিনয় প্রস্তুত করিয়া দিয়েছেন, আমি তাহা ক্রমান্বয়ে মুদ্রাঙ্কন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 'অক্রূরসংবাদ' গীতাভিনয় পুস্তক মুদ্রিত হইল।[১]

৪। **সাবিত্রী নাটিকা** (গীতাভিনয়)। ১৮৭৪ (শ্রাবণ ১২৮১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৯৮

এই গীতাভিনয়টির 'বিজ্ঞাপন' অংশে হরিনাথ লিখেছিলেন :

> 'সাবিত্রী-সত্যবান' উপাখ্যান অতি প্রাচীনকালের। ইহার আদ্যপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে প্রতীতি হয়, ইহা ইতিহাসমূলক নহে।.... এই উপাখ্যান এরূপ তাৎপর্য্যের সহিত লিখিত হইয়াছে যে একদা কাব্য ও পরমার্থ রস প্রকাশ এবং সতী-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছে। পাঠকগণ, যদি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করেন, তবে প্রত্যেক অঙ্কে উক্ত তিন প্রকার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।

ইহাতে সন্নবেশিত অন্য অন্য বিষয়গুলি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে কতক উপদেশগর্ভ, কতক কাব্য রসোদ্দীপক, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রী হরিনাথ মজুমদার
কুমারখালি

৫। **ভাবোচ্ছ্বাস** (নাটক)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রকাশকত্বে 'কাঙাল সঙ্গীত'-এর অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯ পৃষ্ঠার এই সংকলনে মোট ৩৯টি গান স্থান পেয়েছিল।[২]

৬। **জটিল কিশোর** (নাটক)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৭। **কৃষ্ণকালী লীলা** (পাঁচালি)। ১৮৯২ (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ৩৮

১৩০৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে এই পুস্তিকাটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে সতীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর 'নিবেদন' অংশে প্রকাশক লিখেছিলেন :

> মহাত্মা কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের রচিত 'কৃষ্ণকালী' পাঁচালী প্রকাশিত হইল। ইহা সুপ্রসিদ্ধ ফিকিরচাঁদ ফকীরের 'সাধন সঙ্গীত' সম্প্রদায়ে গীত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ভ্রমবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অভেদ তত্ত্বময় কৃষ্ণ-কালী পরমতত্ত্বে ভেদ কল্পনা করিয়া অপরাধী হইতেছেন এবং ধর্ম্মরাজ্যের অনিষ্টসাধন করিতেছেন দেখিয়া মহাত্মা কাঙাল ভক্তসমাজে ভগবানের 'কৃষ্ণকালী' লীলাতত্ত্ব প্রচার করেন। উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণই....ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। আজ আমরা....কৃষ্ণকালী-লীলা ভক্তসমাজে প্রচার করিলাম।[৩]

৮। **কংসবধ** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৯। **প্রভাসমিলন** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১০। **নন্দ বিদায়** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১। **পাষাণোদ্ধার** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২। **রামলীলা** (পাঁচালি) প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৩। **শিববিবাহ** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৪। **নিমাই সন্ন্যাস** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫। **শুম্ভনিশুম্ভ বধ** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৬। **অশোক** (পাঁচালি)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

## পদ্য বা কবিতা

১। **পদ্যপুণ্ডরীক** (পদ্য)। ১৮৬২ (১২৬৯ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ৪২
এই পুস্তিকাটিকে সুরেশচন্দ্র মৈত্র ১৮৫৮ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বর্তী সময়কালীন অন্যতম 'উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যগ্রন্থ'-এর মর্যাদা দিয়েছেন।[৪]

২। **মনুজ** (কবিতা)
নয়টি নাতিদীর্ঘ কবিতার সমন্বয়ে এই কাব্য পুস্তিকাটির প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।* গ্রামবার্তার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল আহসান চৌধুরী 'মনুজ'-এর গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারে নিশ্চিত নন।[৫] তবে কাঙাল হরিনাথের প্রপৌত্র কুমারখালি নিবাসী অশোক মজুমদার তাঁর নিকট সংরক্ষিত হরিনাথ রচিত গ্রন্থরাজির তালিকাতে 'মনুজ'-এর উল্লেখ করেছেন।[৬]

## সঙ্গীত-নামকীর্তন ইত্যাদি

১। **অধ্যাত্ম-আগমনী** (সঙ্গীত)। সেপ্টেম্বর ৯, ১৮৯৫ (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

২। **আগমনী** (ধর্মীয় সঙ্গীত)। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের (১২৯২ বঙ্গাব্দের) পর প্রকাশিত।

৩। **পরমার্থগাথা** (ধর্মীয় সঙ্গীত) ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের (১২৯২ বঙ্গাব্দের) পর প্রকাশিত।

৪। **শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম** (নামকীর্তন)। ১৯৬৬ (৭ ভাদ্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)

৫। **আনন্দময়ী মায়ের আগমনে আনন্দ-উৎসব** (তত্ত্বসঙ্গীত)। কাঙাল-পৌত্র অতুলকৃষ্ণ মজুমদার কর্তৃক ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে (১ বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত।

## প্রবন্ধ

১। **ভারতোদ্ধার** (প্রবন্ধ)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর কাঙাল জীবনী গ্রন্থে হরিনাথের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় 'ভারতোদ্ধার'-এর অন্তর্ভূক্তি ঘটিয়েছেন।[৭] অথচ তাঁরই সম্পাদিত 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা' শীর্ষক 'ভারতোদ্ধার'কে 'অগ্রন্থিত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

২। **সেবা ও সেবাপরাধ** (প্রবন্ধ)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩। **ঠানদিদির বৈঠক** (আলোচনা-প্রবন্ধ)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর কাঙাল জীবনীতে এই গ্রন্থটিকে প্রকাশিত গ্রন্থ

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেও, তাঁরই সম্পাদিত হরিনাথের নির্বাচিত রচনায় একে 'অগ্রন্থিত' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৯]

৪। **পৌত্তলিকতা প্রণেতা** (প্রবন্ধ)। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। কাঙাল-প্রপৌত্র কুমারখালি নিবাসী অশোক মজুমদার তাঁর কাছে সংরক্ষিত হরিনাথের গ্রন্থতালিকার মধ্যে হরিনাথের এই গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেছেন।[১০]

**বাউলসঙ্গীত**

১। **কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী**। ১৮৮৬-১৮৯৪ (১২৯৩-১৩০০ বঙ্গাব্দ)।

মোট ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা হিসেবে মোট ১৬টি খণ্ডে এই গানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বারোটি খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৮৭)। অবশিষ্ট চারটি খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৮৯৪)। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই একই শিরোনামায় গ্রন্থটি একখণ্ডে প্রকাশিত হয়। পৃ. ১৩০।[১১]

২। **কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীত**। ১৯১৬ (ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ১৭৮+চোদ্দ। প্রকাশক—গুরুদাস চ্যাটার্জী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা।

এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে জলধর সেন লিখেছেন :

> কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীতের কতকগুলি সঙ্গীত একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা অনেকদিন হইতে করিতেছিলাম। নানা বিপদে পড়িয়া এতদিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কাঙালের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র বাণীশচন্দ্র একমাসের মধ্যে পরলোকগত হইলেন; তাঁহাদের আগ্রহেই এই পুস্তকখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তাঁহারা অকালে চলিয়া গেলেন, আমারও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল;...
>
> সতীশের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারই আগ্রহে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কাঙালের সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন এবং তিনিই অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয় প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কাঙাল সন্তানগণের নিরাশ্রয় পরিবারদিগের ভরণপোষণের কথঞ্চিৎ সাহায্য এই পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থে হইতে পারিবে, এই ভাবিয়া আমি পুনরায় এই অমূল্য গীতাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। কাঙালের অসংখ্য গীতের মধ্যে অল্প কয়েকটিই এই খণ্ডে দিতে পারিলাম; যদি কখনও সময় হয়....তবে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের চেষ্টা করিব।
>
> বর্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ....কাঙাল হরিনাথের এই

গীতাবলী প্রকাশের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়া তিনি আমাকে এবং নিরাশ্রয় কাঙাল-পরিবারকে আরও অধিকতর ঋণে আবদ্ধ করিলেন।[১২]

৩। **কাঙালসঙ্গীত।**

প্রথম প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কাঙাল-পৌত্র সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রকাশকত্বে কুমারখালি মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে এই গ্রন্থটির 'নূতন সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এই সংস্করণের নামপত্রে লেখা ছিল :

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।

এই পুস্তিকাটির মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০। এর মধ্যে 'ভাবোচ্ছ্বাস'-এর ১৮ পৃষ্ঠা আছে। 'ভাবোচ্ছ্বাস'কে বিযুক্ত করলে 'কাঙালসঙ্গীত'-এর মোট পৃষ্ঠা দাঁড়ায় ২১। এতে মোট ৩১টি গান সংকলিত হয়েছিল।[১৩]

## ধর্ম ও সাধনতত্ত্ব

১। **কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ।** ১৮৮৫-১৮৯৫ (১২৯২ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ)।

এই সময়সীমায় ৬টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, প্রতিটি খণ্ডে ১২টি করে সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ব্রহ্মাণ্ডবেদের বহু সংখ্যারই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। প্রথম ভাগ, পঞ্চম সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। প্রথম ভাগ, সপ্তম সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। প্রথম ভাগ, অষ্টম সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং প্রথম ভাগ, নবম সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে।

তবে হরিনাথের ব্রহ্মাণ্ডবেদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। উক্ত ছয় খণ্ড ছাড়াও 'অর্থাভাবে ব্রহ্মাণ্ডবেদের অনেকাংশ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে' বলে আক্ষেপ করেছিলেন চন্দ্রশেখর কর। তাঁর সাক্ষ্যে জানা যায় এই ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশে 'কতকগুলি বড়লোক' হরিনাথকে অর্থসাহায্য করেছিলেন।[১৪] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের পরিবারের স্বপক্ষে লেখার শর্তে হরিনাথকে ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন।[১৫] অবশ্য হরিনাথ স্বভাবগত কারণেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

## সাধনতত্ত্বের ইতিহাস

১। **মাতৃমহিমা।** হরিনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত আগে অর্থাৎ ১৩০২ বঙ্গাব্দের রচিত এবং মৃত্যুত্তীর্ণকালে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। পৃ. ৬০

১৩০২ বঙ্গাব্দের ৯ পৌষ, সোমবার, হরিনাথ এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় প্রসঙ্গত লিখেছিলেন :

কত কত পীঠস্থান, তীর্থস্থান এবং অন্যান্য সাধনস্থান ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় কতকাল প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, আবার কালে তাহার প্রকাশ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। এই সকল ঘটনা স্মরণপূর্ব্বক পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের বাক্যের তাৎপর্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ইহার যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তাহারই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব। গ্রাহ্য আর অগ্রাহ্য পাঠকের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের অধীন।....আমাদিগের....সত্য সেবাই উদ্দেশ্য।[১৬]

১৩০৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পৌষ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক এবং ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। এই চতুর্থ সংস্করণের 'আবেদন' অংশে প্রকাশক লিখেছিলেন :

যাঁহারা এই 'পল্লীপ্রাণ' মহাত্মার নামই শুধু অবগত আছেন, তাঁহার কার্য্যকারিতা বিষয়ে কিছু অবগত নন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকটি সম্পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে আমাদের এই—পল্লীপ্রাণ, ভগবদ্-প্রেমিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গায়ক ও সিদ্ধ-সাধক মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের বিষয়ে কিছু কিছু অবগত হইতে অবশ্যই পারিবেন।[১৭]

এই সংস্করণে কাঙালের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার লিখিত সংক্ষিপ্ত কাঙাল জীবনী 'লোকমান্য কাঙাল হরিনাথের জীবনীর সংক্ষিপ্ত কথা' শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হরিনাথ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর সঙ্গে বর্তমান সংকলিত অংশে পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়।[১৮]

## শিশু ও বালকপাঠ্য

১। **দ্বাদশ শিশুর বিবরণ**। মাঘ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পরে 'চারুচরিত্র' নামে গ্রন্থটি নতুনভাবে প্রকাশিত হয়।

২। **চারুচরিত্র**। ২৬ বৈশাখ ১২৭০ বঙ্গাব্দ (১৮৬৩)। পৃ. ২০০

'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ' নামান্তরে 'চারুচরিত্র' হিসেবে প্রকাশিত হয় প্রথম প্রকাশের মাত্র তিন মাসের মাথায়। 'চারুচরিত্র'-এর 'বিজ্ঞাপন' অংশে হরিনাথ 'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ' নাম পরিবর্তন করে 'চারুচরিত্র' নামে প্রকাশের কারণ বিবৃত করে লিখেছেন :

আমি উৎকট রোগাক্রান্ত হওয়ায়, এই পুস্তকের সংশোধন ভার জ্ঞানরত্নাকর-পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয়ের প্রতি

অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবং আমার দুঃসময় প্রযুক্ত সংশোধন করা দূরে থাকুক, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি নূতন কতকগুলি দোষ সংযোজিত হয়, সুতরাং উক্ত মুদ্রিত পুস্তক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার মুদ্রিত করাইতে হইয়াছে।....

এই পুস্তক প্রথমে 'দ্বাদশ শিশুর বিবরণ' নামে প্রকাশিত হয়। অনন্তর উক্ত দোষাশ্রিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে চারুচরিত্র নামকরণ করিয়াছি।[১৯]

চারুচরিত্র-এ যে বারোজন শিশুর ছন্দোবদ্ধ চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছে, তারা হলেন—নিষাদপুত্র বটু, রণনিপুণ অভিমন্যু, মাতৃভক্তিপরায়ণ ধ্রুব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কচ, সূর্য-কুলতিলক ভগীরথ, ক্ষমাশীল সিন্ধু, ন্যায়পরায়ণ প্রহ্লাদ, পিতৃভক্ত পুরু, পিতৃভক্ত বৃষকেতু, কৃষ্ণবলরাম, তত্ত্বজ্ঞানী নিতাই এবং পরাক্রমশালী লব-কুশ।[২০]

৩। **কবিতাকৌমুদি।** ১৮৬৬ (মাঘ ১২৭২ বঙ্গাব্দ)। পৃ. ৪৪

৪। **একলব্যের অধ্যবসায়।** প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৫। **তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার অর্থসংগ্রহ।** প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

**উপন্যাস**

১। **বিজয়বসন্ত।** ১৮৫৯ (১৭৮১ শক)। পৃ. ১০৫

কাঙাল-প্রপৌত্র কুমারখালি নিবাসী অশোক মজুমদার জানিয়েছেন 'বিজয়বসন্ত' প্রথম পদ্যে লিখিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র লেখক জনৈক বি. বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ উদ্ধার করেছেন তিনি : '...বন্ধুবান্ধবদিগের অনুরোধে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বিজয়বসন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া স্বগ্রামস্থ যুবকদিগের দ্বারা অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক যশার্জন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।...'[২১]

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'বিজয়বসন্ত'-এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকা অর্থাৎ 'প্রথমবারের বিজ্ঞাপন'-এর হরিনাথ লিখেছিলেন :

'বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য (Novel) অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহার দরবেশ, বাহার দানেশ প্রভৃতি যে সমুদয় রূপক ইতিহাস প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অশ্লীলভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি

বিজয়বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ....ইহার আদ্যন্ত করুণ রসাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ।'[২২]

প্রথম সংস্করণে 'বিজয়বসন্ত'-এ পাঁচটি অধ্যায় ছিল। কিন্তু ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে (১৭৮৪ শক) প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে আরও একটি অধ্যায় যুক্ত হয়। এ সম্পর্কে হরিনাথ 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছিলেন :

বিজয়বসন্ত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।...পূর্ব্বে ইহা পঞ্চ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ থাকায় কোন কোন বিষয় অস্পষ্ট ছিল। এইবারে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত একটা অধ্যায়ের বৃদ্ধি করা হইয়াছে।[২৩]

'বিজয়বসন্ত'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (১৭৮৭ শক)। চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে (১৭৯১ শক)। এই চতুর্থ সংস্করণে মোট পৃষ্ঠা ছিল ২৪৫। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে (১৮০২ শক) 'বিজয়বসন্ত'-এর নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১ আশ্বিন (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে)। এই সংস্করণের 'নিবেদন' অংশে জলধর সেন লিখেছিলেন :

কাঙাল হরিনাথ প্রণীত 'বিজয়বসন্ত' নামক সর্ব্বজন পরিচিত উপাখ্যানের ত্রয়োদশ সংস্করণ অনেকদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া গেলেও ততদিন নানা অসুবিধায় তাহার আর সংস্করণ হয় নাই। কিন্তু এখন অনেকেই কাঙালের 'বিজয়বসন্ত' পাঠ করিবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি পুস্তকখানিক পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করিয়াছি।....যে পুস্তকের তেরটি সংস্করণ বিনা বিজ্ঞাপনে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার এই নূতন সংস্করণও কাটিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।[২৪]

২। **চিত্তচপলা**। ১৮৭৬ (১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ)। পৃ. ১৪৮

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন ছিল নিম্নরূপ :

বিজ্ঞাপন।

**চিত্তচপলা।**

প্রথম ভাগ।

জ্ঞাতি-বিরোধীয় অপূর্ব্ব উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার প্রণীত উক্ত পুস্তকের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে।....[২৫]

এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় 'চিত্তচপলা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এ প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামবার্তাপ্রকাশিকার বিজ্ঞাপনে।[২৬] কিন্তু 'চিত্তচপলা'-র দ্বিতীয় খণ্ড আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

৩। **প্রেমপ্রমীলা**। প্রকাশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

হরিনাথের এই উপন্যাসটি 'হীন' ছদ্মনামে মাসিক গ্রামবার্তায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮টি অধ্যায়যুক্ত এই উপন্যাসটি ১২৮৭-১২৮৮ বঙ্গাব্দে সময়কালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির শেষ অংশ প্রকাশিত হয় গ্রামবার্তার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় (জানুআরি ১৮৮২)। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে অষ্টম থেকে অষ্টাদশ তথা শেষ অংশ প্রকাশিত হয়। প্রথম সাতটি অধ্যায় পূর্ববর্তী বছরের (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

**গ্রন্থাবলী**

১। **হরিনাথ গ্রন্থাবলী**। প্রথম ভাগ। নভেম্বর ৪, ১৯০১ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে হরিনাথের যে সমস্ত গ্রন্থ অন্তর্ভূক্ত হয়, সেগুলি হলো—

পরমার্থগাথা

বিজয়বসন্ত

দক্ষযজ্ঞ

বিজয়া

অক্রূরসংবাদ

ভাবোচ্ছ্বাস

ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত

এছাড়া এই সংস্করণে কাঙালের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদারের 'কাঙাল হরিনাথের জীবনী (সংক্ষিপ্ত কথা)' গ্রন্থের আদ্যভাগে সংকলিত হয়েছিল।* এই কাঙাল জীবনীর

অন্তিমাংশে সতীশচন্দ্র লিখেছিলেন :

> হরিনাথের গ্রন্থাবলীর যে অংশ প্রকাশিত হইল, তাহা যদি আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর নব-উষালোকে উদ্ভাষিত নবরুচি-নিপুণ শিক্ষিত পাঠকের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভরসা করি, তখন এই স্বদেশভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাম কবির আন্তরিকতাপূর্ণ রচনাবলীর অবশিষ্টাংশ তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত করা প্রকাশকের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে না।[২৭]

এই গ্রন্থাবলীর 'ভূমিকা'-য় জলধর সেন লিখেছিলেন :

> আজ আমরা (হরিনাথের)...গ্রন্থরাশির মধ্যে হইতে কয়েকখানি প্রকাশিত করিয়া সন্দেহ ও সঙ্কোচ উদ্বেলিত হৃদয়ে সুধী পাঠকবৃন্দের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম; তাঁহাদের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বাসনা রহিল।[২৮]

তবে হরিনাথ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ বা খণ্ড আর কখনও প্রকাশিত হয়নি।

২। **কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা**। মার্চ ১৯৯৮ (চৈত্র ১৪০৪ বঙ্গাব্দ)।

আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় এই নির্বাচিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে বাঙলাদেশ, ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে। নির্বাচিত রচনা-খণ্ডে যে সমস্ত গ্রন্থ বা রচনা সংকলিত হয়েছে সেগুলি হলো :

বিজয়বসন্ত
সাবিত্রী নাটিকা
ভাবোচ্ছ্বাস
ব্রহ্মাণ্ডবেদ (সামান্য অংশমাত্র)
মাতৃমহিমা
পরমার্থগাথা
মনুজ
ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত
অগ্রন্থিত কবিতা (পাঁচটি)
এবং অপ্রকাশিত ডায়েরির প্রকাশিত অংশ

এই সংস্করণের ভূমিকাংশে আবুল আহসান চৌধুরী প্রসঙ্গত লিখেছেন :

হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই যুগন্ধর মনীষী-ব্যক্তিত্বকে তাঁর মৃত্যুশতবর্ষে উত্তর প্রজন্মের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।[২৯]

এই সংকলন গ্রন্থের পরিশিষ্টে সম্পাদক-সংকলক আবুল আহ্সান চৌধুরী হরিনাথ মজুমদারের গ্রন্থ ও রচনার পরিচয় প্রদান করেছেন। এই পর্বে শ্রী চৌধুরী বঙ্গীয় 'তিলি সমাজ পত্রিকা'কে (৩য়, বর্ষ, ৩য় খণ্ড, বসন্ত ১৩৩৪, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পৃ. ১১০) সাক্ষ্য মেনে জানিয়েছেন যে হরিনাথের বিজয়বসন্ত একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিলো।[৩০] তবে অন্যত্র তিনি লিখেছেন 'জানা যায়' বিজয়বসন্তের কুড়িটির অধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৩১] তবে এই 'জানা যায়'-ভিত্তিক মন্তব্যের সপক্ষে তিনি কোন তথ্য নির্দেশিকা দেননি।

## অগ্রন্থিত রচনা

এসব ছাড়াও হরিনাথের বহু রচনা অগ্রন্থিত রয়ে গিয়েছে। অনেক লেখা গ্রামবার্তার পৃষ্ঠায় রয়ে গেছে। অনেক লেখা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। 'হীন' ছদ্মনামে হরিনাথের একটি অসমাপ্ত নাটক গ্রামবার্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির নামটি রীতিমত উদ্ভট : 'পতনহৃদ অথবা নাটকান্তর নাটক'। নাটকটির মাত্র ২টি সূত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র) গ্রামবার্তার মাসিক সংস্করণের ফাল্গুন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বাকি অংশ রচনা করবার জন্য তিনি পাঠকদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন।[৩২]

কাঙাল হরিনাথের লিখিত একটি সুবৃহৎ দিনলিপি বা ডায়েরি এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়ে গেছে। যতদূর জানা গেছে এই ডায়েরিতে হরিনাথের জীবনের অনেক কাহিনি, কুমারখালির ইতিবৃত্ত, সামাজিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ আছে। অথচ ডায়েরিটি আজ পর্যন্ত প্রকাশের আলো দেখেনি। জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অন্যান্য ঠাকুর জমিদারদের সঙ্গে হরিনাথের বিরোধ সংক্রান্ত বহু তথ্য এই ডায়েরিতে থাকায় এই ডায়েরি প্রকাশ-না-করার পেছনে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে বহুকাল যাবৎ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ডায়েরির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েও নিজের পারিবারিক সম্মান রক্ষার স্বার্থে তাঁর জীবদ্দশায় এর প্রকাশ আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরবর্তীতেও এই ডায়েরি নিয়ে টালবাহানা চলেছে। স্বয়ং জলধর সেন এই ডায়েরি প্রকাশ-না-করার কথা ঘোষণা করেছিলেন! এই ডায়েরি অনেকের হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। কাঙাল-পৌত্র বিশ্বনাথ মজুমদারের নিকট থেকে এই ডায়েরি অধ্যাপক অরুণ রায়ের হাতে এসেছিল। এর মধ্যে থেকে নির্বাচিত দুটি অংশ চতুষ্কোণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর চতুষ্কোণ পত্রিকা-সম্পাদকও এই ডায়েরি প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত হন। কিন্তু ডায়েরিটি কোথায়—এর উত্তর সদুত্তর কেউ দিতে পারেন না। সুকুমার মিত্র লিখেছেন :

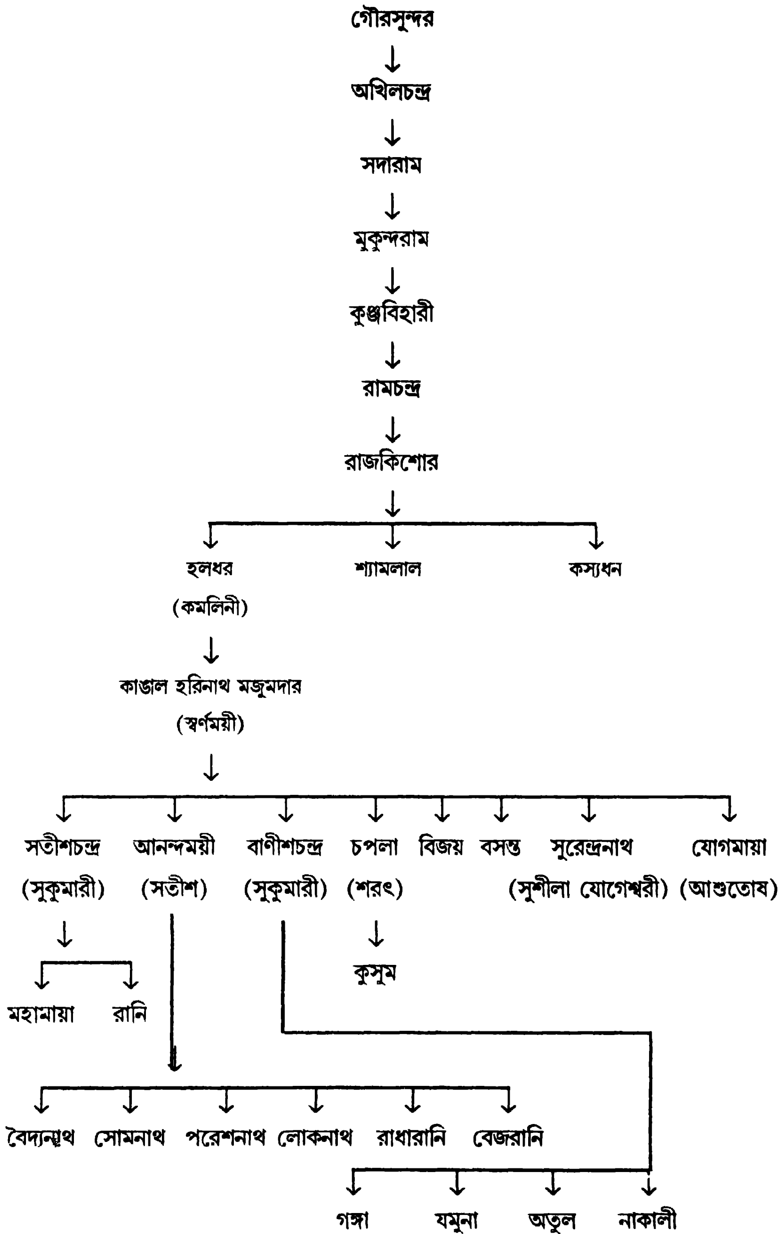
কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার নিরোধে দৃঢ় সংকল্প হরিনাথের

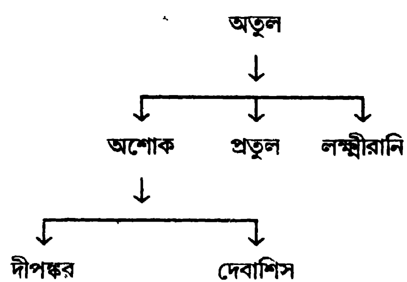
বিরোধ বেধেছিল ঘটনাচক্রে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জমিদারী পরিচালনা করছিলেন সেই সময়েই হরিনাথ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। এই....কাহিনী হরিনাথের দিনলিপিতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে এই দিনলিপি আজ পর্যন্ত কেউ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে সাহসী হননি।[৫৩]

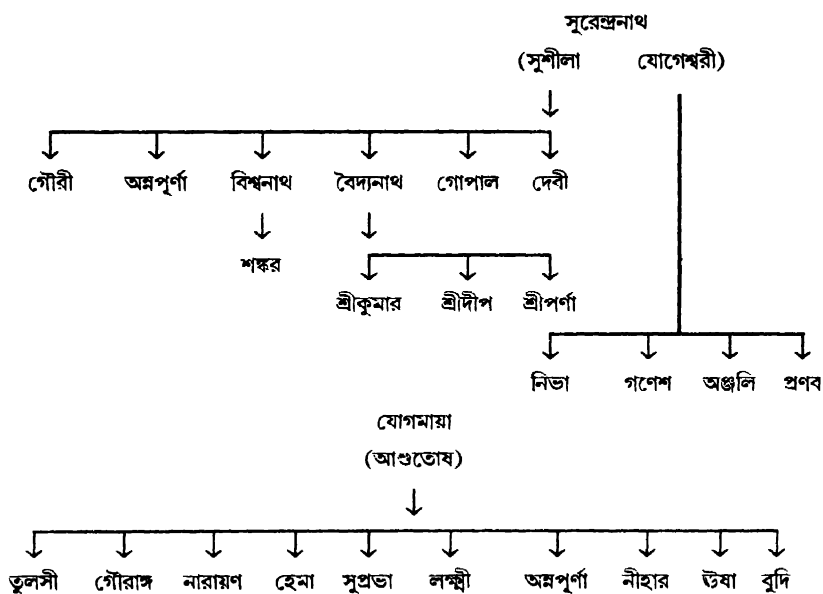
তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন : 'ঠাকুরবাড়ীর অদৃশ্য ভ্রুকুটি আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে হরিনাথ সম্পর্কে মূক করে রেখেছে।'[৫৪]

হরিনাথের ডায়েরিটির হদিশহীনতা বাঙলা সাহিত্যের একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

# কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের বংশলতিকা




অতুল
অশোক
প্রতুল
লক্ষ্মীরানি
দীপঙ্কর
দেবাশিস


সুরেন্দ্রনাথ
(সুশীলা
যোগেশ্বরী)
গৌরী
অন্নপূর্ণা
বিশ্বনাথ
বৈদ্যনাথ
গোপাল
দেবী
শঙ্কর
শ্রীকুমার
শ্রীদীপ
শ্রীপর্ণা
নিভা
গণেশ
অঞ্জলি
প্রণব
যোগমায়া
(আশুতোষ)
তুলসী
গৌরাঙ্গ
নারায়ণ
হেমা
সুপ্রভা
লক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা
নীহার
উষা
বুদি

# সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার মিত্র : অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য। নাভানা। কলকাতা।

অমর দত্ত (সম্পাদিত) : 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'। গ্রন্থভারতী। কলকাতা। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

অমলেন্দু দে : বাঙালী বুদ্ধিজীবীমানস ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

অশোক চট্টোপাধ্যায় : উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ। উবুদশ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। চতুর্থ খণ্ড। মডার্ন বুক এজেন্সি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (সংগৃহীত) : প্রীতিগীতি। কলকাতা ১৩০১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত) : কুষ্টিয়া ইতিহাস ঐতিহ্য। কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ।

আবুল আহসান চৌধুরী : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। বাংলা একাডেমী ঢাকা। ১৪০২ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত ও সংকলিত) : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। ১৪০৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত) : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। ১৪০৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

আশা গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)। ডি.এম. লাইব্রেরি। কলকাতা। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স। কলকাতা। ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড। প্রকাশের তারিখ উল্লেখিত হয়নি।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান। অখণ্ড। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলকাতা। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মজীবনচরিত (মোহিত রায় সম্পাদিত)। প্রজ্ঞা প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কান্তি গুপ্ত : উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপ-রীতি। ইন্দুপ্রভা। কলকাতা। ১৩৯১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত। গুরুদাস চ্যাটার্জী এন্ড সন্স। কলকাতা। ভাদ্র ১৩২১ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। প্রথম ভাগ (প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বাদশ সংখ্যা)। ১২৯৭ থেকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সংখ্যাগুলি প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ একখণ্ডে গ্রথিত

কাঙালের-ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ (মোট দশটি সংখ্যা তেরোটি অধ্যায়ে একত্রে গ্রথিত)। প্রকাশনের তারিখ পাওয়া যায়নি। কাঙাল-পৌত্র বৈদ্যনাথ মজুমদারের নিকট দেখেছি।

কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ। দ্বিতীয় ভাগ (মোট দশটি সংখ্যা তেরোটি অধ্যায়ে একত্রে গ্রথিত)। প্রকাশনের তারিখ পাওয়া যায়নি। টাকি জেলা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে এই খণ্ডটি দেখেছি।

কান্তকবি রচনাসম্ভার। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ। প্রথম খণ্ড (১২৯৩-১২৯৬ সালের ডায়েরি)। কলকাতা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ। দ্বিতীয় খণ্ড (১২৯৭ সালের ডায়েরি)। কলকাতা।